অ ঞ্জ লি প্র কা শ নী প্র কা শি ত

রা জ না গি নী

ন ট রা জ ন্

ঃ পরিবেশক ঃ
নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৭৭
সেপ্টেম্বর ১৯৭০

প্রকাশক :
সুশান্ত কুমার বন্দোপাধ্যায়
২ই, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
সুধাংশু বন্দোপাধ্যায়

বাঁধাই :
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক :
স্বপন কুমার ঘোষ
নিউ মানসী মুদ্রণ
৬, ডালিমতলা লেন
কলকাতা-৬

মূল্য : দশ টাকা

শ্রীউপেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
শ্রীচরণেষু

রাজধানী মুর্শিদাবাদে সন্ধ্যা নেমে আসতেই রাস্তাঘাট হয়ে ওঠে জনহীন। নাগরিকেরা আতঙ্কিত....আজ কার রক্তে রঞ্জিত হবে রাজপথ? কে জানে আজ কার অন্তিম নিঃশ্বাসে ভারী হবে রাজধানীর বাতাস? কেউ বলে—এ কাজ প্রেতাত্মার....কেউ বলে, বিদেশী বণিক রবার্ট হেজেসের সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটাই প্রতিশোধ নিচ্ছে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদরের কন্যা আজিমুন্নেসার মুখখানা এমন বিষাদক্লিষ্ট কেন?...কেনই বা তার আয়ত চোখের কোণে মুক্তাবিন্দু টলমল করে...? দিশেহারা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। বিভ্রান্ত হিন্দু যুবক রঘুনন্দন।—নিরুত্তর সুদক্ষ নগর-কোতোয়াল মহম্মদ জান।

সরাবের পাত্র হাতে হারেমে কে ওই নারী...? কিন্তু না। সরাব নয়, ওতে আছে বিষাক্ত মৃতসঞ্জীবনী। অমৃততুল্য মৃতসঞ্জীবনী মানুষকে বাঁচায়। আর, বিষাক্ত মৃতসঞ্জীবনী তাকে বাঁচিয়ে আবার ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে...।

এ কাহিনী ইতিহাসের রহস্য অথবা রহস্যের ইতিহাস নয়। ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত এ এক বিচিত্র রহস্য কাহিনী, যার জন্ম মুর্শিদাবাদে প্রচলিত এক কিংবদন্তি থেকে।

॥ ভূ মি কা ॥

ইতিহাস কথা বলে ঐতিহাসিকের মুখে। ঐতিহাসিক বর্তমানের আলোয় এনে হাজির করে অতীতের বিষয়বস্তু, আর লেখক সেই একই বিষয়বস্তুকে সাল, তারিখের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়ে সামান্য রংয়ের প্রলেপ বুলিয়ে উপস্থাপন করে পাঠকবর্গের সামনে। ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের মধ্যে কেবলমাত্র এই তফাৎটুকু থাকলে বোধহয় বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, লেখক মাঝে মাঝেই সেই সীমা ডিঙ্গিয়ে কল্পনার পাখায় ভর করে অনেক দূর এগিয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে তখনও। সেই প্রশ্ন সত্যাসত্যের প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানোর অধিকারগত প্রশ্ন।

আমার ধারণা, সেই অধিকার বোধহয় লেখকের আছে। এবং আছে বলেই কবি বলেছেন—"ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো···।" কবির সেই অধিকারই লেখকের অধিকার। সেই অধিকার মানুষের স্বাধীনতার অধিকারের মতই জন্মগত।

আমিও সেই চিরাচরিত অধিকার বলেই এই কাহিনীর সূত্রপাত করতে সাহসী হয়েছি। এর মূল নিহিত রয়েছে মুর্শিদাবাদে প্রচলিত এক কিংবদন্তীর মধ্যে যার সত্যাসত্য সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। এই কাহিনীটি যদি পাঠক পাঠিকাদের ভাল লাগে তবেই বুঝবো আমার সেই অধিকার প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। সেই সার্থকতার কাছে কট্টর ঐতিহাসিকের রক্তচক্ষুও মূল্যহীন মনে করবো।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই 'অঞ্জলি প্রকাশনী'র শ্রীশিশির বন্দোপাধ্যায়কে, যাঁর অনলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া এই বই হয়ত পাঠক পাঠিকাদের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হত না।

মহালয়া, ১৩৭৭ নটরাজন্
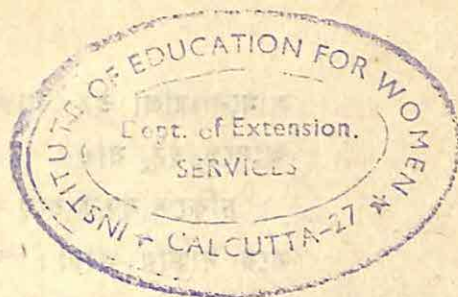
পীর মহম্মদ শাহের পবিত্র দরগা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একখানা সুদৃশ্য তাঞ্জাম। ষোল বেহারার তাঞ্জাম। সাক্ষাৎ যমদূতের মত বেহারাদের চেহারা। তাদের তৈলচিক্কণ দেহে সূর্যকিরণের ঝিলিক্। কালো কেশে রাঙা কুসুমের মত তাদের লম্বা বাব্‌রি চুলে লাল কাপড়ের পট্টি বাঁধা।

তাঞ্জাম সহ নবাবজাদী আজিমুন্নেসার দেহখানিকে কাঁধে তুলে নিতে যেখানে দু'জন বেহারাই যথেষ্ট সেখানে ষোল বেহারার প্রয়োজন আভিজাত্যের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ধীর কদমে এগিয়ে চলে বেহারার দল। আর তাদের কাঁধে মৃদু ছন্দে হেলতে দুলতে থাকে সুদৃশ্য তাঞ্জামখানা।

তাঞ্জামের সামনে ও পাশে জনদশেক ঘোড়সওয়ার সিপাহী, তাদের হাতের সুতীক্ষ্ণ বর্শাফলক ঝক্‌মক্ করছে সূর্যের আলোয়। আর দলের একেবারে শেষপ্রান্তে একটি তেজী সাদা ঘোড়ার পিঠে এক সুপুরুষ যুবক—গোটা দলের সর্বময় কর্তা।

দলের বেশকিছুটা আগে আর একজন ঘোড়সওয়ার সিপাহী তারস্বরে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে চলেছে—

সামনেওয়ালা হঠ্ যাও, হঠ্ যাও! নবাবজাদীর তাঞ্জাম আসছে, হঠ্ যাও।

চকিতে সতর্ক হয়ে ওঠে পথচারীরা। রাজপথের একধারে সরে দাঁড়ায় তারা। তাঁদের প্রিয় নবাবের প্রিয়তমা কন্যা আজিমুন্নেসা আসছে। পুরো নাম আজিমুন্নেসা হলেও নবাব তাঁকে আজিমুন্ বলেই ডাকেন। শুধু নবাব কেন, রাজধানীর সর্বত্র এই আজিমুন্ নামটাই প্রচলিত। মানুষ তো নয়, যেন বেহেস্তের হুরী। এমনি তার রূপ, এমনি তার চরিত্র! কেউ কেউ আবার বলে, গুলাব-বাগিচার বুলবুল। কণ্ঠস্বরে নাকি মধু ঝরে তার।

কিন্তু ক'জনই বা চোখে দেখতে পেয়েছে আজিমুন্‌কে। নবাবের হারেমে প্রবেশের অধিকার ক'জনের আছে? নবাব পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। খোজা প্রহরী পরিবেষ্টিত হারেম। বাইরের লোকের কাছে হারেমের দ্বার রুদ্ধ।

কিন্তু ফুলের খোস্‌বাই যেমন লুকিয়ে রাখা যায় না, তেমনি আজিমুনের রূপলাবণ্যের কথাও রাজধানীর লোকের মুখে মুখে। তা' ছাড়া, এই বয়সেই আজিমুন্ ধার্মিক প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। নবাবজাদা নবাবজাদীরা যে বয়সে বিলাসের স্রোতে গা ভাসায়, সেই বয়সে নবাবজাদী আজিমুন্ ধীর স্থির সংযত প্রকৃতির। মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথায় ফারসী সাহিত্যে অনুরাগিণী এই খুব্‌সুরত্ নওজোয়ানী নবাবজাদীর কাজল কালো সুর্মাটানা চোখে জল ঝরে। ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে পিতাকে, মানুষের এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই, বাবা?

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ একটু ম্লান হেসে প্রিয়তমা কন্যার

মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেন, কি জানি মা, আল্লাহ্ তালার এই সুন্দর দুনিয়ায় মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা কেন, কে জানে? সবই খুদাতালার মর্জি—সবই মানুষের কিস্মৎ।

বাংলা ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নউসেরী নাসির জঙ্গ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ নবাব। কোমল ও কঠোরতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাঁর চরিত্রে। ন্যায়ের প্রতি যেমন তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি, অন্যায়ের প্রতি ঠিক ততখানি কঠোর তিনি। সেখানে তিনি দয়ামায়াহীন কঠিন প্রকৃতির। চরিত্রের এই বিশেষত্বের জন্যেই দাক্ষিণাত্যের এক অখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে আজ বাংলা উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। ছেলেবেলায় একদল দাস ব্যবসায়ী তাঁকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ইস্পাহানের বাজারে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেখানে তাঁর ক্রেতা ছিলেন এক ধার্মিক মুসলমান। তিনি তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নাম রাখেন মহম্মদ হাদি। সেই মহম্মদ হাদি একদিন দেশে ফিরে এসে নিজের ক্ষমতাবলে বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন। সেকালে বাংলা বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার গোটা এলাকাটাকেই বোঝাত।

বাংলার সুবেদার তখন বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান। তরলমতি এই আজিমুশ্বান দেশের শাসনকার্যে যেমন ছিলেন অপটু, তেমনি বিলাসব্যসনেই ব্যস্ত থাকতেন সদাসর্বদা। তার কুশাসনে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে তখন চরম অরাজকতা। রাজধানী ঢাকায় কেবল বিলাসের স্রোত

বইছে তখন। সুবেদার আজিমুশ্বান দরবার গৃহের চাইতে নগরের বাইমহল্লাকেই বেশি পছন্দ করতেন। চুরি ডাকাতি-রাহাজানিতে ছেয়ে গেল ভারতের এই পূর্বপ্রান্ত। দিল্লীতে বাদ্শাহ্ ঔরঙ্গজেব চিন্তিত। বাংলা মুলুক্ থেকে বাদ্শাহের বাৎসরিক খাজনা প্রতিবছরই কমে আসছে। আবার পৌত্র আজিমুশ্বানকেও সুবেদারী থেকে সরিয়ে দিতে মন চাইছে না তাঁর।

এমনি দিনে অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত মহম্মদ হাদিকে তিনি পাঠালেন বাংলার দেওয়ান করে। আজিমুশ্বান রইলেন নায়েব নাজিম হয়ে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন ছাড়া রাজ্যের অর্থনীতির উপর কোন অধিকার রইল না তাঁর। আর মহম্মদ হাদি করতলব খাঁ নাম গ্রহণ করে রাজ্যের অর্থনীতির উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। রাজ্যের দেওয়ান হলেও তিনি আজিমুশ্বানের অধীনস্থ রইলেন না। খোদ্ বাদশাহের কাছে দায়ী রইলেন তিনি।

বুদ্ধিমান বাদ্শাহ্ ঔরঙ্গজেব হিসাবে ভুল করেন নি। অচিরেই রাজ্যের অর্থনীতির মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন করতলব খাঁ। প্রতিবছর বাদ্শাহের বাৎসরিক খাজনার অঙ্ক বাড়তে আরম্ভ করল। ঔরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হলেন করতলব খাঁর উপর।

কিন্তু এদিকে তখন আজিমুশ্বানের সঙ্গে করতলব খাঁর বিসম্বাদ সুরু হয়ে গেছে। আজিমুশ্বানের চাহিদামত অর্থ জোগাতে রাজি হলেন না করতলব খাঁ। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন বাদশাহী খাজনার টাকা থেকে তিনি একটি কপর্দকও আজিমুশ্বানকে দেবেন না।

রুষ্ট হয়ে আজিমুশ্বান দিল্লীতে পিতামহের শরণাপন্ন

হলেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধা হল না। তখন তিনি করতলব খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে করতলব খাঁ তাঁর দেওয়ানী ঢাকা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে মতলব করলেন। সেই উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি এসে হাজির হলেন মুকসুদাবাদ গ্রামে। আর এইখানেই তাঁর দেখা হয়ে গেল পীর মসনদ শাহের সঙ্গে।

পীর মসনদ শাহ, অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা। অতি অমায়িক তার ব্যবহার। এর আগে অবশ্য সাধু ফকীরের উপর তেমন কোন আস্থা ছিল না করতলব খাঁর। কিন্তু পীর মসনদ শাহের সংস্পর্শে এসে মনোভাব পাল্টে গেল তাঁর। তাঁকে দেখেই পীর মসনদ শাহ অতি পরিচিতের মত বলে উঠেছিলেন, এই যে, এসে গেছিস্ দেখ্ছি। তোর জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করে আছি। আমার জন্যে? কণ্ঠে বিস্ময়ের স্বর ফুটে উঠেছিল করতলবের। জবাব দিয়েছিলেন পীর মসনদ শাহ, হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব বলেই বসে আছি আমি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন? কোথায়? কীসের পথ? বিস্ময় বেড়ে উঠেছিল করতলবের।

শান্ত হাসি হেসে বলে উঠেছিলেন পীর মসনদ শাহ, বারে, নতুন দেওয়ানী পত্তন করবি না তুই! চল্ আমার সঙ্গে। এই মুকসুদাবাদ গাঁয়ের কাছেই তুই পত্তন করবি তোর নতুন দেওয়ানী। একদিন এটাই হয়ে উঠবে সুবে বাংলার রাজধানী। আর—আর—।

আর কী হজরত? বিস্ময় তখন চরমে উঠেছে করতলব

খাঁর। হাঁটু গেড়ে সেখানেই বসে পড়ে পীর মহম্মদ শাহের পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি।

করতলব খাঁর পিঠে একখানা হাত রেখে বলে উঠেছিলেন পীর মসনদ শাহ, আর—আর, তুই হবি বাংলার নবাব।

পীর মসনদ শাহের মুখের বাক্য যে অভ্রান্ত তার সাক্ষী বাংলার ইতিহাস। ছোট্ট গ্রাম মুকসুদাবাদ একদিন এক বিরাট জনপদে পরিণত হল। বাংলা বিহার উড়িষ্যা থেকে বিহারকে পৃথক করে দিয়ে আজিমুশ্বান চলে গেলেন পাটনায় সুবেদার হয়ে। দিল্লীর খেতাবে করতলব খাঁর নাম হল মুর্শিদকুলী খাঁ। বাংলার রাজনৈতিক ওলটপালটের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ হলেন বাংলার নবাব। রাজধানী তার মুকসুদাবাদ। নিজের নামানুসারে সেই মুক্‌সুদাবাদই একদিন হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ। আর, নিজের পুরো নাম হল, নবাব মুর্শিদকুলী আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নউসেরী নাসির জঙ্গ।

সেই পীর মসনদ শাহের দরগা থেকেই জোহরের নামাজ শেষ করে এক শীতের দুপুরে ষোল বেহারার তাঞ্জামে চেপে প্রাসাদে ফিরছিল সুন্দরী আজিমুন্। এমনি সে মাঝে মাঝেই করে। হঠাৎ তার ইচ্ছা হয় পীরের দরগায় গিয়ে জোহরের কিম্বা আসরের নামাজ পড়তে। সঙ্গে রঙ্গে খবর চলে যায় দরগায়। বিশেষ ব্যবস্থা হয় নবাবজাদীর জন্যে। ঘোড়সওয়ার সিপাহী পরিবেষ্টিত হয়ে ষোল বেহারার তাঞ্জামে চেপে রওনা হয় আজিমুন্।

রূপোর পাতে মোড়া তাঞ্জামের প্রকোষ্ঠ। তার উপর সূক্ষ্ম সোনার কাজ। শীতের মৃদু হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে গবাক্ষপথের ভারী মখমলের পর্দা। ইরানী আতরের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। বাইরে প্রকোষ্ঠের উপরে মস্‌লীনের

নবাবী পতাকা। আর প্রকোষ্ঠের ভিতরে সমাসীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়তমা কন্যা আজিমুন্ যে নাকি রূপে গুণে বেহেস্তের হুরীকেও হার মানায়।

আঠারো উনিশের মত বয়স হবে আজিমুনের। দুধে-আলতায় গায়ের রং। তার সুর্মাটানা ডাগর চোখে যৌবনের আকুলতার চাইতে ভাবের গভীরতা অনেক বেশি। তার ঐ চোখ ঝলসানো রূপে নেই কোন কামনার দাহ, আছে কেবল কমণীয় স্নিগ্ধতা। তার ঐ ব্রীড়া সংকুচিত গ্রীবাভঙ্গি পুরুষের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয় না। কেবল সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

তাঞ্জামের একপাশে ঠেস্ দিয়ে বসেছিল আজিমুন্। পরণে তার সোনার চুমকি বসানো পেশোয়াজ, গায়ে বহুমূল্য কাঁচুলি। সুন্দর দেহটিকে ঘিরে রয়েছে মস্‌লীনের ওড়না। সোনালী ফিতে জড়ানো বেণীটি পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলের রাশির মধ্যে সরু একটি সিঁথি। সেই সিঁথিতে সোনার সিঁথিপাটী। গলায়, কানে, হাতে, আঙ্গুলে নীলা, মুক্তা, হীরা, পোখ্‌রাজের গহনা, পায়ে পাঁয়জোর, মণিবন্ধে কঙ্কণ ও বাহুতে বাজুবন্ধ্।

ইরানী আতরের গন্ধ ছাপিয়ে আজিমুনের নাকে যেন তখনও লেগে রয়েছে সেই সুগন্ধি আগরবাতির গন্ধ। নামাজ শেষে একমুঠো বহুমূল্য মহীশূরের আগরবাতি সে নিজ হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে পীর মসনদ শাহের দরগায়। পীরের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে সে রাজ্যের মঙ্গল কামনা করে এসেছে। সেই সঙ্গে করুণা ভিক্ষা করেছে তার অধঃপতিত ভাই সাহেবের জন্যে।

আজিমুনের ভাইসাহেব—দাদা। মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র

পুত্র দিলজিৎ খাঁ। এই পুত্রকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা নেই মুর্শিদের। নবাবজাদার মহলে নারী আর সুরা নিয়ে দিনরাত মত্ত হয়ে থাকে দিলজিৎ। নবাবের বারণ শোনে না, শাসন কানে তোলে না। পুত্রকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি মুর্শিদকুলী খাঁ। কিন্তু তার সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দিলজিৎ সুরা আর সাকীতেই ডুবে থাকে। পিতার তিরস্কার, মা নসরুবেগমের চোখের জল, ভগ্নী আজিমুনের অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই টলাতে পারে নি তাকে। মুখে ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করতে করতে সরাবের গ্রাশে চুমুক দেয় দিলজিৎ। আর বলে—যতদিন জীবন আছে তাজা ভোগ করে নাও রাজা................।

দিলজিতের জন্যে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তাঁর অবর্ত্তমানে ঐ দিলজিতই মস্‌নদে বসবে। তখন এই রাজ্যের যে কী অবস্থা হবে তা' চিন্তা করতেও বুক কেঁপে ওঠে তাঁর। অন্যায় অবিচারে কুশাসনে জর্জরিত হয়ে উঠ্‌বে প্রজাপুঞ্জ যেমনটি নাকি ছিল দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের সময়। অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের ফলে বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। সমর্থ হয়েছিলেন সুশাসনের গুণে প্রজাপুঞ্জের মুখে হাসি ফোটাতে।

কিন্তু উপায় কী? বেতমিজ্‌ বেশরম্‌ পুত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে তিনি রক্ষা করবেন কেমন করে?

রাজপথে ধীর গতিতে এগিয়ে চলে নবাবজাদী আজিমুনের ষোল বেহারার তাঞ্জাম। সামনে ও পাশে ঘোড়সওয়ার সিপাহী। আর সবশেষে পিছনে সাদা ঘোড়ায় চড়ে দলনেতা এক সুপুরুষ যুবক।

যুবকের বয়স তিরিশের মধ্যেই হবে। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, পরণে চোস্ত্ পাজামা। গায়ে আঁট্সাট রাজপুরুষের পোষাকটি যেন তার মেদবর্জিত পেশীবহুল দেহটিকে আয়ত্বের মধ্যে রাখতে পারছে না। মাথায় মুসলমানী উষ্ণীষ। পায়ে জরির কাজকরা নাগরাই, কোমরে গোঁজা তীক্ষ্ম অস্ত্রের রত্ন-খচিত বাঁটটির একাংশ বেরিয়ে রয়েছে। এই যুবক মুর্শিদকুলী খাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদের কোতোয়াল। নাম তার মহম্মদ জান। এত অল্প বয়সে রাজধানীর কোতোয়ালের মত একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পদে এর আগে আর কেউ বসে নি। কিন্তু অচিরেই মহম্মদ জান প্রমাণ করে দিলে যে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসবার যোগ্যতা তার আছে।

মহম্মদ জানের উপর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ খুবই সন্তুষ্ট। তার কর্মক্ষমতা, তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা, তার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় নবাবের অগাধ বিশ্বাস। মহম্মদ জানের মধ্যেই বোধ হয় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের যৌবনের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এমন সৎ, নির্লোভ অথচ কর্ত্তব্যকর্মে দৃঢ় রাজকর্মচারী তাঁর রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই।

মহম্মদ জান সম্বন্ধে নবাবের ভাবনা চিন্তা মোটেই অতিরঞ্জিত ছিল না। সত্যিই, আদর্শ রাজপুরুষ মহম্মদ জান। তার সুন্দর মুখের চিবুকে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা। তার সুঠাম দেহভঙ্গিতে ভবিষ্যৎ কর্মবীরের ইঙ্গিত।

কোতোয়াল মহম্মদ জান সম্বন্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মনে একটি গোপন বাসনা ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর প্রিয়তমা কন্যা আজিমুন্‌কে তিনি তুলে দেবেন মহম্মদ জানের হাতে। তাকে জামাতারূপে আপন করে নেবেন তিনি। নিজের ইচ্ছার কথা স্ত্রী নসরুবেগমকে খুলেই বলেছিলেন।

আপত্তি করেনি নসরুবেগম। আপত্তির কিছু ছিলও না। তার কন্যার যোগ্যপাত্রই বটে মহম্মদ জান।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্দর মহলে। নবাবজাদী আজিমুনও শুনতে পেয়েছিল কথাটা। মহম্মদ জান সম্বন্ধে সে অনেক শুনেছে। কিন্তু তাকে চোখে দেখে নি কখনও। দেখার ইচ্ছা থাকলেও তেমন সুযোগ আসে নি।

কথাটা প্রথমে তার কানে তুলেছিল তারই প্রধানা সহচরী রাবেয়া। এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আপন মহলে একটা কৃত্রিম ঝরণার পাশে ঘাসের আস্তরণের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটি সাদা খরগোশের বাচ্চা নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে ছিল আজিমুন্। পায়ের কাছে বসে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল রাবেয়া। মৃদুমন্দ দক্ষিণে বাতাসে গোলাপের মন্দির গন্ধ।

এমনি এক পরিবেশে কথাটা বলেছিল রাবেয়া। বলেছিল, নবাবজাদি বোধ হয় একটা খবর জানেন না।

কি খবর রে রাবেয়া? খরগোশের নরম গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে রাবেয়ার দিকে ফিরে তাকায় আজিমুন্।

মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল রাবেয়া, নবাব সাহেব আপনার সাদীর ব্যবস্থা করেছেন।

লজ্জায় গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠেছিল আজিমুনের। কৃত্রিম রোষে বলে উঠেছিল, তোকে এসব বাজে কথা কে বলেছে রে মুখপুড়ী বাঁদী কোথাকার? তুই চুপ্ কর।

প্রধানা সহচরী রাবেয়াকে সত্যিই ভালবাসতো আজিমুন্। সমবয়সী রাবেয়াকে মনের কথা খুলে বলতো সে। আবার অনেকসময় মুখপুড়ী বাঁদী বলে ঠাট্টাও করতো তাকে।

আজিমুনের কথায় রাবেয়াও কৃত্রিম অভিমানের সুরে

বলেছিল, বেশ, বাজে কথা তো বাজে কথা। সত্যিই তো আমি মুখপুড়ী বাঁদী, এসব কথা বলতে যাই কেন? বলেই একটু জোরেই নবাবজাদীর পা টিপতে থাকে সে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে আজিমুন্। কৌতূহল বেড়ে ওঠে। তার সাদীর ব্যবস্থা করেছেন তার পিতা। কিন্তু কার সঙ্গে? কে সেই ব্যক্তি যার কাছে নিজের এই সযত্নে রক্ষিত জীবন যৌবন সমর্পণ করতে হবে? আজিমুন্ একবার মুখ তুলে রাবেয়ার দিকে তাকায়, তারপর বলে ওঠে, কিরে, সত্যি সত্যি রাগ করলি নাকি?

রাগ করবো না তো কি? নবাবজাদী শুধু শুধু আমাকে মুখপুড়ী বাঁদী বলবেন আর আমি বুঝি রাগ করতেও পারবো না?

আরে না—না! সত্যি করে বল্তো সেই ব্যক্তিটি কে!

এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল রাবেয়া। হাসতে হাসতে বলেছিল, ইস্, পরিচয় জানবার জন্যে যে উতলা হয়ে উঠেছেন নবাবজাদী, সাদীর কথা শুরু হতে না হতেই এত, সাদী হলে না জানি কী করবেন নবাবজাদী। লজ্জায় আবার রাঙা হয়ে উঠেছিল আজিমুন্।

রাবেয়া বলেছিল, নবাব সাহেবের ইচ্ছে কোতোয়াল মহম্মদ জানের হাতে নাকি আপনাকে তুলে দেবেন।

কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে আজিমুন্।

আবার বলতে থাকে রাবেয়া; মহম্মদ জানের কথাই কেবল শুনেছেন নবাবজাদী। চোখে তো আর তাকে দেখেন নি, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার। এমন সুপুরুষ এই তামাম রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই।

চুপ কর; আর ব্যাখ্যা করতে হবে না তোকে। কৃত্রিম

ধমকের সুরে বলে উঠেছিল আজিমুন্; তুই তো দেখেছিস, তোর মাথা বুঝি ঘুরে গেছে রে মুখপুড়ী!

হায় আমার পোড়া কপাল! একটি অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে বলেছিল রাবেয়া, আমরা হচ্ছি গিয়ে দাসী বাঁদী। আমাদের মাথা ঘুরলেই বা কী, না ঘুরলেই বা কী।

খবরটা অন্দরেই কেবল চাপা থাকে নি। বাইরেও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। খোদ্ মহম্মদ জানের কানেও উঠেছিল কথাটা। শুনে মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছিল সে। মনে মনে বলেছিল, আজিমুনের মত একটি নারীকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে লাভ করা সত্যিই ভাগ্যের কথা। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদরের কন্যা আজিমুন্। রূপে গুণে যে নাকি অদ্বিতীয়া।

অত্যন্ত চাপা স্বভাব মহম্মদ জানের। মনের উত্তেজনা মনেই চেপে রেখে সে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে থাকে। তার ব্যবহারে কিম্বা কথাবার্ত্তায় ভুলেও প্রকাশ পায় না যে সে অচিরেই নবাবের জামাতা হতে যাচ্ছে।

মনের মধ্যে কিন্তু একটি বাসনা উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে মহম্মদ জানের। একটিবার—মাত্র একটিবার দেখতে ইচ্ছে করে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে। আজিমুন্ সম্বন্ধে শুনেছে অনেক। কিন্তু তাকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি কখনও। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অন্দরমহলের পর্দানশীন কন্যা আজিমুন্। তার দিকে তাকানো গুনাহ্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন বেয়াদপি নবাব কিছুতেই সহ্য করবেন না। সাদী না হওয়া পর্যন্ত সে নিজে বাইরের লোক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজিমুন্‌কে একটিবার মাত্র চোখের দেখা দেখবার

সুযোগ যে কখনও আসেনি তা' নয়। মাঝে মাঝেই পীর মসনদ শাহের দরগায় আসে আজিমুন্। নবাবজাদীকে পাহারা দিতে হয় খোদ কোতোয়ালকে। ইচ্ছে করলে কোন সুযোগে সে একবার চোখের দেখা দেখে নিতে পারতো তাকে। কিন্তু কঠিন সংযমে নিজেকে সংযত রাখে মহম্মদ জান। জেনে শুনে অন্যায় করতে পারবে না সে। নিজের মনটাকেই যদি না সে নিজের শাসনে রাখতে পারে তো, রাজধানীর কোতোয়ালের মত কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সে সম্পন্ন করবে কিরূপে ?

মনের আবেগকে যে কর্ত্তব্য ও নীতিবোধের উপরে স্থান দেয় না এমন রাজপুরুষ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে বোধ হয় একমাত্র কোতোয়াল মহম্মদ জান ছাড়া আর কেউ ছিল না। না, ঠিক্ তা' নয়। আরও একজন ছিল এমনি ধরণের ব্যক্তি। সেও মহম্মদ জানের সমবয়সী যুবক। তবে, সে মুসলমান নয়, হিন্দু। নাম তার রঘুনন্দন।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনকেও খুবই পছন্দ করতেন। ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন ছিল নবাবের খাজাঞ্চীখানার সর্বময় কর্ত্তা। অর্থনীতিতে এমন জ্ঞান দরবারে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেন নি মুর্শিদকুলী খাঁ। এত অল্প বয়সে দিল্লীর শাহী খাজনার হিসাব নিকাশ সে এমন নিখুঁত ভাবে করে দিত যে দিল্লীর বাদশাহের বাঘা বাঘা খাজাঞ্চীরাও তার মধ্যে এতটুকু ভুল খুঁজে পেত না। তা'ছাড়া গোটা রাজ্যের আয় ব্যয় যেন কণ্ঠস্থ ছিল রঘুনন্দনের।

মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে ছিলেন অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত। তাই তিনি রঘুনন্দনের কদর বুঝতেন। জানতেন, যে রাজ্যের একজন পারদর্শী ও বিশ্বাসী খাজাঞ্চীর মূল্য একজন পরাক্রম-

শালী নিপুণ সেনাপতির চাইতে কোন অংশেই কম নয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে যেমন রাজ্যকে রক্ষা করে সেনাপতি, তেমনি দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে খাজাঞ্চীখানার সর্বময় কর্ত্তা।

ব্রাহ্মণ রঘুনন্দনও সুপুরুষ যুবক। তার দৈহিক শক্তির কথা রাজধানীর একটা আলোচনার বিষয়।

সুশ্রী এই ব্রাহ্মণ যুবক রঘুনন্দন প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে। কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে সে প্রাতঃসূর্যকে অঞ্জলি ভরে জলদান করে। সাদা ধব্‌ধবে পৈতেটি লেপ্‌টে থাকে তার দেহের সঙ্গে। সেই অবস্থাতে ভিজে কাপড়ে উদাত্ত কণ্ঠে স্তবপাঠ করতে করতে প্রতিদিন বাড়ি ফেরে রঘুনন্দন। পূজোপাঠ সেরে সে সংসারের একমাত্র আপনজন বিধবা মায়ের পাদোদক গ্রহণ করে। তারপর রাজপুরুষের পোষাক পরে রাজকার্যে বেরিয়ে পড়ে।

রঘুনন্দনের এই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্মের হের ফের হয় না কখনও। নিজের চরিত্রবলে শুধু নবাবের নয়, রাজ্যের সকলেরই প্রিয়পাত্র সে।

বিধবা মা পুত্রের বিয়ের কথা বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেছে। বিয়ের কথা উঠলেই রঘুনন্দন পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, কী প্রয়োজন ওসব ঝঞ্ঝাটে, মা? এই তো আমরা মা-ছেলেতে বেশ সুখে আছি।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের হিন্দু জনসাধারণের কিন্তু রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটা অভিযোগ আছে। হিন্দু হয়েও হিন্দুর আচার আচরণ পুরোপুরি মেনে চলে না সে। ধর্মে কর্মে তার মতি থাকলেও কুক্কুট মাংসে কিম্বা যবনের হাতে খেতে তার আপত্তি নেই। অন্য কেউ হলে হয়ত এই দোষে

সমাজচ্যুত হতে হত তাকে। কিন্তু রঘুনন্দন রাজ্যের একজন প্রথমশ্রেণীর রাজপুরুষ। তা'ছাড়া সে নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাই হিন্দুসমাজ তার সম্বন্ধে অতদূর এগোতে সাহস করেনি।

সমালোচনার উত্তরে রঘুনন্দন হেসে বলতো, খাওয়াদাওয়া মানুষের রুচির ব্যাপার। এর সঙ্গে ধর্মের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে বুঝতে পারি না। আমি কুক্কুট মাংস কিম্বা যবনের হাতে খাই বলে আমার হিন্দুত্ব ঘুচে যাবে কেন?

সমালোচকরা আড়ালে ব্যঙ্গ করে তাকে। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলবার সাহস নেই।

এগিয়ে চলেছে নবাবজাদীর তাঞ্জাম। তাঞ্জামের দু'পাশের ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা একটু এগিয়ে যেতেই মহম্মদ জান দ্রুত এগিয়ে এসে চলতে থাকে তাঞ্জামের পাশে পাশে। সিপাহীদের নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবে বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। নিজ নিজ স্থান ছেড়ে কেন তারা এগিয়ে গেল? কে তাদের এমন হুকুম দিলে? মহম্মদ জান বুঝতে পারে তাঞ্জামের মন্থর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে রাখা শক্ত। তারা দ্রুত ছুট্‌তে চায়। সওয়ার পিঠে চাপলেই দ্রুত ছুটবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু উপায় কি? তাঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে হবে তাদের। তাঞ্জামকে অনুসরণ করবে তারা। নবাবজাদীর তাঞ্জাম তাদের অনুসরণ করবে না।

মনের বিরক্তি মনেই চেপে রেখে নিজের সাদা ঘোড়াটার পিঠে বসে থাকে মহম্মদ জান। ধীর কদমে চলতে থাকে ঘোড়া। শৃঙ্খলাহীনতার জন্যে এই রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে সিপাহীদের শাস্তি দেওয়া চলে না। বিশেষ করে পাশে

রয়েছেন খোদ্ নবাবজাদী। ছাউনীতে ফিরে গিয়ে ওদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে সে।

ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলে মহম্মদ জান। ইচ্ছে থাকলেও তাঞ্জামের দিকে তাকায় না। কি জানি, যদি কোনক্রমে চোখাচোখি হয়ে যায় নবাবজাদীর সঙ্গে ? আর কেউ না জানুক খোদ্ নবাবজাদী হয়ত কিছু মনে করে বসতে পারে। হয়ত ভাবতে পারে, লোকটা কি বেহায়া, সাদীর কথা শুনেই লোকটা লোভী জানোয়ারের মত উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করেছে।

তাঞ্জামের মধ্যে নবাবজাদী আজিমুনও কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে জানে, খোদ্ কোতোয়াল সঙ্গে রয়েছে তার। এই লোকটির কাছেই একদিন সমর্পণ করতে হবে নিজেকে। লোকটি নাকি সত্যিই সুপুরুষ। তা'ছাড়া এমন সচ্চরিত্র যুবক নাকি গোটা রাজ্যে আর বেশি নেই। প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সে ইচ্ছে করলেই জীবনটাকে ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারতো অনায়াসেই। কিন্তু মহম্মদ জান নাকি তা' করেনি। অন্য নারীর প্রতি সে চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। এমন চরিত্রবান পুরুষই নারীর পছন্দ। এমন একটি পুরুষের হাতেই নিজের জীবন যৌবন সমর্পণের কথা এতদিন মনে মনে কল্পনা করে এসেছে আজিমুন্।

তাঞ্জামের ভারী মখমলের পর্দার ফাঁকে লোকটিকে একবার দেখে নিলে কেমন হয় ? কথাটা মনে হতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে আজিমুন্। সমস্ত দেহে অনুভব করে এক অনাস্বাদিত পুলকের শিহরণ, ছি-ছি। লোকটি জানতে পারলে কী ভাববে তাকে ?

কী আর ভাববে ? আর, জানবেই বা কী করে ? পর্দাটা একটু ফাঁক করে একঝলক্ দেখে নেবে শুধু।

আজিমুন্ জানে সিপাহীদের ঘোড়াগুলো লাল রংয়ের। একমাত্র খোদ্ কোতোয়াল ব্যবহার করে সাদা ঘোড়া। কোতোয়াল এখন তাঞ্জামের কোন্ দিকে আছে কে জানে ? যদি তাঞ্জামের একেবারে সামনে কিম্বা পিছনে থাকে তো তাকে দেখতে তেমন সুবিধে হবে না। মাঝখান থেকে সাধারণ সিপাহীদের কৌতূহলই কেবল বেড়ে উঠ্‌বে।

মখমলের পর্দায় হাত দেয় আজিমুন্। কানামাছি খেলার মত প্রথম অনুমানই খেটে যায় তার। ঐ তো তাঞ্জামের পাশে পাশে চল্‌ছে সেই সাদা ঘোড়াটা।

আজিমুন্ আর একটু ফাঁক করে পর্দাটা। চোস্ত পাজামা পরিহিত সওয়ারের পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছে এবার। তারপর আর একটু—আরও একটু। হ্যাঁ স্পষ্ট, এবার বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহম্মদ জানকে। না কোন ভয় নেই। মহম্মদ জান সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সত্যিই সুপুরুষ বটে। একটুও বাড়িয়ে বলেনি রাবেয়া। কী গায়ের রং! কী সুন্দর টানা চোখ! কী বিশাল বক্ষদেশ! কী চমৎকার অঙ্গভঙ্গি!

স্থান কাল ভুলে গিয়ে মুগ্ধনেত্রে মহম্মদ জানের দিকে তাকিয়ে থাকে আজিমুন্। তার সুন্দর মুখের দু'পাশে ঝুলতে থাকে পর্দার প্রস্থ দু'টো।

হঠাৎ কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে মহম্মদ জান। একটি মুহূর্ত। অকস্মাৎ আজিমুন্ কিছু বুঝতে পারার আগেই মহম্মদ জান ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় তাঞ্জামের দিকে।

চোখে চোখ পড়ে। মহম্মদ জানের সারামুখে ফুটে ওঠে

স্তব্ধ বিস্ময়। মানুষ এত খুবসুরত্ হতে পারে! নিখুঁত সুন্দরী। আল্লাতালাহ্ যেন মেপে মেপে হিসেব করে মুখখানাকে তৈরি করেছেন। এযে তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই নবাবজাদীর মুখখানা কল্পনা করে অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে সে। লাগামহীন সেই কল্পনা। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজের মূর্খতায় নিজেকেই সে ঠাট্টা করেছে। মনে মনে বলেছে, হায়রে ভুখা দিল্, কল্পনা চিরকালই কল্পনা। বাস্তবের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারে না সে কোনদিন। তবে কেন শুধু শুধু বেওকুফের মত আকাশকুসুম তৈরি করছিস্?

কিন্তু সময় সময় বাস্তব যে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে তা' মোটেই জানা ছিল না মহম্মদ জানের।

সম্বিৎ ফিরে পেতেই পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় আজিমুন্। কেবল মহম্মদ জানের মনে রেখে যায় এক খুবসুরত্ আওরতের নিক্ষিপ্ত পঞ্চশরের ভেল্কি। ঐ ভেলকির মায়াতেই যুগে, যুগে তামাম দুনিয়ার পুরুষগুলো নির্দ্বিধায় আওরতের গোলামী করতেও গররাজি হয় না। ঐ ভেল্কির খেলাতেই কত রাজ্যের উত্থান পতন ঘটেছে, কত শত পুরুষের গর্দানা কেটে খুন ঝরেছে, জান কবুল করেছে কত নওজোয়ান।

সেদিনের ঘটনায় মহম্মদ জানকে ভাল লেগেছিল আজিমুনের। কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম দৃষ্টিতেই আজিমুন্‌কে ভালবেসে ফেলেছিল মহম্মদ জান।

দুই

রাজধানী মুর্শিদাবাদের চেহেল সেতুনে সমাসীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। পরিপূর্ণ দরবার গৃহে যে যার আসনে উপবিষ্ট। সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি তিনজন ফিরিঙ্গী বণিকের দিকে নিবদ্ধ। ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেস্। বাকি দু'জন তার সহকারী, এড্ওয়ার্ড পেজ ও ষ্টক্হাউস্।

বিনীত ভঙ্গিতে গদগদ কণ্ঠে রবার্ট হেজেস্ তখন নবাবের দরবারে কোম্পানীর পক্ষ থেকে শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের দাবী সম্বলিত আর্জি পেশ করছিল। গভীর মনোযোগ সহকারে সেই আর্জি শুনছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

ঠিক এমনি সময় চেহেল সেতুনের বাইরে থেকে একটা গোলমালের শব্দ ভেসে আসে।

নবাবের মুখে ফুটে ওঠে একটু বিরক্তির ভাব। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি তাকান পাশে উপবিষ্ট এক রাজকর্মচারীর দিকে।

মুখে কিছু না বললেও নবাবের সেই অর্থবহ ভঙ্গিটুকুই যথেষ্ট। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রাজকর্মচারীটি। তারপর নবাবকে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটে অদৃশ্য হয়ে যায় চেহেল সেতুনের প্রধান ফটকের দিকে।

দরবার গৃহ স্তব্ধ। গোলমালের কারণ না জেনে নবাব আর আর্জি শুনবেন না। তাই সহকারীদের নিয়ে আসনে বসে পড়ে রবার্ট হেজেস্।

একটু পরেই রাজকর্মচারীটি হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়ে কুর্নিশ করতে করতে নবাবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, নিয়মমাফিক্ সাতরোজ আগে এত্তেলা না দিয়ে এক বেয়াদপ জাঁহাপনার কাছে আর্জি পেশ করতে চাইছে। চেহেল সেতুনের মুন্সী তাকে অনেক করে বোঝাতে চাইছে কিন্তু লোকটা কিছুতেই বুঝছে না। তাই সিপাহীরা তাকে জোর করে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেই সেই বেয়াদপ হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নবাব প্রশ্ন করেন, কী আর্জি সেই বেয়াদপের ?

জবাব দেয় কর্মচারীটি, সে অন্য কাউকে জানাতে রাজী নয়। বলছে, তার আর্জি কেবল সে জাঁহাপনাকেই জানাবে।

কেন ? প্রশ্ন করেন নবাব।

কথাবার্তায় মনে হল সেই লোকটির ধারণা অন্য কেউ তার আর্জির কথা শুনলে তাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দেবে।

হুঁ ! একটু সময় চুপ করে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, লোকটি হিন্দু না মুসলমান।

হিন্দু, জাঁহাপনা।

কোথায় থাকে ?

এই রাজধানীরই কোন একটা এলাকায় বাস করে।

আবার খানিকক্ষণ মৌন হয়ে থাকেন নবাব। তারপর বললেন, লোকটাকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

কিন্তু জাঁহাপনা, লোকটা নিয়মমাফিক সাতরোজ

আগে................। রাজকর্মচারীটি তার কথা শেষ করবার আগেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন, আমার জবানই নিয়ম। যাও, নিয়ে এসো তাকে।

আর দ্বিরুক্তি না করে কর্মচারীটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই রাজকর্মচারীটির পিছে পিছে এসে দাঁড়ায় একজন মাঝবয়সী লোক। চেহারায় দারিদ্রের স্পষ্ট লক্ষণ।

লোকটি আভূমি নত হয়ে নবাবকে কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়াতেই নবাব তার দিকে রোষকটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করেন, কি চাই তোমার?

লোকনাথের চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সে বললে, খোদাবন্দ্ দীন-দুনিয়ার মালিক। সুবিচারের আশায় এসেছি জাঁহাপনার কাছে।

কী আর্জি তোমার? আবার প্রশ্ন করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

একটা ঢোক গিলে লোকনাথ বললে, পরশু রাত থেকে আমার সুন্দরী স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না, জনাবআলি।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে নবাবের। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না তো রাজ্যের অন্যান্য রাজকর্মচারীরা রয়েছে, নগর কোতোয়াল রয়েছে। তাদের কাছে না গিয়ে এই চেহেল সেতুনে আমার কাছে কেন এসেছো, বেয়াদপ?

লোকনাথ জবাব দেয়, তাঁদের কাছে গেলে সুবিচার পাবো না, এই কথা মনে করেই জাঁহাপনার দরবারে এসেছি।

নবাব আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বললেন, তাঁদের কাছে গেলে সুবিচার পাবে না, একথা কেন মনে হল তোমার? এর আগে কি এমন কোন ঘটনা ঘটেছে?

স্পষ্ট উত্তর দেয় লোকনাথ, আজ্ঞে না, জাঁহাপনা। তেমন কোন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। তবে জাঁহাপনা যদি দয়া করে আমার সমস্ত কথা শোনেন তো বুঝতে পারবেন।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে নবাব বললেন, বেশ, বল তোমার কথা।

বলতে থাকে লোকনাথ, আমার স্ত্রী খুবই সুন্দরী। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিলাম। পরশু রাতে বাড়ি ফিরে দেখি আমার সেই স্ত্রী সরমা বাড়িতে নেই। এখানে সেখানে খোঁজ করলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না তাকে। পাড়াপড়শীরাও কেউ-কিছু বলতে পারলে না। পাগলের মত সারা দিনরাত গোটা রাজধানী চষে বেড়িয়েছি আমি। কিন্তু সরমার দেখা পাই নি। কিন্তু কাল রাতে পাড়ার একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক আমাকে যে কথা বললে তা' শুনে আমার বুক শুকিয়ে উঠলো। একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্যে একটু থামে লোকনাথ।

কী বললে? প্রশ্ন করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

জবাব দেয় লোকনাথ, বললে যে সরমাকে নাকি সেদিন রাতে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

ভ্রু-যুগল আবার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে নবাবের। প্রশ্ন করেন তিনি, কারা ধরে নিয়ে গেছে? রাজধানীর বুকের উপর বসে এমন জঘন্য কাজ কারা করেছে? লোকনাথ আর জবাব দেয় না।

নবাব আবার বললেন, বল—বল, কারা এমন কাজ করেছে?

চেহেল সেতুনের দরবার গৃহ স্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি

লোকনাথের উপর। ভয়ে, উত্তেজনায় তার সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। কম্পিত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, নবাবজাদার লোকজন এসে নাকি জোর করে ধরে নিয়ে গেছে সরমাকে। বিকৃত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ, নবাবজাদা—দিলজিৎ! বেতমিজ দিলজিৎ এমন কাজ করেছে! নিজের মহল ছেড়ে এখন বাইরের দিকে হাত বাড়িয়েছে সেই দোজখের শয়তান!

তারপর একটু থেমে নিজেকে সংবরণ করে আবার বললেন, তোমার অভিযোগ যদি সত্য হয় তো, সেই কুলাঙ্গারকে এমন শাস্তি দেব, যা দেখে ভবিষ্যতে কোনদিন কোন নবাবজাদা এমন জঘন্য কাজ করতে আর সাহসী হবে না। আর তোমার অভিযোগ যদি মিথ্যা হয় তাহলে? রুষ্ট নবাবের ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে লোকনাথ, মুখে কথা জোগায় না তার।

কি, চুপ, করে রইলে কেন? মুর্শিদকুলী খাঁ বলতে থাকেন, বল—বল, মিথ্যা হলে কী শাস্তি হবে তোমার?

একটা ঢোক গিলে কম্পিত কণ্ঠে লোকনাথ কিছু বলতে যেতেই মুর্শিদকুলী খাঁ তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললেন, তোমাকে—তোমাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে গড়খাইয়ের জলে ভাসিয়ে দেব, বেওকুফ।

কথা শেষ করেই মুর্শিদকুলী খাঁ লোকনাথের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দরবার গৃহে উপস্থিত রাজকর্মচারী ও রাজ্যের আন্-ই-আনান্‌দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি উপবিষ্ট নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের উপর পড়তেই মহম্মদ জান উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় স্থির হয়ে থাকে।

গম্ভীর কণ্ঠে মুর্শিদকুলী খাঁ হুকুম দেন, তুমি এই মুহূর্তে এই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে নবাবজাদার মহলে যাও। মহলের প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করবে। নবাবজাদা কিম্বা তার ইয়ার দোস্তের দল বাধা দিতে এলে আমার হুকুমনামা দেখিয়ে তাদের হুঁশিয়ার করে দেবে। প্রয়োজন হলে তাদের জখম করবে, তবুও প্রত্যেকটি ঘরে তল্লাসী চালাতে হবে তোমাকে, বুঝেছ?

জো হুকুম, জাঁহাপনা। মস্তক আন্দোলিত করে অভিবাদনের ভঙ্গি করে মহম্মদ জান। মুর্শিদকুলী খাঁ আবার বললেন, যদি এই লোকটির স্ত্রীকে খুঁজে পাও তো তাকে সসম্মানে নিয়ে আসবে এই দরবারে; আর নবাবজাদা দিলজিতের হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে এখানে নিয়ে আসবে।

মহম্মদ জান আবার অভিবাদন করে বললে, জাঁহাপনার হুকুম তামিল হবে।

বেশ, যাও। বললেন মুর্শিদকুলী খাঁ, হ্যাঁ, আর একটা কথা—এই লোকটির দিকে নজর রাখবে। দেখবে, ও যেন পালাতে না পারে।

লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটে মহম্মদ জান দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই রাজ্যের একজন আন্-ই-খানান উঠে দাঁড়ায়। তারপর নবাবের অনুমতি নিয়ে বললে, জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন তো দরবারের কাজ আজ এখানেই শেষ হলে ভাল হয়।

কেন? প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

জবাব দেয় সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি, বলছিলাম এই জন্যে যে জাঁহাপনার মনমেজাজ আজ ঠিক্ শরিফ্ নেই। তা'

ছাড়া ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় আর নবাবজাদা যদি সত্যি সত্যি এমন একটা ঘটনায় জড়িত থাকেন তো—

বিশিষ্ট ব্যক্তিটি কথার মাঝখানে থামতেই মুর্শিদকুলী খাঁ বলে ওঠেন, তাহলে সর্বসমক্ষে এই দরবার গৃহে আপনাদের নবাবের মাথা হেঁট্ হবে। পুত্রের বদ্‌নামীতে আপনাদের ইমান্‌দার নবাবের মান সম্মান বিলকুল্ বরবাদ্ হয়ে যাবে, তাই না?

সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি আর কিছু না বলে চুপ্ করে থাকে।

একটু সময় থেমে মুর্শিদকুলী খাঁ বললেন, হ্যাঁ, তা হবে। আমার সম্মান বরবাদ্ হবে বৈকি। কিন্তু উপায় কী? তাই বলে আপনাদের সবাইকে বিদায় দিয়ে চুপি চুপি নিজের মান রক্ষা করতে আমি একদম গররাজি। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, দরবার চল্‌বে। মহম্মদ জান ফিরে না আসা পর্যন্ত দরবার চল্‌বে। এই আমার হুকুম।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাওয়ার পর চেহেল সেতুনে এসে হাজির হয় নগর কেতোয়াল মহম্মদ জান। সঙ্গে একদল সিপাহী পরিবেষ্টিত নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ। লোকনাথের পিছনে ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় ধীর কুণ্ঠিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় একজন স্ত্রীলোক—সরমা।

আশ্চর্য পরিবর্ত্তন ঘটে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ভাবভঙ্গিতে। সেই রুষ্ট ভয়ঙ্কর চেহারার উপর ফুটে ওঠে একটা করুণ বিষাদের ছায়া। যেন এমন একটা ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা করলেও মনে প্রাণে তিনি এতক্ষণ বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তাঁর একমাত্র পুত্র দিলজিৎ সত্যি সত্যি এর সঙ্গে

জড়িত থাকবে। বোধহয় এতক্ষণ মনে মনে এর উল্টোটাই কামনা করেছিলেন তিনি।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে তাঁর। মনে মনে হয়ত গুরু পীর মসনদ শাহকে স্মরণ করে বলেন, শেষে কিনা এমন একটা দৃশ্যও আমাকে দেখতে হ'ল, হজরত! এর চাইতে যে আমার মৃত্যুও ছিল অনেক ভালো! সেই ভরদুপুরে আকণ্ঠ শরাব পান করে হাতে পায়ে বেড়ি-পরা অবস্থায় তখনও কিন্তু টলছিল দিলজিৎ খাঁ। আর মধ্যে মধ্যে জড়িত কণ্ঠে বলে চলছিল, হঠ্ যাও—হঠ্ যাও কোতোয়াল কী বাচ্চা। জানো আমি কে? নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর লেড়্কা দিলজিৎ খাঁ। আমাকে কয়েদ করবে তুমি? এতবড় এলেম তোমার? হঠ্ যাও—হঠ্ যাও, উল্লুক।

পরক্ষণেই আবার অদূরে দাঁড়ানো সরমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, আও—আও। অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন, গুল্‌বদনী? এসো, আরও কাছে এসো, আমার দিল্‌বাগিচার বুলবুল।

দরবার গৃহের সবাই তটস্থ। সকলের মনেই একটা কী হয় কী হয় ভাব। সকলেই মাতাল দিলজিৎ আর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে পর্যায়ক্রমে দেখতে থাকে! সকলেই একটু আশ্চর্য বোধ করে নবাবের এই শান্ত সংযত ভঙ্গিটি দেখে। এমন একটা অবস্থায় নবাবের যে রূপটি ফুটে ওঠার কথা ছিল তার পরিবর্তে এই শান্ত রূপ সত্যিই অকল্পনীয়। প্রায় অবিশ্বাস্য। খানিকক্ষণ মৌন থেকে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সজলনেত্রে সরমার দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে বললেন, ঐ জানোয়ারটা তোমার ইজ্জৎ কেড়ে নিয়েছে মা?

ঘোমটার আড়াল থেকে কোন জবাব দেয় না সরমা। তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

নবাব আবার বললেন, বল মা, বল। সত্যি কথা বল। তোমার নিজের কাছ থেকে শুনতে চাই আমি।

সরমার ঘোমটার ফাঁক থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ে শ্বেতপাথরের মেঝেয়। সামান্য একটু মাথা নেড়ে সে নবাবের কথায় সায় দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে লোকনাথের মুখ থেকে, হায় ভগবান, এ কী করলে তুমি!

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন, হায় খুদা!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নবাব আবার বললেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, মা, আমি স্বীকার করছি আমি সত্যিই অপরাধী। রাজ্যের শাসনকর্তা হয়ে অবলা নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছি আমি। আমার জীবনে এর চাইতে কলঙ্কের আর কিছু হতে পারে না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা, যে তোমার ইজ্জৎ নিয়েছে আমি তার গর্দানা নেব। নিশ্চয়ই নেব। হোক্ গিয়ে সে আমার একমাত্র পুত্র—এই নবাবী তক্তের ভবিষ্যৎ অধিকারী। তবুও তার রেহাই নেই। পাপের শাস্তি পেতেই হবে তাকে। এতটুকু দয়া দেখাবো না ঐ জানোয়ারকে। একটু থেমে আবার বললেন তিনি, তুমি মা তোমার স্বামীর সঙ্গে এবার বাড়ি যাও। ঐ বেতমিজকে আমি আপাততঃ কয়েদ করে রাখছি। এরপর ওর বিচার হবে। নবাব থামতেই লোকনাথ বলে ওঠে, তা হয় না জাঁহাপনা! সরমাকে আমি আর গ্রহণ করতে পারি না।

কেন ? হঠাৎ গর্জে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

আমাদের হিন্দুধর্মের বিধান, জাঁহাপনা। জবাব দেয় লোকনাথ।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন মুর্শিদকুলী খাঁ। বহু বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে তাঁর। নিজেরই জীবনের ঘটনা। সুদূর ইস্পাহান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন মহম্মদ হাদি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে ইস্‌লাম্ গ্রহণ করতে হয়েছিল সেখানে। তখন তাঁর নিজের ইচ্ছার কোন দাম ছিল না। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। দেশে ফিরে এসে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজের শিরোমনিদের দুয়ারে দুয়ারে অনেক ধর্ণা দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নি তাঁকে। তাঁর অনুনয় বিনয়কে উপেক্ষা করে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল নিষ্ঠুর ভাবে। সেই হিন্দুসমাজের বিধানের কথাই আজ বলছে ঐ লোকনাথ।

নবাব বললেন, তাই বলে তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করবে ?

তা' ছাড়া উপায় কি, জাঁহাপনা ? জবাব দেয় লোকনাথ, স্ত্রীকে গ্রহণ করে আমি তো আর সমাজচ্যুত হতে পারি না।

মুর্শিদকুলী খাঁর এতক্ষণের শান্ত সংযত ভঙ্গিটি যেন একটু একটু করে অদৃশ্য হতে থাকে। পরিবর্তে কেমন যেন একটা বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পায় তার কণ্ঠস্বরে। তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, ভীরু কাপুরুষের দল! শয়তানেরা ঘরের আওরৎকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জৎ নষ্ট করলে। বাধা দিতে পারলে না কেউ। ঘরের বোন

বেটীকে রক্ষা করার মুরোদ নেই। কেবল সেই অসহায়দের সমাজ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে ওস্তাদ। ধ্বংস হবে—বিলকুল ধ্বংস হবে তোমাদের ঐ সমাজ। ওদের চোখের জলই তোমাদের সমাজের ধ্বংস ডেকে আনবে। খুদাতালার দুনিয়ায় এমন অবিচার কিছুতেই চলতে পারে না। লোকনাথের কথায় ঘোমটার আড়ালে থেকে কাঁদছিল সেই অসহায় বধূটি। কান্নার আবেগে থেকে থেকে কাঁপছিল তার দেহটা। কেবল তার সতীত্বই নষ্ট হয় নি, স্বামী, সংসার, সমাজ কিছুই রইল না তার। সে আজ সর্বহারা নিরাশ্রয়।

একটু থেমে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই মা। আমার রাজ্যে তুমি নিরাশ্রয় হবে না। ওরা তোমাকে ঘরে নিতে চায় না। না চায়, না নিক্, তোমার কোন কষ্ট হবে না মা। তুমি যেখানে যেভাবে থাকতে চাও সেইভাবেই তোমার থাকার ব্যবস্থা আমি করবো, তোমার সারাজীবনের দায়িত্ব আমি নিলাম, মা।

নবাবের আদেশে একজন রাজকর্মচারী কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। সে সরমাকে নিয়ে যাবে নবাবের জেনানী-অতিথিশালায়। তাকে অনুসরণ করে কাঁদতে কাঁদতে চেহেল সেতুন ছেড়ে বেরিয়ে যায় সরমা। দরবার ছেড়ে শুষ্ক মুখে চলে যায় লোকনাথ। আর প্রহরী পরিবেষ্টিত নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ টলতে টলতে পা বাড়ায় কয়েদখানার দিকে। কোতোয়াল মহম্মদ জানের দিকে তাকিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ হুকুম দেন, আজ থেকে ঠিক একমাস পরে নিজামত আদালতে বিচার হবে দিলজিতের। বিচার করব খোদ আমি। এই এক মাসের মধ্যে দিলজিতের বিরুদ্ধে সমস্ত

সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করবে তুমি। হুঁশিয়ার থেকো, নবাবজাদা বলে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে কোন রকম গাফিলতি হয় না যেন।

দীর্ঘ কুর্নিশ করে ভাবলেশহীন মুখে জবাব দেয় মহম্মদ জান, জাঁহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

তিন

কান্নার রোল ওঠে নবাবের হারেমে। কেঁদে কেঁদে এক রকম শয্যা গ্রহণ করে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র স্ত্রী নসেরু বেগম। কুপুত্র হলেও দিলজিৎ তার নিজের পেটের সন্তান তো বটে। সেই সন্তান—বাংলা উড়িষ্যার নবাবী তক্তের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী দিলজিৎ আজ কারারুদ্ধ। শুধু তাই নয়, নিজামত আদালতে তার বিচার করবেন নবাব নিজে। শাস্তিও দেবেন নিশ্চয়ই। সম্ভবতঃ চরম দণ্ডই দেবেন তাকে। সেদিন চেহেল সেতুনের দরবার গৃহে সর্বসমক্ষে সেই ইঙ্গিতই করেছিলেন তিনি।

কিন্তু এমন কী অপরাধ করেছে দিলজিৎ যার জন্যে চরম দণ্ড পেতে হবে তাকে? মনে মনে ভাবতে থাকে নসেরু বেগম, দিলজিৎ অন্যায় করেছে সন্দেহ নেই। সে একজন কুলবধূর ইজ্জৎ নষ্ট করেছে। নিঃসন্দেহে সে অপরাধী। কিন্তু তার জন্যে চরম দণ্ড দিতে হবে তাকে? অল্প বয়সে নবাবজাদা, বাদশাজাদাদের এ ধরণের দোষত্রুটি অল্পবিস্তর প্রায় সকলেরই থাকে। তাই বলে, এর জন্যে কোন্ পিতা ছেলেকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করে? দিল্লীর নবাবজাদা সেলিমের কি এমন দোষত্রুটি ছিল না? তাই বলে কি আকবর বাদশা সেলিমকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন? বাদশা আকবরও তো ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে পুত্রের

প্রাণদণ্ড দিতে হয়নি তাকে। তার স্বামী নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কি আকবর বাদশার চাইতেও ন্যায়পরায়ণ? না, এটা তাঁর কেবল গোঁয়ার্তুমি! আসলে, নবাব মর্শিদকুলী খাঁর মনটা পাথর দিয়ে তৈরী। সেখানে স্নেহ ভালবাসা বলে কোন কিছুর স্থান নেই। দিলজিৎকে কোনদিনই ভালবাসেন না তিনি। তাই নিজের হাতে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে একটুও হাত কাঁপবে না তাঁর।

দিনরাত নিজের মনে এমনি ধরণের আলোচনা করে নসেরুবেগম আর একা একা কাঁদে। আজ তিনদিন হয়ে গেল নবাব একবারও হারেমে আসেন নি, দেখাও হয়নি নসেরু বেগমের সঙ্গে। হয়ত ইচ্ছা করেই দেখা করেন নি। হয়ত ভেবেছেন দেখা হলেই নসেরু তাঁকে পুত্রের জন্যে অনুরোধ করবে।

হ্যাঁ, নসেরু অনুরোধ করবে বৈকি। অনুরোধ করতেই হবে তাকে। সে দিল্‌জিতের মা। মা ছাড়া সন্তানের মর্ম কে বেশি বুঝবে?

হারেমের নবাবজাদী মহলে আজিমুনের অবস্থাও তার মায়ের মতই। মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে তার। ফারসী সাহিত্যের পুঁথিপত্রেও আর হাত পড়ে না। পরিচারিকাদের, বিশেষ করে প্রধানা পরিচারিকা রাবেয়ার সঙ্গে হাসি ঠাট্টাও বন্ধ হয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়াও প্রায় ছেড়ে দেবার উপক্রম। দিনরাত কেবল বসে বসে ভাবে। ভাবে তার দাদা দিলজিতের কথা। কেন তার দাদা এমন একটা কাণ্ড করতে গেল? বাইমহল্লায় তো আউরতের অভাব ছিল না। তবে কেন ঐ স্ত্রীলোকটির উপর নজর পড়ল তার?

আজিমুন্ তার এই উচ্ছৃঙ্খল দাদাটিকে সত্যিই

ভালবাসতো। সে নিজেও অনেক চেষ্টা করেছে দিলজিৎকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু পারেনি। অনেকবার সে রাবেয়াকে সঙ্গে নিয়ে দিলজিতের মহলে গেছে। আজিমুন্‌কে দেখে দিলজিৎ প্রশ্ন করেছে, একি তুই এখানে কেন, বোন ?

এসেছি তোমার কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখবো বলে। অভিমানের সুরে জবাব দিয়েছে আজিমুন্‌, ছি—ছি দাদা, এ তুমি কী করছো ? বাবার পর তুমিই না ঐ মস্‌নদে বসবে ? দেশের প্রজারা কি তোমাকে শ্রদ্ধা করবে ভেবেছো ?

সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে দিলজিৎ, না—না। যতটা রটে আমি ঠিক্ ততটা খারাপ নই, বোন। আর—মস্‌নদের কথা বলছিস ? ঐ মস্‌নদে আমার একটুও লোভ নেই।

তাই বলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে ? এমনিভাবে পাপের মধ্যে ডুবে থাকবে কেবল ?

দিলজিৎ আর জবাব দিতে পারে নি।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে আজিমুনের। এক সাথে মানুষ হয়েছে তারা। এক সাথেই খেলাধূলা করতো। একবার দিলজিৎ রাগ করে বোনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল। আজিমুন্‌ কিন্তু কাঁদে নি। অভিমান-ভরা চোখে কেবল তাকিয়েছিল দাদার মুখের দিকে। বোনের সেই দৃষ্টি কিন্তু সহ্য করতে পারে নি দিলজিৎ। নিজেই কেঁদে ফেলেছিল। অবশেষে আজিমুন্‌কেই অনেক সাধ্য সাধনা করে থামাতে হয়েছিল দাদার কান্না।

সেই দিলজিৎ-ই সংসর্গ দোষে বিপথে চলে গেল এই অল্প বয়সে। কারুর মানা শুন্‌ল না। স্বয়ং মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনও কিছু করতে পারলে না তার তাই এখন পীর

মসনদ শাহের দরগায় গিয়ে দাদার জন্যে প্রার্থনা জানায় আজিমুন্। খুদাতালার কাছে মঙ্গল কামনা করে।

আজিমুন্ তাই ঠিক করেছে পিতার কাছে সে অনুরোধ জানাবে। বলবে, ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ো না, বাবা। অন্ততঃ প্রাণে বেঁচে থাকতে দাও ওকে।

কিন্তু আজ তিনদিনের মধ্যে অন্দর মহলেই আসেন নি নবাব। তাঁর দেখাই পায়নি আজিমুন্।

রাবেয়াকে অবশ্য বলে রেখেছে নবাব অন্দর মহলে এলেই যেন খবর দেওয়া হয় তাকে। তাই প্রতিদিন সে জিজ্ঞেস করে রাবেয়াকে, কিরে বাবা অন্দরে এসেছেন?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় রাবেয়া, না আসেননি। তারপর একটু থেমে আবার বললে, আপনি কেন শুধু শুধু উতলা হচ্ছেন, নবাবজাদী? আজ না হয় দু'দিন পরে নবাব সাহেব অন্দরে আসবেনই। নিজামত আদালতে নবাবজাদার বিচারের তো এখনও ঢের দেরি আছে।

হ্যাঁ, তা' আছে। অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয় আজিমুন্।

তবে কেন এত ভাবনাচিন্তা করছেন, নবাবজাদী? নবাবসাহেব খুবই ভালবাসেন আপনাকে। আপনার অনুরোধ কিছুতেই ঠেলতে পারবেন না তিনি। তা'ছাড়া বেগম সাহেবাও আছেন। তিনিও নিশ্চয়ই কেঁদে কেটে অনুরোধ করবেন তাঁকে। স্ত্রী কন্যার অনুরোধ ঠেলতে পারে এমন মরদ ক'টা এই দুনিয়ায় আছে, নবাবজাদী?

জবাবে আজিমুন্ বললে, তুই এখনও নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে ঠিক চিনতে পারিস্ নি, রাবেয়া। ন্যায়ের চাইতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউই তার কাছে বড় নয়।

বেশ তো! নবাব অন্দরমহলে আসুন। আপনারা

সবাই অনুরোধ করুন তাঁকে। দেখুন, কোন ফল হয় কিনা। আমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে কিন্তু আমাকে মোটা রকমের বক্শীস্ দিতে হবে নবাবজাদী।

একটু ম্লান হেসে আজিমুন্ বললে, বেশ, তাই হবে। তোর কথা সত্যি হলে তোকে হাজার আশ্‌রফি বক্শীস্ দেব।

চতুর্থদিন সন্ধ্যায় হারেমে প্রবেশ করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। যুক্তি, তর্ক, মান, অভিমান, অশ্রু প্রভৃতি নারীজাতির তূণে যতগুলি অস্ত্র থাকে তার প্রত্যেকটি একে একে নবাবের উপর প্রয়োগ করে নসেরু বেগম। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ অবিচল। তাঁর একমাত্র কথা, আমার মনটাকে দুর্বল করতে চেষ্টা করো না, নসেরু। ভুলে যেও না আমিই দিলজিতের পিতা। আমার মনটাও পাথরে তৈরি নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়। দিলজিৎ যে গোস্তাকি করেছে তার ক্ষমা নেই। তুমিও সেই সরমার মত নারী। নারীর কাছে তার ইজ্জৎ কত বড় তা' নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পার। তোমার ছেলে সরমার সেই ইজ্জৎ কেড়ে নিয়েছে। তাকে পথের ধূলোয় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গৃহস্থের কুলবধূ আজ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমার অতিথিশালায় আশ্রিতা।

কিন্তু দিলজিৎকে চরম দণ্ড দিলেই কি সেই মেয়েটি তার হারানো ইজ্জৎ ফিরে পাবে? নবাবের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নসেরু বেগম।

না, তা পাবে না। জবাব দেন মুর্শিদকুলী খাঁ, কেউ তার ইজ্জৎ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু রাজ্যের শাসনকর্তা হিসাবে আমি মনে করতে পারবো যে আমার কর্তব্য আমি করতে পেরেছি। অন্যায়কারীকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। নিজের পুত্র বলে তাকে ক্ষমা করিনি আমি। তা'ছাড়া

আমার মর্জিমাফিক তাকে শাস্তি দিতে চাইনি বলেই নিজামত আদালতে তার বিচারের ব্যবস্থা করেছি। ন্যায় বিচার হবে সেখানে। সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হবে। সেই সাক্ষ্য প্রমাণে যদি সত্যিই প্রমাণিত হয় তোমার ছেলে দোষী তা'হলে তাকে চরমদণ্ড গ্রহণ করতেই হবে।

নবাবের কঠোরতার কাছে হার মানে নসেরু বেগম। নিঃশব্দে কেবল অশ্রুবিসর্জন করতে থাকে সে।

নবাবের আগমন বার্তা একটু দেরিতেই পেয়েছিল আজিমুন্। তাই সে প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে যখন বেগম মহলে এসে হাজির হয় তখন পালঙ্কের উপর জরি বসানো মখমলের তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। আর পালঙ্কের অপরপ্রান্তে স্থির হয়ে বসেছিল নসেরু বেগম। চোখে তার জল।

বাবা ও মার অবস্থা দেখে এক লহমায় ব্যাপারটা অনুমান করে নেয় আজিমুন্। তারপর পিতার কাছে সরে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে ডাকে—বাবা।

কে! প্রায় চমকে ওঠেন নবাব। কন্যার মুখের পানে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, আজিমুন্, আয় মা, কাছে আয়।

আজিমুন্ পিতার কাছে বসতেই নবাব একহাতে তার চিবুক তুলে ধরে সস্নেহ দৃষ্টিতে কন্যার মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোকে এত শুকনো লাগছে কেন মা? অসুখ করে নি তো?

না বাবা, আমি বেশ ভালই আছি। কেবল দাদার জন্যে—।

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় আজিমুন্।

সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। বললেন, দাদার জন্যে মন খারাপ হয়েছে? তা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু কী করবি মা, বল্! সবই নসীব। নইলে আমার ছেলে হয়ে ও এমন জানোয়ার হয়ে উঠ্‌বে কেন? ইমান্‌দারের ছেলে এমন বেয়াদপ হবে কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আজিমুন্ আবার বললে, দাদাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই কি নেই, বাবা?

না, মা, কোন উপায় নেই। ওর গোস্তাকির মাশুল ওকে দিতেই হবে। এখন খুদাতালার মর্জি।

একটু যেন আশাহত হয় আজিমুন্। বললে, দাদার অপরাধের তুলনা নেই। কিন্তু বলছিলাম কি, চরম দণ্ড না দিয়ে যদি অন্ততঃ প্রাণে বেঁচে থাকতে দাও ওকে—। একটু হাসেন মুর্শিদকুলী খাঁ। আজিমুনের মনে হয় সেই হাসি যেন কান্নারই নামান্তর। ম্লান কণ্ঠে বললেন তিনি, তুই মা অনেক লেখাপড়া শিখেছিস। তুই হয়ত বুঝতে পারবি আমার কথা। জেনে শুনে অন্যায়কে যে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় সে সাক্ষাৎ শয়তান। ন্যায়ের পথ থেকে এতটুকু সরে গেলেও খুদাতালা তাকে ক্ষমা করেন না। সে হয় দোজখের কীট। আমাকে কি তুই তাই হতে বলিস্ মা?

মুখে আর কথা জোগায় না আজিমুনের। পিতার কাছে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে থাকে সে।

খবর শুনে রাবেয়া পর্যন্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে। আজিমুনের দিকে তাকিয়ে বললে, তবে এখন উপায় কি, নবাবজাদী।

কোন উপায় নেই রাবেয়া—কোন উপায় নেই। দাদাকে

তার পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আজিমুন্।

নবাবজাদীকে আর সান্ত্বনা বাক্যে ভুলোতে চেষ্টা না করে কেবল তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে রাবেয়া।

একসময় রাবেয়া অনুনয়ের সুরে বললে, অনেক রাত হল, নবাবজাদী! এবার উঠুন। খানাপিনা সেরে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কিছু একটা উপায় বের করতেই হবে।

না, রাবেয়া। আজ রাতে খেতে ইচ্ছে নেই আমার। বাঁদীদের সেই কথাই গিয়ে বলে দে তুই।

তা' কি হয়, নবাবজাদী? এমনি করে না খেয়ে শরীর খারাপ করে লাভ কী? আপনি ঠিক দেখবেন, কাল সকালে একটা কিছু উপায় আমি বের করবই।

কী উপায় বের করবি তুই?

তা' এখন বলব না। মনে মনে একটা রাস্তা ঠিক করেছি, নবাবজাদী, আজ রাতটা আমাকে আরও একটু ভাবতে সময় দিন। কাল সকালেই আপনাকে বলবো।

সত্যি বলছিস্? রাবেয়ার চোখে চোখ রেখে বললে আজিমুন্, আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছিস না তো?

না, নবাবজাদী। এই কসম্ খেয়ে বলছি। কাল সকালেই আপনাকে বলবো। পরের দিন সকালেই রাবেয়াকে ধরে বস্‌লো আজিমুন্। বললে, কৈ, এবার বল্। কী উপায় বের করেছিস তুই।

একটা বড় আঙ্গুরের ছড়া থেকে একটি একটি করে আঙ্গুর ছাড়িয়ে জয়পুরী নক্সাকাটা একখানা রূপোর রেকাবীতে

রাখতে রাখতে রাবেয়া জবাব দেয়, হ্যাঁ বলছি। আগে আপনি এ'গুলো খেয়ে নিন, তারপর বলছি!

রেকাবী থেকে একটি আঙ্গুর তুলে নিয়ে মুখে পুরে আজিমুন্ বললে, এই তো খাচ্ছি, এবার বল্।

এক মূহূর্ত থেমে রাবেয়া বললে, নিজামত আদালতে আগে নবাবজাদার বিচার হবে, তারপর নবাব সাহেব শাস্তি দেবেন তাকে, তাইতো?

মাথা নেড়ে সায় দেয় আজিমুন্।

কিন্তু আদালতে যদি নবাবজাদার দোষ প্রমাণ না হয়, তা'হলে নবাবসাহেব নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন না তাকে।

ধনুকের মত বাঁকা ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে আজিমুনের। বললে, বোকার মত এ কী বলছিস্ তুই? প্রমাণ হবে না মানে? সেই মেয়েটি নিজের মুখে এসে বলবে যে নবাবজাদা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জৎ নষ্ট করেছে। এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

না, নবাবজাদী। ঠিক হল না আপনার কথা। শুধুমাত্র সেই মেয়েটির অভিযোগেই যদি নবাবজাদার দোষ প্রমাণ হত, তা'হলে নবাব সাহেব নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানকে একমাসের সময় দিয়ে তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে বলতেন না।

একটু চিন্তা করে আজিমুন্ বললে, বেশ তাই না হয় হল। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ যে জোগাড় হবে না তা' তুই বুঝলি কি করে?

জোগাড় যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, নবাবজাদী। রাবেয়া জবাব দেয়।

তুই তো নগর কোতোয়ালকে ভালমতই চিনিস্,

রাবেয়া। তার স্বভাব চরিত্রও অজানা নয় তোর। এমন লোককে কী করে তুই বশে আনবি বুঝতে পারছি না।

তা'হলে আপনি আছেন কী জন্যে, নবাবজাদী ?

চম্‌কে ওঠে আজিমুন্‌। বললে, আমি ? আমি কী করবো ?

অনুরোধ করবেন তাকে। আপনার প্রেমে সে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। দেখবেন, আপনার যে কোন অনুরোধ রাখতে সে জান কবুল করতেও পিছিয়ে যাবে না।

মুখখানা হঠাৎ রাঙ্গা হয়ে ওঠে আজিমুনের। সেদিন সেই তাঞ্জামের মধ্যে বসে মহম্মদ জানের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময়ের কথা মনে পড়ে। সেদিন মহম্মদ জানের নীরব দৃষ্টির ভাষা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় নি তার।

একটু থেমে আজিমুন্‌ বললে, কিন্তু কোন্‌ মুখে আমি তাকে এমন একটা অন্যায় অনুরোধ করবো ?

দেখুন, নবাবজাদী, ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলবেন না এখানে। নবাবজাদাকে যদি বাঁচাতেই হয় তবে এটাই একমাত্র পথ। অন্য কোন পথের কথা জানা নেই আমার। আর এতে লজ্জারই বা কী আছে ? কোতোয়াল তো ঠিক্‌ বাইরের লোক নয়। দু'দিন বাদেই তো সে আপনার জিন্দেগীর রোশনি হতে যাচ্ছে। এমন লোককে যদি একটা অনুরোধ করেনই বা, তাতে এমন ক্ষতি কিসের ? তা'ছাড়া তার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো এ'কথা আর কারুর কাছে বলতে যাচ্ছে না।

আবার খানিকক্ষণ চিন্তা করে আজিমুন্‌। তারপর বললে, কিন্তু তুই একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখ, রাবেয়া। সবার অলক্ষ্যে ওর মোকানে গিয়ে ওকে অনুরোধ—,

আজিমুনের কথা শেষ হবার আগেই রাবেয়া বলে ওঠে, আপনি ওর মোকানে যাবেন কেন নবাবজাদী ?

তা'হলে ওকে অনুরোধ করবো কী করে ? চিঠি লিখে ?

না, তাও নয়। চিঠিতে এসব কাজ হয় না।

তবে ?

কোতোয়ালকেই নিয়ে আসবো এখানে।

দারুণ চম্‌কে ওঠে আজিমুন্। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সেকি ? বাইরের একজন মরদ্‌কে তুই এই হারেমে আনবি কি করে ? চারিদিকে খোজা প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি।

আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে একটু হাসে রাবেয়া। তারপর বললে, খিড়কির গোপন সুড়ঙ্গপথের নিশানা আমি জানি, নবাবজাদী। গভীর রাতে ঐ পথেই তাকে নিয়ে এসে তুল্‌বো আপনার এই মহলে। কাকপক্ষীটিও টের পাবে না কিছু।

আবার কিছুক্ষণ মৌন থেকে আজিমুন্ অবশেষে বললে, যা ইচ্ছা কর্ তুই। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে। বাবার কাণে একথা উঠ্‌লে আর রক্ষা থাকবে না।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নবাবজাদী। আজ রাতেই তাকে নিয়ে আসবো আপনার কাছে।

* * * *

গভীর রাত। রাজধানী মুর্শিদাবাদের পথ ঘাট একেবারেই ফাঁকা। সুপ্তিমগ্ন নাগরিকেরা। মাঝে মধ্যে কেবল দু'একজন বার্তাবাহী সিপাহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কোন জরুরী

বার্তা কিম্বা নবাবের কোন বিশেষ ফর্মান নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের ঘোড়ার খুরের ধ্বনি অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে যেতেই আবার নিঝুম হয়ে আসছে চারিদিক।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে পরিশ্রান্ত নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান নিজের প্রাসাদোপম মোকানে রাতের খানাপিনা শেষ করে সবে এসে পালঙ্কের উপর উঠে বসেছে। একা মানুষ। এতবড় মোকানের কোনই প্রয়োজন তার নেই। সুযোগ পেয়ে কথাটা একদিন বলেওছিল নবাবকে। জবাবে নবাব বলেছিলেন, না, তা হয় না। তুমি নগর কোতোয়াল। প্রয়োজন না থাকলেও ঐ মোকানেই থাকতে হবে তোমাকে। এর চাইতে কোন ছোট মোকান তোমার পদমর্যাদার সঙ্গে মানাবে না।

বাধ্য হয়ে এই মোকানেই থাকতে হচ্ছে তাকে। অবশ্য একদল বান্দা-বান্দী আছে পরিচর্যার জন্যে। তারা থাকে নীচের তলায়। উপরের তলার অধিকাংশ ঘরগুলিই ফাঁকা পড়ে থাকে। শরাব তো নয়ই, এমনকি গড়গড়া কিম্বা পানেও আসক্তি নেই মহম্মদ জানের। তাই পালঙ্কের উপর বসে বেনারসী মশলা চিবোতে চিবোতে নবাবজাদী আজিমুনের কথাই ভাবছিল সে। আজকাল এটাই হয়েছে তার একমাত্র বিলাস। রাতে বিছানায় শুয়ে প্রথমটায় কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না তার। ঘুরে ফিরে কেবল মনের আয়নায় ভেসে ওঠে নবাবজাদী আজিমুনের মুখখানা। সেদিনের সেই এক ঝলক্ দেখাই তার মনের মধ্যে একটা পাকাপাকি দাগ কেটেছিল। মনের মণিকোঠায় সে প্রতিনিয়ত অনুভব করত আজিমুনের অস্তিত্ব।

সেদিন রাতেও পালঙ্কের উপর বসে তার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল মহম্মদ জানের।

হঠাৎ বন্ধ দরজার উপর বাইরে থেকে কে যেন মৃদু করাঘাত করে।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে মহম্মদ জান। একটু বিরক্তও হয়। এই গভীর রাতে কে আবার এলো? কী চায় সে?

পালঙ্ক থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দেয় মহম্মদ জান।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল তারই মোকানের একজন প্রহরী। মহম্মদ জানের বিরক্ত মুখের পানে তাকিয়ে সে কৈফিয়তের সুরে বলতে থাকে, আমার কোন কসুর নেই, হুজুর। আমি অনেক করে বলেছি কিন্তু সে শুনতে চায় না আমার কথা। মর্দানা হলে হয়ত জোর করে তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু জেনানা—'

জেনানা?

মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে মহম্মদ জানের। প্রশ্ন করে, কী চায় সে?

হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বলছে, তার নাকি বিশেষ প্রয়োজন।

এক মূহূর্ত ভেবে নেয় মহম্মদ জান। এত রাতে কে এই জেনানা এলো তার সঙ্গে দেখা করতে? কী প্রয়োজন তার? মুখে বললে প্রহরীকে, আচ্ছা, তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও তাকে।

একটু পরেই লম্বা কালো বোরখায় ঢাকা একটা মূর্তি দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে প্রবেশ করে সেই কক্ষে। মহম্মদ জানের দিকে তাকিয়ে নারীকণ্ঠে সেই মূর্তি বললে, দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দিন, কোতোয়াল সাহেব।

কেন ? ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে মহম্মদ জান।

প্রয়োজন আছে। জবাব দেয় সেই নারীমূর্তি।

একটু চিন্তা করে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে মহম্মদ জান নিজের পালঙ্কের উপর এসে বসতেই সেই নারীমূর্তি বোরখাটা খুলে ফেলে বললে, আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, কোতোয়াল সাহেব। তবে হয়ত আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি রাবেয়া—নবাবজাদীর প্রধানা সহচরী।

বিস্ময় আবিষ্ট চোখে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে মহম্মদ জান। প্রশ্ন করতেও যেন ভুলে যায় সে।

নবাবজাদীর হুকুমেই আপনার কাছে আসতে হল আমাকে। আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো? কোথায়? কেন? এক রকম নিজের অজান্তেই মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে আসে মহম্মদ জানের।

হ্যাঁ, নবাবজাদীর আদেশেই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। নবাবজাদী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে ওঠে মহম্মদ জানের। বুকের মধ্যে তপ্ত রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে অস্বাভাবিক বেগে। মূহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে ওঠে মনটা। নবাবজাদী আজিমুন্‌ ডেকেছে তাকে। সহচরীকে পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু কেন, কী প্রয়োজন তার? অবশ্য তার প্রয়োজনের ব্যাপারটা মহম্মদ জানের কাছে গৌণ। আজিমুন্‌ তাকে ডেকেছে, এইটাই মুখ্য ব্যাপার। যে নারীর কথা চিন্তা করতে করতে সে অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিয়েছে, যে নারীকে আর একবার দেখবার আশায় দিনের

পর দিন উদ্গ্রীব হয়ে থেকেছে সে, যে নারীর সান্নিধ্য লাভের কল্পনামাত্রই সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সেই নারী—তার সেই দিল্‌বাগিচার বুলবুল আজ নিজে যেচে ডেকে পাঠিয়েছে তাকে।

কঠিন সংযমে নিজের মনোভাব গোপন রেখে মহম্মদ জান বললে, কিন্তু হারেমে যাবো কী করে? চারিদিকে খোজা প্রহরীর দল রয়েছে—।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোতোয়াল সাহেব। আপনাকে আমি খিড়কির সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে যাবো। জবাব দেয় রাবেয়া।

কৃত্রিম ঔদাসীন্যের সুরে মহম্মদ জান বললে, বেশ যাবো, নবাবজাদী যখন এত্তেলা পাঠিয়েছেন তখন তো যেতে হবেই।

এবার খিল্‌খিল্ শব্দে হেসে ওঠে রাবেয়া। হাসতে হাসতে বললে, নবাবজাদী ডেকেছেন বলেই কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে যেতে চাচ্ছেন বুঝি? মনের দিক থেকে তেমন কোন তাগিদ পাচ্ছেন না কোতোয়াল সাহেব?

ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে রাবেয়া। তাই, কোন জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে কেবল একটু স্মিত হাসি হাসে মহম্মদ জান। তারপর আবার বললে, তা'হলে তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি পোশাক বদলে আসছি।

পোষাক বদলাতে পাশের ঘরে যেতে গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ায় সে। প্রশ্ন করে রাবেয়াকে, কিন্তু নবাবজাদী কেন ডেকেছেন, বলতে পারো কিছু?

একটু চিন্তা করে রাবেয়া বললে, হ্যাঁ, পারি বৈকি। নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁর বিষয়েই তিনি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মহম্মদ জানের। আবার প্রশ্ন করে রাবেয়াকে, নবাবজাদা সম্বন্ধে তিনি কী কথা বলতে চান আমাকে?

দেখুন, কোতোয়াল সাহেব, আমি ঠিক্ সবকিছু জানি না। তবে নবাবজাদী তার দাদাকে খুবই ভালবাসেন। এই বিপদ থেকে তাঁর দাদাকে কী করে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়েই বোধ হয় তিনি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

মুহূর্তে ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় বুদ্ধিমান মহম্মদ জানের কাছে। আর পরিষ্কার হয়ে যেতেই স্তম্ভিত হয়ে ওঠে সে। একটু আগের সেই নবাবজাদীর সান্নিধ্য-লাভের উত্তেজনার উপর কে যেন জল ছিটিয়ে দেয়। সজাগ হয়ে ওঠে তার কর্ত্তব্যবোধ। গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে বেইমানী করবার জন্যেই নবাবজাদী আমাকে ডেকেছেন?

বেইমানী! এ কী বলছেন আপনি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রাবেয়ার।

হ্যাঁ, বেইমানী ছাড়া আর কী? নবাবজাদী নিশ্চয়ই জানেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তার পুত্রের অপরাধের ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের ভার আমার উপর দিয়েছেন।

এখন নবাবজাদী চাইছেন তাঁর দাদাকে রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে। এর একটিমাত্র অর্থই কেবল হয়, আর তা হচ্ছে আমার কর্ত্তব্যে গাফিলতি। সোজা কথায় নবাবের সঙ্গে বেইমানী।

রাবেয়া বুঝতে পারে কথাটা প্রকাশ করে সে ভাল করেনি। কোতোয়ালকে একবার নবাবজাদীর সামনে

হাজির করতে পারলে হয়ত অন্যরকম কিছু হতে পারতো। এখন আর উপায় নেই। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে সে। এখন আর ফিরিয়ে আনবার পথ নেই। আবার পরক্ষণেই তার মনে হয়, কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে সে ভালই করেছে। নইলে নবাবজাদীকে যদি কোতোয়াল সাহেবের এই কথা নিজের কানে শুনতে হত, তো দারুণ কষ্ট পেতেন তিনি।

কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুল করছেন, কোতায়াল সাহেব। নবাবজাদী চান না যে আপনি নবাবের সঙ্গে বেইমানী করেন। তিনি কেবল চান যে তাঁর দাদার যেন চরম দণ্ড না হয়।

রুষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে মহম্মদ জান, যে কাজ নবাবজাদা করেছেন তাতে তাঁর চরম দণ্ডই প্রাপ্য। নিজামত আদালতে তাঁর দোষ প্রমাণ হবেই, আর নবাবও তাঁকে চরম দণ্ডই দেবেন। ন্যায়নিষ্ঠ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের পুত্রকেও খাতির করবেন না। সে বিষয় নবাবজাদী নিশ্চিত থাকতে পারেন।

তা' হলে নবাবজাদীকে আপনি কোনরকমেই সাহায্য করতে পারেন না ?

ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয় মহম্মদ জান, নবাবজাদীকে গিয়ে বলবে যে তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হতাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। নিজের কর্ত্তব্যে এতটুকু অবহেলা করতে পারবো না আমি। তা' সে খোদ্ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বললেও নয়। তা'ছাড়া আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি বেইমানকে।

নিরুপায় রাবেয়া অবশেষে তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে।

বললে, নবাবজাদী আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রী। ভবিষ্যৎ স্ত্রীর এই প্রথম অনুরোধটুকু রক্ষা করতে পারবেন না আপনি?

একটু সময় চিন্তা করে বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয় মহম্মদ জান। তুমি ফিরে গিয়ে নবাবজাদীকে বলবে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে নবাবের সাথে বেইমানী করা ছাড়া তিনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি জান্ কবুল করেও তা' করতে প্রস্তুত।

তা'হলে আপনি নবাবজাদীর সঙ্গে দেখা করতেও যাবেন না? আশাহত সুরের মধ্যে কেমন যেন একটু তিক্তটা ফুটে ওঠে রাবেয়ার কণ্ঠে।

শুধু শুধু দেখা করে কী লাভ বল? তাতে নবাবজাদী হয়ত দুঃখই পাবেন।

খানিকক্ষণ স্থির হয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকে রাবেয়া। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বোরখা পরতে পরতে বললে, আমি তা' হলে চলি।

দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় রাবেয়া। আর অন্ধকারের মধ্যে বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান।

নবাবজাদীর মহলে নিজের কক্ষে বসে ছট্‌ফট্ করছিল আজিমুন। প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। সেই কখন বেরিয়েছে রাবেয়া। এখনও দেখা নেই তার।

সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর বসে ভাবছিল আজিমুন্। রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে—দাদা দিলজিতের কথা, মহম্মদ জানের কথা, নিজের কথা, আরও কত শত চিন্তা।

মহম্মদ জান সামনে এসে দাঁড়ালে কী করে তার সাথে

কথা আরম্ভ করবে, কী বলতে হবে তাকে। সে বিষয়েও বারকয়েক নিজের মনে মহড়া দিয়ে রেখেছে আজিমুন্। কিন্তু এখন পর্যন্তও যে দেখা নেই রাবেয়ার।

সময় যতই এগিয়ে যেতে থাকে মনের উৎকণ্ঠা ততই বাড়তে থাকে আজিমুনের। তবে কি কোন বিপদ হল তাদের? খোজা প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে গেল নাকি তারা?

এক সময় অবসান হয় সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার। কালো বোরখা খুলতে খুলতে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে কক্ষে প্রবেশ করে রাবেয়া।

পালঙ্ক ছেড়ে নেমে আসে আজিমুন্। দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে তাকে, কিরে এত দেরি হল কেন? তিনি কোথায়?

ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় রাবেয়া। তিনি এলেন না। তিনি নাকি বেইমানী করতে পারবেন না। বলেই আনুপূর্বিক সব কথা একে একে খুলে বলতে থাকে তাকে। শুনতে শুনতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে আজিমুন্। ছি—ছি, এযে সরাসরি প্রত্যাখ্যানের চাইতেও লজ্জাকর, অবজ্ঞার চাইতেও অপমানজনক। বিশেষ করে সহচরীর সামনে নিজের ভবিষ্যৎ স্বামীর এই আচরণে যেন মরমে মরে যায় আজিমুন্। মুখে কথা জোগায় না তার। নারী হলেও সে নবাবজাদী। নবাব বাদশার রক্ত তার দেহে। সেই মুহূর্তে দুঃখ কিম্বা অভিমানের চাইতেও যে বস্তুটি তার মনে প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তার নাম বিদ্বেষ। মহম্মদ জানের উপর একটা যুক্তিহীন অন্ধ বিদ্বেষ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কী, এতবড় স্পর্দ্ধা একজন সামান্য রাজকর্মচারীর!

খোদ্ নবাবজাদীর অনুরোধ পর্যন্ত টলাতে পারে না তাকে! এত বড় অহমিকা তার!

আজিমুনের এমনি মনোভাবে ইন্ধন যোগায় রাবেয়া। মহম্মদ জানের কথায় সে নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই সে হঠাৎ বলে ফেলে, কত আর হবে! কস্‌বীর ছেলে তো—।

কী—কী বললি? কোতোয়াল কস্‌বীর ছেলে? অকস্মাৎ চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করে আজিমুন্।

মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠে রাবেয়া। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। তাই আর ব্যাপারটা ঢাকতে চেষ্টা না করে সে বললে, হ্যাঁ, কস্‌বীর ছেলে ঐ কোতোয়াল মহম্মদ জান। এককালে ওর মা দরবারে গান বাজনা করতো।

সেকি, একথা এতদিন বলিস্ নি কেন আমাকে? বাবা কি একথা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন নবাবজাদী, জেনে শুনেও যখন তিনি তার সঙ্গে আপনার সাদীর ব্যবস্থা করেছেন, তখন আমি মাঝখানে বাগড়া দিতে যাই কেন— এ'কথা ভেবেই এতদিন বলি নি আপনাকে।

একটা প্রচণ্ড দুঃখে মনটা ভরাক্রান্ত হয়ে ওঠে আজিমুনের। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জেনে শুনে এমনি একটা লোকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন? এমন কথা যে বিশ্বাস করাই শক্ত।

নবাবজাদীর মনের কথা অনুমান করে রাবেয়া বললে, না-না, নবাবজাদী, নবাব সাহেবকে ভুল বুঝবেন না। তিনি ওর জন্মের ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে ওর গুণকেই বোধ হয় সমাদর করতেন। নবাব সাহেবের মহৎ প্রাণ। দিল্লীর

শাহ-ইন্-শাহের চাইতেও ইমানদার ব্যক্তি তিনি। তাই তিনি আপনাকেও তার হাতে তুলে দিতে ইতঃস্তত করতেন না। কিন্তু আল্লা মেহেরবান্। তিনি রক্ষা করেছেন আপনাকে। নইলে ঐ লোকটার হাতে পড়ে আপনার জিন্দ্‌গী বরবাদ্ হয়ে যেত। ওর পেটে পেটে দুষ্‌মনী বুদ্ধি। তাই নবাবজাদাকে রক্ষা করতে এতটুকু গরজ নেই ওর।

দুষ্‌মনী বুদ্ধি! কী বল্‌ছিস্ তুই রাবেয়া? বিস্মিত কণ্ঠস্বর আজিমুনের।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, নবাবজাদী। আমার মনে হয়, নবাবজাদাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারলে সবচেয়ে লাভবান হবে ঐ কোতোয়াল মহম্মদ জান। আপনাকে সাদী করে ভবিষ্যতে সে-ই মস্‌নদে বসতে পারবে। বোধ হয় সেই আশাতেই নবাবজাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে সে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রয়োজন এবং পরিবেশ সময় সময় পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। সেই মুহূর্তে, মহম্মদ জানের বিরুদ্ধে সেই কাল্পনিক অভিযোগ কিন্তু অম্লান-বদনে বিশ্বাস করে নবাবজাদী আজিমুন্। রাবেয়ার এই সন্দেহকে অভ্রান্ত বলে মনে হয় তার। মনে হয়, কস্‌বীর ছেলে মস্‌নদের লোভেই গালভরা বুলি আউড়ে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। ঘৃণায় মনটা রি-রি করে ওঠে কোতোয়ালের উপর।

বেচারা মহম্মদ জান! তার কর্ত্তব্যবোধ ও ন্যায়ের প্রতি আসক্তি এমনি এক কদর্থের রূপ ধরে এসে ধরা দিল তারই ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গিনী নবাবজাদী আজিমুনের কাছে।

চার

গ্রীষ্মের নিশুতি রাত।

বাইরে মৃদুমন্দ দক্ষিণে হাওয়া। খোলা জানালার পাশে একখানা আসনে বসে ভাগবত পাঠে মগ্ন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর খাজাঞ্চিখানার সর্বময় কর্ত্তা রঘুনন্দন। আচ্ছাদনহীন গৌরবর্ণ দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে সাদা ধব্‌ধবে পৈতাটি। বাইরের হাওয়ায় মাঝে মাঝে প্রায় নিভে যাচ্ছে প্রদীপটি। পরক্ষণেই আবার স্থির হয়ে আসছে তার শিখা। সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই রঘুনন্দের। সে একমনে পাঠ করছে ভাগবত। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে গৃহে ফিরে এসে এইটুকুই তার আনন্দ। রাতের আহার শেষ করে সংসারে একমাত্র আপনজন বিধবা মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করে সে। বৃদ্ধা মাতা অনেক আগেই শুয়ে পড়েন পাশের কক্ষে। আর রঘুনন্দন গভীর রাত পর্যন্ত ভাবগত পাঠে ডুবে থাকে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যেমন স্নেহ করেন তেমনি একটু সমীহও করেন এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জেদী প্রকৃতির ব্রাহ্মণ যুবককে। রাজ্যের ধনদৌলতের চাবিকাটিটি এই যুবকটিরই হাতে। সেদিনের মত ভার্বগত পাঠ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে রঘুনন্দনের। অকস্মাৎ খোলা জানালার সামনে মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে মুখ তুলে তাকায় সে।

একটি মূর্তি—বোরখা পরিহিত এক নারী মূর্তি স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। গম্ভীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কে—কে আপনি? কী চাই আপনার?

বোরখার মধ্য থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আমি নবাবজাদী আজিমুনের সহচরী রাবেয়া। একটু বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হয়েছে আপনার কাছে। দয়া করে দরজাটা একবার খুলুন।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দেয় রঘুনন্দন। ভিতরে প্রবেশ করে রাবেয়া। রাবেয়া তার কালো বোরখাটা খুলে ফেলতেই রঘুনন্দন পালঙ্কটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐখানে বস। বলেই নিজে আসনখানা টেনে নিয়ে মেঝেয় বসে পড়ে। রাবেয়া কিন্তু বসে না। কেমন যেন একটু ইতঃস্তত করতে থাকে।

রঘুনন্দন তার ইতঃস্তত ভাবটুকু লক্ষ্য করে বললে, একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার পালঙ্কে বসতে তোমার আপত্তি আছে?

না—না। আপত্তি কীসের? তবে, আমি মুসলমান, আর আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। আমার ছোঁয়া বিছানায় আপনি ঘুমোবেন কী করে?

মৃদু হেসে জবাব দেয় রঘুনন্দন, আমি তো আমার বিছানায় কোন হিন্দু কিম্বা কোন মুসলমানকে বসতে বলিনি। বসতে বলেছি মানুষকে। মানুষের ছোঁয়ায় আমার বিছানা অপবিত্র হয় না।

আর কোন দ্বিধা না করে পালঙ্কের উপর উঠে বসে রাবেয়া। তারপর বললে, নবাবজাদীর আদেশেই এই গভীর

রাতে আপনার কাছে আসতে হয়েছে আমাকে। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে রঘুনন্দন, সেকি? পর্দানশীন নবাবজাদী আজিমুন্ আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

হ্যাঁ, করবেন। এবং করবেন বলেই আপনাকে তার মহলে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

নবাবজাদীর মহলে? সেকি? খোজা প্রহরীরা আমাকে নবাবের হারামে ঢুকতে দেবে কেন?

না, সোজা পথে আপনাকে নিয়ে যাবো না আমি। প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে সুড়ঙ্গ পথে যেতে হবে আপনাকে! নবাবজাদীর তাই আদেশ।

একটু চিন্তা করে রঘুনন্দন আবার বললে, তা' না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই গভীর রাতে আমাকে এমন কী প্রয়োজন নবাবজাদীর?

নবাবজাদী একটু বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন। জবাব দেয় রাবেয়া।

নবাবজাদী বিপন্ন? বলেই উঠে দাঁড়ায় রঘুনন্দন। কোন্ বিপদ, কিসের বিপদ কিছুই আর প্রশ্ন করে না সে। একটি নারী বিপদে পড়ে তার শরণাপন্ন হয়েছে—রঘুনন্দনের পক্ষে এই খবরটুকুই যথেষ্ট। এর বেশি আর কিছু জানবার নেই রাবেয়ার কাছে।

রাজপুরুষের পোষাক পরার মত সময় নেই তার। প্রয়োজনও নেই। একখানা পাতলা সিল্কের চাদরে নিজের সুগঠিত দেহটি ঢেকে নেয় রঘুনন্দন। তারপর পাদুকাজোড়া পায়ে গলিয়ে রাবেয়ার দিকে ফিরে বললে, চল, আমি প্রস্তুত।

এত সহজেই যে রঘুনন্দন যেতে রাজি হবে তা ধারণাই

করতে পারেনি রাবেয়া। বিশেষ করে, এই হিন্দু যুবকটির গাম্ভীর্য ও জেদ্ সম্বন্ধে সে যা শুনেছে তাতে আদপেই তাকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ ছিল তার।

পথে যেতে যেতে রাবেয়া বললে, নবাবজাদী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন।

কেন? প্রশ্ন করে রঘুনন্দন।

আপনি যে যেতে রাজি হবেন, তা বোধ হয় তিনি ধারণাই করতে পারেন নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দেয় রঘুনন্দন, আগে নবাবজাদীর কোন সাহায্যে আসতে পারি, তারপরই না হয় কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠবে।

বোরখা পরিহিতা রাবেয়া আগে আগে পথ চলতে থাকে। আর তাকে অনুসরণ করে চলে রঘুনন্দন। জনহীন রাজপথ, মধ্যগগনে নবমীর চাঁদের আলোয় রাজপথের দু'ধারে দেবদারু গাছের নাতিদীর্ঘ ছায়া। সেই আলো আঁধারির মধ্যেই পথ চলতে থাকে তারা। দক্ষিণের মৃদু হাওয়ায় রাবেয়ার বোরখাটা অল্প অল্প উড়ছে, উড়ছে রঘুনন্দনের গায়ের সিল্কের চাদরখানাও।

অবশেষে সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথ। আর সেই পথের শেষেই নবাবের হারেম। রাবেয়া রঘুনন্দনকে নিয়ে এসে তোলে সোজা নবাবজাদীর মহলে।

নবাবজাদীর বিশ্রাম কক্ষে রঘুনন্দনকে বসিয়ে রেখে রাবেয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে যায় শয়ন কক্ষে তাকে খবর দিতে।

বসে বসে নবাবজাদীর বিশ্রামকক্ষের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকে রঘুনন্দন। মাথার উপর সহস্র দীপের ঝাড়লণ্ঠনের আলো। দেয়ালে দেয়ালে ফুলের স্তবক। জানালায় ভারি

মখমলের পর্দা, আর মেঝেয় পুরু কাশ্মীরি গালিচা। কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি কৃত্রিম জলাধার। তাতে ফুটে রয়েছে সাদা, গোলাপী পদ্মফুল। একটি কৃত্রিম ঝরণা থেকে জলের ধারা নেমে এসে জলাধারটিকে পূর্ণ করে রাখছে সবসময়। কিন্তু উপ্‌চে পড়ছে না। নাম না জানা ফুলের সৌরভে চারিদিকের বাতাস ভারি।

দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় রঘুনন্দন। এই মর্তভূমিতে এমন একটা স্থান যে থাকতে পারে তা' ছিল তার ধারণারই অতীত। খোদ্ নবাবের বিশ্রাম কক্ষও সে দেখেছে। কিন্তু এর কাছে তার তুলনাই হয় না।

নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে হয় রঘুনন্দনের। নবাবের হারেমে বিশেষ করে তার কন্যার বিশ্রাম কক্ষে বোধ হয় সেই প্রথম বাইরের একজন পুরুষ।

দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল রঘুনন্দন। হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে সে। রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষের যে এমন রূপ থাকতে পারে তা' ছিল তার কল্পনারও অতীত। দেবনর্ত্তকী মেনকা কিম্বা উর্বশীও কি এর চেয়ে বেশী সুন্দরী! স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ যেন স্বর্গ মর্ত্য খুঁজে খুঁজে সেরা সৌন্দর্যটুকু সংগ্রহ করে এই মানবীকে তৈরী করেছেন। একেবারে নিখুঁত সেই সৌন্দর্য।

বিস্ময়াবিষ্ট চোখে রঘুনন্দন কতক্ষণ তাকিয়েছিল নবাবজাদী আজিমুনের দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ আজিমুন্ কথা বলতেই স্বপ্নভঙ্গ হয় তার। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বলে ওঠে, বন্দেগী নবাবজাদী। আমার অন্যমনস্কতা ক্ষমা করবেন।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে আজিমুনের ওষ্ঠপ্রান্তে। রঘুনন্দনের মনে হয়, এমন তুলনাহীন হাসি কেবল ঐ মুখেই মানায়।

রঘুনন্দন বললে, আপনার আদেশ শিরোধার্য করে এখানে এসেছি নবাবজাদী। এবার হুকুম করুন।

আজিমুন্ রঘুনন্দনকে কুমার বলে সম্বোধন করে বললে না—না, কুমার, কোন হুকুম করতে আপনাকে ডেকে পাঠাইনি আমি। বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য লাভের আশাতেই আপনাকে ডেকেছি।

বলুন, কী সাহায্য আপনাকে করতে পারি নবাবজাদী।

একটু সময় চুপ করে থেকে আজিমুন্ জবাব দেয়, আমার দাদা নবাবজাদা দিলজিতের খবর নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

হ্যাঁ জানি। শুধু আমি কেন, গোটা রাজ্যের কাক পক্ষীটি পর্যন্ত এই খবর জানে।

তাহলে এও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে নবাব সম্ভবতঃ তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

হ্যাঁ, তাও শুনেছি এবং শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছি। জবাব দেয় রঘুনন্দন।

কেন, দুঃখিত হয়েছেন কেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে আজিমুন্।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে রঘুনন্দন, নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ যে দোষ করেছেন, তার ক্ষমা নেই। একজন অবলা নারীর ধর্ম নষ্ট করেছেন তিনি। তাঁর কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের উপর আমার কোনকালেই বিশ্বাস নেই, নবাবজাদী। মানুষ যতবড় অন্যায়ই করুক না কেন, আমার ধারণা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তার কোন

প্রতিকার হয় না। অন্যায়কারীকে দণ্ডের মাধ্যমে অনুতাপের সুযোগ দিতে হবে। তবেই না সে দণ্ডের কার্যকারীতা উপলব্ধি করতে পারবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে অনুভব করাতে হবে যে সে অন্যায় করেছে বলেই তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। আর সেটাই হবে তার চরম দণ্ড। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে অন্যায়কারীর এই উপলব্ধির সুযোগ কোথায়? তাই, কোনদিনই আমি মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করি না। রঘুনন্দনের কথায় মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে আজিমুনের। মনে মনে ভাবে, এতদিনে সে ঠিক্ লোকের সন্ধান পেয়েছে। রঘুনন্দন হয়ত ইচ্ছা করলে তার দাদার মৃত্যুদণ্ড রোধ করার কোন উপায় বের করতে পারবে।

রঘুনন্দন থামতেই আজিমুন্ বললে, আমার দাদা নিঃসন্দেহে অন্যায় করেছে। স্বীকার করছি, সে ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু তাই বলে এই বয়সে এই দুনিয়া থেকে তাকে চিরতরে চলে যেতে হবে? এমন একটা অবস্থার কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না, কুমার। বলতে বলতে আজিমুনের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে। পটলচেরা কাজল কালো চোখ দু'টো ছল ছল করে ওঠে তার।

চুপ্ করে থাকে রঘুনন্দন। বলতে থাকে আজিমুন্, আমি সামান্যা নারী, কুমার। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক আমি। দাদাকে আমি ভালবাসি। তার মঙ্গল কামনা করি। আমার একান্ত ইচ্ছা দাদা অন্ততঃ প্রাণে বেঁচে থাকুক। চরমদণ্ড যেন না হয় তার। আমার অন্তর একান্তই ক্ষুদ্র। আপনার মত বিশাল নয়। আপনার মত কোন নীতিগত ব্যাপারও আমার নেই। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে আমার দাদা বলেই তার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠেছি আমি। নইলে মুর্শিদকুলী খাঁর

রাজত্বে কত লোক তো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে। তাদের জন্যে তো কোনদিন মাথা ঘামাই নি আমি।

আজিমুনের সহজ সরল উক্তি মুগ্ধ করে রঘুনন্দকে। নবাবজাদী হলেও মায়া মমতায় জড়ানো সংসারের আর পাঁচ জন নারীর মতই সে। হয়ত প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মনটা আলোকিত তার। তাই সত্যিকারের মনের কথা নির্দ্বিধায় মুখে প্রকাশ করতে কোন লজ্জা কিম্বা সঙ্কোচ তার নেই।

রঘুনন্দন বললে, কিন্তু আমি আপনাকে কীরকমে সাহায্য করতে পারি, নবাবজাদী? নবাবের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর তো আমার কোন হাত নেই।

সেই পরামর্শের জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি, কুমার। আমার মা ও আমি বাবাকে অনেক অনুরোধ করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। শুনেছি বাবা নাকি আপনাকে খুবই স্নেহ করেন। তাই ভাবছি, আপনি যদি কোন পথের সন্ধান দিতে পারেন। মৃদু থেমে রঘুনন্দন জবাব দেয়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু সেই স্নেহ নিশ্চয়ই তাঁর কন্যার চাইতে বেশি নয়। তাঁর কন্যাই যখন তাঁকে অনুরোধ করে কিছু করতে পারলেন না, তখন আমার সাধ্য কি, তাঁর মত পালটাতে পারি?

একটু থেমে রঘুনন্দন আবার বললে, নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান তো প্রচুর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। অপরাধ যদি না নেন তো বলি, তিনি নাকি আপনার ভবিষ্যৎ স্বামী। অনুমতি করেন তো, তাঁকে দিয়ে একবার চেষ্টা করতে পারি।

মহম্মদ জানের কথায় মুখখানা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে আজিমুনের। নিরুত্তাপ কণ্ঠে সে জবাব দেয়, না তাকে দিয়ে

কোন কাজ হবে না। সেও অতি কঠিন প্রকৃতির মানুষ। দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ নেই তার।

বলেই একটু সময় চুপ করে থেকে আজিমুন্ আবার বললে, আর শোনা কথায় কোন গুরুত্ব দেবেন না, কুমার। তিনি মোটেই আমার ভবিষ্যৎ স্বামী নন।

সেকি? বিস্মিত কণ্ঠে বললে রঘুনন্দন, আমি যতদূর জানি নবাবের নিজেরও তো তাই ইচ্ছা।

এবার একটু বিরক্ত কণ্ঠেই জবাব দেয় আজিমুন্, বললাম তো, কুমার, আপনারা যা জানেন তা' ঠিক নয়। আর এ কথাটাও আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তার সাদীর ব্যবস্থা করবেন না। রঘুনন্দন আর ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা না করে চুপ্ করে কিছু চিন্তা করতে থাকে। একসময় কেমন যেন একটু উস্‌খুস্ করে ওঠে আজিমুন্। রঘুনন্দন তার দিকে তাকাতেই আজিমুন্ বললে, এই সময় আপনাকে কী খেতে দিই, বলুন তো কুমার। আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। আপনি তো আমাদের হাতের ছোঁয়া খাবেন না।

হেসে জবাব দেয় রঘুনন্দন, ঠিক বলেছেন নবাবজাদী। যারা স্বাভাবিক প্রকৃতির তারা খায় না। কিন্তু আমার প্রকৃতি একটু অস্বাভাবিক কিনা, তাই আমাকে আদর করে যে যা' দেয় তাই আমি খাই। আমি এমনই অস্বাভাবিক প্রকৃতির যে খাদ্য দাতার ধর্ম কিম্বা প্রকৃতির উপর নজর না দিয়ে খাদ্যবস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতির উপরই আমার নজর থাকে বেশি। সে যাই হোক্, আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না, নবাবজাদী। এই অসময়ে আমি কিছু খাবো না। আমি এতক্ষণ অন্য একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা? প্রশ্ন করে আজিমুন।

ভাবছিলাম সরমা নামে সেই অত্যাচারিতা স্ত্রীলোকটির কথা। তাকে দিয়ে যদি নবাবকে অনুরোধ করানো যায়, তবে হয়ত মত পালটাতে পারেন তিনি।

কিন্তু সরমা কি রাজি হবে? প্রতিশোধ নিতে চাইবে না সে?

চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ ও ক্ষমা করার মধ্যে যে তফাৎটুকু রয়েছে সেটুকু যদি তাকে ঠিক্‌মত বুঝিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়ত কিছু ফল হতেও পারে। তা'ছাড়া নারী-মন তো! কখন কিরকম থাকে বলা কঠিন। দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!

তাই নাকি? এবার একটু কৌতুকের ছায়া পড়ে আজিমুনের কণ্ঠস্বরে, নারী-মন নিয়ে বুঝি অনেক ঘেঁটেছেন?

হ্যাঁ, ঘেঁটেছি বৈকি, তবে কেবল পুঁথিপত্রের মাধ্যমে। বলেই আবার হেসে ওঠে রঘুনন্দন।

এক সময় উঠে দাঁড়ায় রঘুনন্দন। সঙ্গে সঙ্গে আজিমুনও।

গায়ের চাদরখানা ঠিক করতে করতে রঘুনন্দন আর একবার তাকায় আজিমুনের স্বর্গীয় রূপের দিকে। আজিমুনও ভীরু দৃষ্টিতে তাকায় ঐ ব্রাহ্মণ যুবকের পুরুষোচিত মুখখানার দিকে।

স্মিত হেসে রঘুনন্দন বললে, এবার চলি, নবাবজাদী?

আজিমুন দু'পা এগিয়ে এসে কণ্ঠে আগ্রহের সুর ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করে, তা' হলে নবাবজাদীর দেওয়া এই দায়িত্বটুকু গ্রহণ করলেন, কুমার?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় রঘুনন্দন, হ্যাঁ গ্রহণ করলাম। চেষ্টার ত্রুটি করবো না আমি। রঘুনন্দন ফিরে দাঁড়িয়ে দু'পা

এগিয়ে যেতেই আজিমুন পিছু ডাকে আবার, আর একটা কথা কুমার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দেয় রঘুনন্দন, বলুন, নবাবজাদী।

দায়িত্বটুকু যখন গ্রহণ করলেন তখন আর একটি কথা দিতে হবে আপনাকে।

বলুন, নবাবজাদী। অসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই দেব।

আজিমুন বললে, এখানে আসার গোপন সুড়ঙ্গপথের রাস্তাঘাট তো এবার চিনে গেলেন। আমি দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবো। আমার দেওয়া দায়িত্বের কতটুকু কি পালন করতে পারলেন তা' এখানে এসে মাঝে মাঝেই জানিয়ে যেতে হবে আমাকে, বলুন, নবাবজাদীর এই অনুরোধটা রাখবেন।

চোখ দুটো অকস্মাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে রঘুনন্দনের। মৃদু হেসে জবাব দেয় সে, কথা দিলাম, আসবো। তা'ছাড়া, এখানে এলে আর কিছু না হোক্, সেই মহান্ স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে নিজের চোখ দু'টোকে অন্ততঃ সার্থক করে তুলতে পারা যাবে। এমন ঘটনাই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ?

লজ্জায় মুখ নীচু করে আজিমুন্।

রঘুনন্দনের দেহটি বাইরের অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে, আর সেইদিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকে নবাবজাদী আজিমুন্। সাধারণ ধুতি চাদরে মানুষকে যে এত সুন্দর মানায় রঘুনন্দনকে দেখার আগে তেমন কোন ধারণাই ছিল না তার।

পাঁচ

নবাবের খাজাঞ্চিখানার অধিকর্তা রঘুনন্দন রাজকার্যে সারাদিন ব্যস্ত থাকলেও নবাবজাদী আজিমুনের দেওয়া দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয় নি। টাকা আনা কড়া ক্রান্তির হিসাব নিকাশের দায়িত্বের একঘেঁয়েমির মধ্যে এই নতুন দায়িত্বটি যেন একটা স্বাদ বদলের সুযোগ এনে দিলে তাকে।

নবাবের জেনানী-অতিথিশালায় গিয়ে সে দেখা করেছিল সরমার সঙ্গে। একদিন তু'দিন নয়, পর পর কয়েক দিন সে দেখা করেছে। ঘোমটার আড়াল থেকে তার সঙ্গে কথা বলেছিল সরমা।

প্রশ্ন করেছিল তাকে, কেন—কেন আমি নবাবকে অনুরোধ করতে যাবো সেই পশুটার জীবনের জন্যে? মৃত্যুদণ্ডই ওর একমাত্র দণ্ড হওয়া উচিত। ওরকম একটা নরপশু জীবিত থাকলে আমার মত আরও কত হতভাগীকে ওর লোভের আগুনে পুড়ে মরতে হবে তার ঠিক কি?

ধৈর্যসহকারে সরমার বক্তব্য শুনেছিল রঘুনন্দন। বলেছিল, খুবই সত্যি কথা বলেছেন। এমন নরপশু ক্ষমারও অযোগ্য। ওর শাস্তি হোক্ তা' সকলেই চায়। আমিও চাই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওর মৃত্যুদণ্ড হোক্ তা' আমি পছন্দ করিনা। আমার ধারণা মৃত্যুদণ্ড চরম দণ্ড হলেও তাতে

কোন ফল হয় না। অসৎকে সৎপথে ফিরিয়ে আনাটাই দণ্ড দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মৃত্যুদণ্ড সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে পারে না।

কিন্তু নবাবজাদার মত একটা দুশ্চরিত্র লোক কি কোনদিন সৎপথে ফিরে আসতে পারে? জঙ্গলের যে হিংস্র পশু একবার নর-রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি সহজেই তা' ভুলে যেতে পারে? ঘোমটার আড়াল থেকে জবাব দিয়াছিল বুদ্ধিমতী সরমা।

হয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা পারেও। এবং পারে বলেই দস্যু রত্নাকর একদিন বাল্মীকি হয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ নিশ্চয়ই রত্নাকর নয়। তেমন হবার সম্ভাবনাও তার নেই।

তা' হয়ত নেই, কিন্তু তাকে একটা সুযোগ দিতে ক্ষতি কি?

ঘোমটার আড়ালে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে সরমা আবার বলেছিল, বিচার তো এখনও হয় নি। বিচারে নবাব যে নিজের পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। শত হলেও নিজের পুত্র তো!

ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে যারাই ভালমত চেনে তারাই বলবে, ন্যায়ের কাছে আপন পর ভেদাভেদ তিনি করেন না। তা' সে যত বড় নিকট আত্মীয়ই হোক্ না কেন। নবাবের ভাবভঙ্গি কথাবার্ত্তায় সকলেই বুঝে নিয়েছে, দিলজিৎকে মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করবেন তিনি। অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণে যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয়।

ঘোমটার আড়াল থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল সরমা, নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যাতে মিথ্যে সাক্ষী দিই, সেই অনুরোধ করতেই কি আপনি এসেছেন?

না—না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে আমি আসি নি আপনার কাছে। আপনি বোধ হয় জানেন না, মিথ্যাকে আমি সব চাইতে বেশি ঘৃণা করি। মিথ্যা, ছলনা, প্রবঞ্চনাকে এতটুকু প্রশ্রয় দিইনি কোনদিন। বিচারের দিন নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি সত্যি কথাই বলবেন। জেনে রাখবেন এতটুকু মিথ্যে বললেও ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

তা'হলে, আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

তেমন কিছুই করতে হবে না আপনাকে। বিচারে নবাব যদি ওকে কেবল কারাদণ্ডের আদেশ দেন তো আপনার কিছুই করণীয় থাকবে না। কিন্তু যদি ওর মৃত্যুদণ্ড হয়, তো আপনাকে অনুরোধ করতে হবে। নবাবকে বলতে হবে যে আপনি সত্যি সত্যিই ওর মৃত্যুদণ্ড চান না। ওকে যেন ক্ষমা করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুধু এইটুকু—শুধু এইটুকুই কেবল করতে হবে আপনাকে। তাতে হয়ত তার জীবন রক্ষা হলেও হতে পারে।

কিন্তু, নবাব যে আমার অনুরোধ রাখবেন তার স্থিরতা কি?

তা' অবশ্য নেই। তবে আপনিই সেই অত্যাচারিতা নারী। তাই আপনি নিজে যদি অনুরোধ করেন তো নবাব হয়ত আপনার অনুরোধ রক্ষা করতেও পারেন। অবশ্য তার আগে আমরাও একবার নবাবকে নিশ্চয়ই অনুরোধ করবো?

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল সরমা। তারপর

রঘুনন্দনকে বলেছিল, আমাকে ভেবে দেখতে দিন-কয়েক সময় দিন।

বেশ, তাই হবে। আমি আবার আসবো।

রঘুনন্দন ফিরে এসেছিল সেখান থেকে।

কথা রেখেছিল রঘুনন্দন।

মাঝে মাঝেই গভীর রাতে সে যেত নবাবজাদীর মহলে। বলা বাহুল্য, যেত সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথেই।

আজিমুনের সঙ্গে দেখা হত তার সেই বিশ্রাম কক্ষে। দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলতো তারা। কাজের অগ্রগতি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতো রঘুনন্দন। বলতো, চেষ্টা তো করছি, নবাবজাদী। কিন্তু সফল হতে পারবো কিনা জানি না।

জবাব দিত আজিমুন্, সফলতা কিম্বা বিফলতা তো আপনার হাতে নয়, কুমার। আপনি শুধু চেষ্টা করতে পারেন, এই পর্যন্ত। তা' আপনি করছেন। এতেই আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আজিমুনের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে রঘুনন্দন বলেছিল, খুব সুন্দর কথা বলেছেন আপনি। অতি খাঁটি কথা। আমাদের ধর্মগ্রন্থেও ঠিক্ এই কথাই বলে। মানুষ শুধু চেষ্টাই করতে পারে। চেষ্টা করাই তার উচিত। ফলাফল সেই পরমেশ্বরের হাতে।

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল আজিমুন্, হ্যাঁ, জানি, আপনাদের ধর্মগ্রন্থও কিছু কিছু পড়েছি আমি। পড়ে বুঝতে পেরেছি, সব ধর্মের সার কথাই এক। আসলে, দুনিয়ার সমস্ত মহাপুরুষদের চিন্তা ধারার মধ্যেই একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

চমৎকৃত হয় রঘুনন্দন। মনে মনে ভাবে নবাবের হারেমে এমন একজন বিদুষী যুবতীকে মাত্র আর একজনের সাথেই তুলনা করা চলতে পারে। তিনি ছিলেন দিল্লীর বাদশা শাজাহানের কন্যা জাহানারা—সুপণ্ডিত জাহানারা বেগম। শাজাহানের নয়নের মণি।

যতই দিন যেতে থাকে ততই যেন আজিমুনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে রঘুনন্দন। তার মাঝে মাঝেই মনে হয় মানুষের রূপ, গুণ, চরিত্রের এমন অপূর্ব সমন্বয় কচিৎ চোখে পড়ে। ঈশ্বর যেন কোন দিকেই এই নবাব কন্যাকে খাটো করে গড়েন নি। অপূর্ব শ্রীময়ী মুখের উপর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। কণ্ঠস্বরে যেন বীণা বেজে উঠে। নিজের ধর্মের প্রতি অচলা ভক্তি থাকলেও পরধর্মকে কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখে না। অনেকটা পিতা মুর্শিদকুলী খাঁর মত।

খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান রঘুনন্দন যেন এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তার মানসী প্রতিমাকে। এ'রকম একটি নারীর জন্যেই যেন দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছিল। সেই প্রতীক্ষার অবসান হল এতদিনে। তার মনের কল্পলোকের অপ্সরী যেন এতদিনে মনুষ্যমূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

নর ও নারীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌তে সময় এবং সান্নিধ্য যতই প্রয়োজনীয় হোক্ না কেন ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় তাদের হ্রস্বতা সত্ত্বেও সেই সম্পর্ক অতি দ্রুত গড়ে ওঠে। দেখে মনে হয়, দু'টি মনুষ্য-আত্মা যেন পরস্পরের জন্যে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। যেই মুহূর্তে তাদের দেখা হ'ল, ঠিক্ সেই মুহূর্তেই যেন একে অন্যকে চিনে নিতে পারলে। দীর্ঘ সময়, দীর্ঘতর সান্নিধ্য, কিম্বা কোন রকম ছলাকলার প্রয়োজনই হল না তাদের এই পরস্পর পরিচিতির ব্যাপারে।

নারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রঘুনন্দনের মনের বন্ধ দুয়ার যেন খুলে গেল অকস্মাৎ ; প্রেমের দীপ্ত মণিরাগের দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে উঠ্‌লো তার মনের আঙ্গিনা।

নবাবজাদী আজিমুন্‌ও মনের আয়নায় নিজেকে দেখে একটু চম্‌কে ওঠে। নিজের এই নতুন আবিষ্কারে নিজেই চমৎকৃত হয়। মনে হয়, ঐ তেজস্বী সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবক যেন তার জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। কোন দেশের কোন রাজপুত্র নয়, পক্ষীরাজ ঘোড়াও তার নেই। তবুও চিনতে ভুল হয় না আজিমুনের ; তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় এই হিন্দু যুবক রঘুনন্দন। সেই চোখ, সেই মুখ, ঠিক সেই ভঙ্গি—এতটুকু তফাৎ নেই কোথাও।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে কোতোয়াল মহম্মদ জানের কথা। সঙ্গে সঙ্গে যেন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় আজিমুনের, না—না। ঐ মহম্মদ জান নয়—ঐ মহম্মদ জান নয়। এই রঘুনন্দনই সেই পুরুষ। ভুল নেই যে ঐ মহম্মদ জানই একদিন বিহ্বল করে তুলেছিল তাকে, কিন্তু রঘুনন্দনের মত বিবশ করে তুলতে পারে নি। একদিন ঐ মহম্মদ জানই তাকে সম্মোহিত করেছিল। আজ মনে হয়, সেটা ছিল শুধুই সম্মোহন। অনেকটা ঐন্দ্রজালিক সম্মোহনের মত অতি নিম্নস্তরের বস্তু। কিন্তু রঘুনন্দন তাকে সম্মোহিত করে নি। সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে তার মনটাকে। মহম্মদ জানের ছিল জৌলুস, আর রঘুনন্দনের আছে দীপ্তি। মহম্মদ জানের ছিল মাদকতা, আর রঘুনন্দনের আছে গভীরতা।

রঘুনন্দনের ঐ বড় বড় টানা চোখের কোলে একাগ্রতার আশ্বাস যা' নারী মাত্রেরই একান্ত কামনার বস্তু। ওর সুগঠিত দেহ ভঙ্গিমায় দৃঢ়তা আছে কিন্তু কাঠিন্য নেই, ওর

কণ্ঠস্বরে আছে আত্মপ্রত্যয়ের আভাস, কিন্তু নেই কোন আত্মপ্রচারের অভিলাষ।

একদিন গভীর রাতে হারেমে নবাবজাদীর মহলের বিশ্রাম কক্ষে বসে অপেক্ষা করছিল রঘুনন্দন। রাবেয়া অন্দরে গিয়েছে আজিমুন্‌কে খবর দিতে।

অন্দরের শয়ন কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় মনোযোগ দিয়ে একখানা বই পড়ছিল আজিমুন্।

কক্ষে প্রবেশ করেই রাবেয়া মুখ টিপে হেসে বলেছিল, গোস্তাকি মাপ হয়, নবাবজাদী। কিতাবের আড়ালে কষ্ট করে জেগে থাকার আর প্রয়োজন নেই। তিনি এসেছেন। কৃত্রিম ভ্রু-ভঙ্গি করে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল আজিমুন্, কী বললি তুই ?

কী আবার বল্‌লুম ? বল্‌লুম, তিনি এসেছেন। আর কষ্ট করে জেগে থাকতে হবে না আপনাকে। আবার মুখ টিপে হেসে উঠেছিল রাবেয়া।

কে বললে, আমি কষ্ট করে জেগে বসে আছি ? কিতাবটা ভালো লাগছিল, তাই পড়ছিলুম। তা' যা' বলেছেন নবাবজাদী। আজ কাল প্রায় রোজই গভীর রাত পর্যন্ত কিতাব পাঠ করতে নবাবজাদীর ভালো লাগে। আগে কিন্তু বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে পারতেন না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতো আপনার।

লজ্জায় গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছিল আজিমুনের।

একটা হাই তুলে বইটা বন্ধ করে শয্যায় উঠে বসেছিল সে। তারপর রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে একটা কটাক্ষ হেনে

বলেছিল, আমাকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যাথা কেন রে? নিজের চরকায় তেল দে না।

সেকি নবাবজাদী? আপনাকে নিয়ে মাথা ব্যথা করাটাই যে আমার কাজ। একটু থেমে রাবেয়া আবার বলে উঠেছিল, তা' নবাবজাদী বসে বসে আমার সঙ্গে তর্ক করবেন, না একবার বাইরে যাবেন। ওদিকে সেই নওজোয়ান যে হা-পিত্যেস করে বসে রয়েছেন। বলেই এবার খিল খিল শব্দে হেসে উঠেছিল রাবেয়া। তারপর হাসতে হাসতেই বলেছিল আবার, ইমান্‌দার আদ্‌মী। আমাদের খুব্‌সুরৎ নবাবজাদীর জন্যে বোধহয় কিছু নজরানাও নিয়ে এসেছেন।

তুই দূর হ', পোড়ার মুখী। বলেই একটু মিষ্টি হাসি হেসে বিশ্রাম কক্ষের দিকে পা' বাড়িয়েছিল আজিমুন্‌।

আজিমুনকে দেখেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল রঘুনন্দন, বন্দেগী নবাবজাদী।

আবার? আবার আপনার সেই শিষ্টাচার? আজিমুনের কণ্ঠে যেন অভিমানের সুর। মৃদু হেসে নিজের আসনে বসতে বসতে জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন, কী করবো বলো? আমাদের তুমি-আপনির' ঝঞ্ঝাটটা এখনও এক তরফা থেকে গেল বলেই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় আমার।

আজিমুনের ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ঝিলিক্ দিয়ে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। মাথা নীচু করে শান্ত কণ্ঠে বলেছিল, বেশ, এবার থেকে আর সেই ঝঞ্ঝাটটা থাকবে না। আশা করি এর পর থেকে আর তোমার ঐ ভুল হবে না, কী বল?

হবে না বলেই আমিও আশা করি। তবে—

তবে আবার কী?

তবে, নবাবজাদীর নিজের যদি কখনও ভুল হয় তো আমারও হবে। বলেই হেসে উঠেছিল রঘুনন্দন। আজিমুনও মাথা নীচু করে একটু সলজ্জ হাসি হেসেছিল।

গভীর রাতে সহস্র দীপশিখার আলোকে আলোকিত সেই বিশ্রাম কক্ষের মায়াময় পরিবেশে ছ'টি যুবক যুবতী তাদের জীবনের অনেক কথাই আলোচনা করেছিল সেদিন। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে অনেক না বলা কথাও বুঝে নিয়েছিল অনায়াসেই।

অবশেষে এক সময় আজিমুন্ প্রশ্ন করেছিল, নবাবজাদার বিষয় কতদূর কী করতে পারলে ?

একটু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন, আজ সকালেই সেই সরমার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। মনে হচ্ছে তাকে হয়ত রাজি করাতে পারবো।

তাই নাকি ? আনন্দে চোখ ছুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আজিমুনের।

হ্যাঁ, মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার বলেছিল রঘুনন্দন। ছ'চার দিন সময় চেয়েছে সে। নবাবজাদা দিলজিতের কথা মনে হতেই মনটা আবার ভারি হয়ে উঠেছিল আজিমুনের। সেই সঙ্গে কেমন যেন একটু অপরাধবোধ মনের এক কোণে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল তার। ছি—ছি। নিজেদের চিন্তা ভাবনাতেই তারা মশগুল হয়ে উঠেছে। রঘুনন্দনের সাথে তার মন দেয়ানেয়ার ব্যাপারটাই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে আজকাল। আর সেই হতভাগ্য নবাবজাদার ব্যাপারটা এখন গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন।

কিন্তু একদিন এই নবাবজাদার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করেই

পরিচয় হয়েছিল রঘুনন্দনের সঙ্গে। সেই সমস্যার এখনও কোন সমাধান হল না। আর তারা এদিকে দিব্বি—।

বিবেকের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয় আজিমুনের। তার সুন্দর মুখে সামান্য একটু বিরক্তি মিশ্রিত বিষাদের ছায়া নেমে আসে।

বুদ্ধিমতী আজিমুন্ নিজের মনোভাব গোপন করতে চেষ্টা করলেও রঘুনন্দন কিন্তু ধরে ফেলেছিল তার মনের কথাটা।

শান্ত সংযত কণ্ঠে সে তাই বলেছিল, তুমি বুঝি ভেবেছ, আমি নিজের কর্ত্তব্য কাজ ভুলে বসে আছি? না—না। তা' ভেব না। চেষ্টার কোনই ত্রুটি আমি করছি না। সরমা দু'চার দিন সময় চেয়েছে। আমার ধারণা ওকে আমি রাজি করাতে পারবো। আর ও যদি নিজের মুখে নবাবকে অনুরোধ করে, তবে হয়ত নবাব ওর অনুবোধ ঠেলে ফেলতে নাও পারেন।

ছলছল করে উঠেছিল আজিমুনের চোখ জোড়া। বলেছিল যে, না, আমি ঠিক তা'ভাবি নি, কুমার। তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি—।

আজিমুনের কথা শেষ হবার আগেই রঘুনন্দন বলে উঠেছিল, এদিকে, যতদূর খবর পেয়েছি নবাবের আদেশমত কোতোয়াল মহম্মদ জান নবাবজাদার বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে আছে। এই লোকটিকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি আমি। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি এই দরবারে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। তার প্রকৃতি যদিও একটু কঠোর, কিন্তু রাজকার্যে এটুকু কঠোরতা না থাকলে—

চুপ করো। কথার মাঝখানেই রঘুনন্দনকে থামিয়ে

দিয়েছিল আজিমুন্, ঐ লোকটির কথা আর আমার কাছে তুলো না। তোমরা ঐ লোকটিকে যতই সৎ, যতই কর্তব্যপরায়ণ বলে মনে কর না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই তা' মনে করতে পারি না। ওটা কেবল ওর মুখোস ছাড়া কিছুই নয়। ঐ মুখোসের অন্তরালে লোকটি একটা বদ মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেবল। ওর সব আছে, কেবল ইমান নেই।

সেকি? মহম্মদ জান সম্বন্ধে এমন ধারণা কেন হল তোমার? শুধু আমি কেন, খোদ্ নবাব পর্যন্ত জানেন যে ওর মত একজন সৎ, নির্লোভ—।

থাক্ হয়েছে। আর বলতে হবে না। তোমরা শুধু এটুকুই জানো, কোতোয়াল মহম্মদ জান একজন নির্লোভ ব্যক্তি। সোনে, চাঁদি, জওহরতের উপর ওর কোন লোভ নেই। আওরতের উপরও তেমন কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু আমি আরও জানি, সে হচ্ছে গভীর দরিয়ার মাছ। ঐ সামান্যের উপর সত্যিই তার লোভ নেই। এর চাইতেও বড় জিনিসের উপর তার দৃষ্টি।

এক মুহূর্ত চিন্তা করেছিল রঘুনন্দন। আজিমুনের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছিল। তারপর আবার বলেছিল, তোমার কি মনে হয়, নবাবের মস্‌নদের উপর ওর দৃষ্টি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কে বললে এমন কথা?

যে-ই বলুক না কেন, আমার তা-ই বিশ্বাস। তবে ওর উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না, সে-পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছি আমি। বেড়ালের ভাগ্যে কিছুতেই সিকে ছিঁড়বে না।

রঘুনন্দন তবুও বোঝাতে চেষ্টা করেছিল আজিমুনকে।

বলেছিল, তোমার ধারণা বোধ হয় ঠিক্ নয়, আজিমুন্। তুমি হয়ত ওর ঠিকমত বিচার করো নি।

জবাব দিয়েছিল আজিমুন্, সব কথা তুমি জানো না। তাই বলছো। জানলে হয়ত বলতে না।

কী কথা ?

তা' আমি এখন বলবো না তোমাকে। সময় হলে সবই জানতে পারবে।

নিজামত আদালতে বিচার হবে আজ।

বিচারকের আসনে খোদ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। নিজেরই একমাত্র পুত্র নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁর বিচার করবেন তিনি।

রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত এই নিজামত আদালত। সাধারণ বিচারের জন্যে কাজীর আদালত রয়েছে। রয়েছে ফৌজদারী আদালত। কিন্তু এই নিজামত আদালতে সপ্তাহে দু'দিন বিচার করেন স্বয়ং নবাব। কঠিন মোকর্দ্দমার শেষ আদেশ দেন তিনি এখানে বসেই।

বিচারকের আসনে গম্ভীর মুখে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। এক পাশে প্রহরীবেষ্টিত শৃংখলিত নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ। অন্য পাশে আদালতের কর্মচারীবৃন্দ। একদিকে আসন গ্রহণ করেছে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষেরা। আর অন্যদিকে চিকের আড়ালে মোকর্দ্দমার জেনানী সাক্ষীসাবুদেরা বসে আছে স্থির হয়ে। পাশের গবাক্ষপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। সেই মুহূর্তে তিনি কী চিন্তা

করছিলেন তা' তিনিই জানেন। হয়ত দিলজিতের কথাই চিন্তা করছিলেন তিনি। হয়ত নিজের ভাগ্যের কথাই ভাবছিলেন। হয়ত মনে মনে বলছিলেন, অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! নিজেকেই আজ নিজের পুত্রের বিচার করতে হচ্ছে। একমাত্র পুত্র—অপদার্থ লম্পট দিলজিৎ; এই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

নিঃশব্দ আদালত গৃহ।

বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে আদালত গৃহের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর আদালত কর্মচারীদের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলী সংকেতে কিছু নির্দ্দেশ দেন।

উর্দ্দি পরিহিত আদালত-নকীব উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আদালতের কাজ আরম্ভ হবার বয়ান তোতাপাখীর মত বলতে থাকে—সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিজামত আদালতের কাজ আরম্ভ হ'ল। বিচার করবেন খুদাতালার প্রিয় নোকর বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নউসেরী নাসির জঙ্গ বাহাদুর। খোদা হাফেজ।

দীর্ঘ কুর্নিশে নবাবকে অভিবাদন জানিয়ে আদালত-নকীব বসে পড়তেই নবাব গম্ভীর কণ্ঠে সম্বোধন করেন, কোতোয়াল মহম্মদ জান!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নবাবকে কুর্নিশ করে মহম্মদ জান ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললে, আদেশ করুন, জাঁহাপনা।

তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ সব হাজির?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

এক মুহূর্ত থেমে মুর্শিদকুলী খাঁ নিয়ম মাফিক প্রশ্ন করেন, আসামীর বিরুদ্ধে তোমার কী অভিযোগ?

নিয়মমাফিক জবাব দেয় মহম্মদ জান, দীন তুনিয়ার মালিক জাঁহাপনার রাজ্যের একজন হিন্দু প্রজা লোকনাথের বিবাহিতা স্ত্রী সরমা'র ধর্মনাশ করেছে এই আসামী। মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে নবাবের, বললেন, আমার সামনে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হোক্।

তারপর আরম্ভ হয় দীর্ঘ বিচারপর্ব।

একে একে সাক্ষীসাবুদের মুখে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ শুনতে থাকেন তার পুত্রের কীর্ত্তি-কাহিনী ; কেমন করে দিলজিৎ খাঁ ধরে নিয়ে গিয়েছিল সরমাকে। নবাবজাদার লোকজনেরা কেমনভাবে ভীতিপ্রদর্শন করে প্রতিবেশিদের চুপ করে থাকতে বাধ্য করেছিল। নবাবজাদার মহলে সরমার অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে কেমনভাবে উৎকট আনন্দে হেসে উঠেছিল দিলজিৎ খাঁ। অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা সরমাকে মিথ্যে স্তোকবাক্যে কেমন করে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল দিলজিৎ।

অমানুষিক ধৈর্য সহকারে সাক্ষীদের মুখে একমাত্র পুত্রের কু-কীর্ত্তির কথা নীরবে শুনে গেলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। শুনতে শুনতে রাগে তুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাঁর মনটা হয়ত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে তিনি হয়ত পরম করুণাময় খুদাতালার কাছে মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনাই করেছিলেন।

কিন্তু সেই গম্ভীর মুখের ওপর তাঁর মনোবেদনার কোন ছায়াই পড়ল না। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর এটাই বিশেষত্ব। নিজের মনটাকে সংযত রেখে অবিকৃত অচঞ্চল কণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য বলে যেতে পারেন। নির্দ্বিধায় করে যেতে পারেন নিজের কর্ত্তব্য কাজ।

বিচারপর্ব শেষ।

এবার নবাব তাঁর অভিমত প্রকাশ করবেন। গোটা আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই বুঝতে পেরেছে নবাবজাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে। এখন নবাবের আদেশ শোনবার জন্যে তারা ব্যগ্র। কেউ কেউ সাংঘাতিক উৎকণ্ঠিত। নবাব কি তবে তাঁর নিজের পুত্রের প্রাণদণ্ডাদেশ দেবেন? কর্ত্তব্যের খাতিরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কি এত কঠোর হতে পারবেন?

রাজপুরুষদের মধ্যে উপবিষ্ট রঘুনন্দনের মুখেও স্পষ্ট উৎকণ্ঠার ছাপ। তার এতদিনের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে সে।

গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চিন্তা করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। এতক্ষণের মধ্যে তিনি একবারও স্বীয় পুত্রের মুখের দিকে তাকান নি।

এবার ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তিনি তাকান তার দিকে। হতভাগ্য দিলজিতের চোখে করুণ বোবা দৃষ্টি। সে যেন সেই দৃষ্টিতে তার পিতাকে বলতে চায়—ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো, বাবা। এবারের মত আমাকে মার্জনা করো। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার আর একবার সুযোগ দাও আমাকে।

পুত্রের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

কথা বলতে গিয়ে যেন কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে ওঠে তাঁর। পরক্ষণেই দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি, নবাবজাদা দিলজিতের অপরাধ প্রমাণ হয়েছে। রাজ্যের এক অবলা নারীর ধর্মনাশ করার অপরাধে সে অপরাধী। আমি তাকে—তাকে—একটা

ঢোক গেলেন নবাব। অকস্মাৎ চোখ দুটো যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। কিন্তু তা' কেবল ঐ মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই আবার দৃঢ় কণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন,— তাকে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আমার বিচারে এ'টাই তার একমাত্র শাস্তি।

স্তব্ধ আদালত গৃহ। পাথরের মত নিশ্চল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। আর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁ। তার বিচারক পিতার শেষ আদেশ কানে পৌঁছেছে তার। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও কঠোরতার কথা তার অবিদিত ছিল না। তবুও এতদিন মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করে রেখেছিল সে। ভেবেছিল, এতটা কঠোর তিনি বোধ হয় হতে পারবেন না। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে এত দূর হয়ত যেতে পারবেন না তিনি। অপরাধী পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন না।

কিন্তু নবাবের আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেল সেই আশা; আর কোন উপায় নেই। নিজামত আদালতের বিচার—খোদ্ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশ। এ' আদেশের নড়চড় হয় না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকার অবসান হয় এতক্ষণে। উপস্থিত ব্যক্তিরা একটু নড়ে চড়ে বসে। গুঞ্জনধ্বনি জেগে ওঠে তাদের মধ্যে। নবাবের কান বাঁচিয়ে নবাবেরই আদেশের যৌক্তিকতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সুরু হয়।

কিন্তু একটি লোক তখনও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চুপ করে থাকে। অপেক্ষা করে থাকার অবসান হয় নি তার তখনও। বরঞ্চ

উৎকণ্ঠা যেন আরও বেড়ে উঠেছে তার। সেই ব্যক্তিটি রঘুনন্দন।

আদালত গৃহের চিকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠে রঘুনন্দন। নবাব তার শেষ আদেশ শুনিয়ে দিয়েছেন। এখনই হয়ত তিনি আদালত গৃহ ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর সামনে এই প্রসঙ্গ তুলবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

কিন্তু এখনও কেন চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে না সরমা? কেন সে এগিয়ে এসে আর্জি পেশ করছে না নবাবের কাছে?

তবে কি তাকে মিথ্যে বলেছে সরমা? অনুরোধ এড়াতে না পেরে মিথ্যে কথায় তাকে ভুলিয়েছে নাকি? তবে কি নবাবজাদা দিলজিৎ খাঁর মৃত্যুই তার একমাত্র কাম্য?

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এবার আদালত-নকীবের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। উঠে দাঁড়ায় আদলত-নকীব। এবার সে আদালতের সমাপ্তি ঘোষণা করবে।

আদালত-নকীব নবাবকে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই জেনানাদের চিক্‌টা একটু নড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চিকের আড়াল থেকে নবাবের সামনে এসে দাঁড়ায় সরমা।

কি মা? তুমি কি কিছু বলতে চাও? ঘোমটা ঢাকা সরমার দিকে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সরমা নীচু কণ্ঠে বললে, জাঁহাপনার কাছে একটা আর্জি ছিল।

আঙ্গুলের ইঙ্গিতে আদালত নকীবকে অপেক্ষা করতে বলে নবাব বললেন, বেশ, তোমার আর্জি পেশ করতে পারো।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলার কথাগুলো গুছিয়ে নেয় সরমা। তারপর ঘোমটার আড়াল থেকে বললে, আপনার ন্যায়বিচারের তুলনা নেই, জাঁহাপনা। আমার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি দিয়েছেন অপরাধীকে। কিন্তু—

কিন্তু কি? ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

কিন্তু, আপনি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে তার প্রাণদণ্ড মুকুব করেন তো আমি জাঁহাপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সরমার কথায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত; রঘুনন্দন চমৎকৃত, নবাব চিন্তিত। আর শৃংখলিত দিলজিৎ খাঁ কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সরমার দিকে। চোখের পলক পড়ে না তার। সেই মুহূর্তে তার চোখে মুখে যে ভাবটি ফুটে ওঠে তা' বর্ণনার অতীত। চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নবাব আবার প্রশ্ন করেন, অপরাধীর প্রতি তোমার এই অহেতুক অনুকম্পার কারণ কি, মা?

না, জাঁহাপনা, অনুকম্পা নয়। আমার জন্যে একজন ব্যক্তি পৃথিবীর আলোবাতাস থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হবে, তা আমি চাই না। আপনি বরঞ্চ ওকে কারাদণ্ডের আদেশ দিন। তবুও—তবুও—একটি মানুষকে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দেবেন না, জাঁহাপনা। আবেগময় কণ্ঠে কথাগুলো বললে সরমা।

জয়ের আনন্দে চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। সরমার কথার ধরণে সে বুঝতে পারে, এটা কেবল তার নিজের কথার প্রতিধ্বনি নয়, সত্যিকারের আন্তরিকতার সুর মিশে রয়েছে এর মধ্যে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ একবার দিলজিতের মুখের পানে

তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নেন। পরক্ষণেই সরমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, তোমার মহানুভবতায় আমি সত্যিই আনন্দিত, মা। কিন্তু তোমার এই মনোভাব আমি সমর্থন করতে পারি না। দোষীর বিচার করেছি আমি, দণ্ডাদেশও আমিই দিয়েছি। এতে তোমার নিজেকে অপরাধী মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

তারপর একটু থেমে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ন্যায়সঙ্গত বিচারে যে দণ্ড ওর প্রাপ্য, তাই ওকে দিয়েছি। ঐ দণ্ড মুকুব করার কোন কারণ ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। তাই, দুঃখিত মনেই তোমার আর্জি আমি খারিজ করে দিলাম।

কথাটা শেষ করেই নবাব আঙ্গুল-সংকেতে ইশারা করেন আদালত-নকীবকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তোতাপাখীর বুলির মত নকীব নিজামত আদালতের কাজের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মুর্শিদকুলী খাঁ। একবারও ফিরে তাকান না কারুর দিকে।

ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করেন তিনি। রাজপুরুষেরাও একে একে অনুগমন করে তাঁকে। কেবল নিজের আসনে স্থানুর মত বসে থাকে নবাবের খাজাঞ্চিখানার কর্ণধার ব্রাহ্মণ যুবক রঘুনন্দন।

সমস্ত রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

নিজামত আদালত থেকে ফিরে এসে শান্ত মনেই তিনি

সেদিন জোহরের নামাজ শেষ করেছিলেন। আসর ও মগ্‌রিবের নামাজের সময় কিন্তু তিনি টের পেলেন তাঁর মনটা সত্যি সত্যিই শান্ত নেই। ঘুরে ফিরে নিজামত আদালতের বিচারের কথাই যেন বার বার মনে পড়ছে তাঁর।

অশান্ত মন নিয়েই ইশার নামাজ শেষ করেন তিনি। তারপর নিজের বিশ্রামকক্ষে ফিরে আসতে আসতে নিজের মনেই তিনি বলতে থাকেন, খুদাতালা মেহেরবান্! হিন্দোস্তানের একটা ছোট্ট অংশের আমি নবাব। বল ভরসা বলতে একমাত্র আল্লাহতালার করুণা। তাই, ইমান্ ছাড়তে পারবো না কোনদিন। আমার ইন্তেকাল পর্যন্ত যেন খুদাতালা তার এই গোলামকে ধর্মের পথে, ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেন। গোটা রাতটা কেবল শয়নকক্ষে পায়চারি করে কাটিয়েছেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। সন্ধ্যার পর নসেরু বেগমের কাছ থেকে এত্তেলা এসেছিল। দেখা করতে চেয়েছিল আজিমুনও। কিন্তু ছু'জনকেই নিরাশ করেছেন তিনি। না করে উপায় ছিল না তাঁর। কারণ নসেরু বেগমের ঐ এত্তেলার অর্থ তিনি ভালই জানতেন। জানতেন, আজিমুনের দেখা করার কারণও।

শেষ রাতে প্রহরীকে ডেকে সময়টা জেনে নিয়েছিলেন তিনি। তারপর প্রস্তুত হয়ে ছিলেন একটা দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে। ঐ দিন প্রত্যুষেই দিলজিতের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে হাবসী জল্লাদের কুঠারের আঘাতে।

মেঝেয় পাতা ইরাণী কার্পেটের উপর অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে একসময় কক্ষের জানালার সামনে এসে দাঁড়ান নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। পূব আকাশে ফিকে অন্ধকার। ভোরের

আকাশে দপ্ দপ্ করছে শুকতারাটা। সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তিনি। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন শুকতারাটার দিকে। বড় বেশি উজ্জ্বল লাগছে যেন ওটাকে, বড় বেশি চঞ্চল।

অকস্মাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হতেই চম্‌কে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন নিজের কানেই শুনতে পান। সেই ধ্বনি অস্থির, অশান্ত।

কে—কে তুমি—কী চাই তোমার? মুর্শিদকুলী খাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন আর্তনাদের ছোঁয়া।

দীর্ঘ কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি জবাব দেয়, আমি জাঁহাপনার গোলাম। জাঁহাপনার হুকুম মতই খবর নিয়ে এসেছি—।

খবর? কীসের খবর? সেই মুহূর্তে যেন সব কিছু বিস্মরণ হতে থাকে তাঁর।

জবাব দেয় লোকটি, জাঁহাপনার আদেশ তামিল হয়েছে—।

আমার আদেশ? কী আদেশ—কাকে আদেশ দিয়েছি? —অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন নবাব।

একটা ঢোক গিলে লোকটি জবাব দেয়, জাঁহাপনার আদেশ—নবাবজাদার মৃত্যুদণ্ড—

অকস্মাৎ যেন দারুণ চম্‌কে ওঠেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। প্রায় চিৎকার করে ওঠেন তিনি, ও—হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে। দিলজিৎ—দিলজিতের মৃত্যুদণ্ড! আমার এই তখ্‌ত-এর উত্তরাধিকারীর মৃত্যু! হ্যাঁ—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে সব। হায় খুদাতালা, দীন দুনিয়ার মালিক—।

বলতে বলতে মুর্শিদকুলী খাঁর মুখের উপর একটা

কালো ছায়া নেমে আসে। টলমল করে ওঠে চোখ দুটো।

নবাব যেন এই এক রাতেই অনেক বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছেন। প্রায় টলতে টলতে তিনি এসে বসেন তার প্রশস্ত পালঙ্কের একধারে। যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটা বৃক্ষ শ্রান্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে।

এবার তা' হলে আদেশ করুন, জাঁহাপনা। বিচলিত নবাবের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে লোকটি বললে।

সেই মুহূর্তে যেন কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন মুর্শিদকুলী খাঁ। হাতের ইশারায় তিনি লোকটিকে চলে যেতে বলেই আবার চিত্রার্পিতের মত বিবশ ভঙ্গিতে বসে থাকেন। দেহে যেন একবিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। বিড় বিড় করে কেবল আপন মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তিনি, আল্লাহতালা মেহেরবান। ন্যায়নীতির সঙ্গে বেইমানী করিনি আমি। নিজের পুত্র বলে এতটুকু সহানুভূতি দেখাইনি দিলজিতকে।

নবাবজাদী আজিমুনের বিশ্রামকক্ষের সাজসজ্জায় এতটুকু ঘাটতি নেই। মাথার উপর সেই সহস্র দীপের ঝাড় লণ্ঠন। কৃত্রিম জলাধারে সেই পদ্মফুলের সমারোহ। কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে সেই ফুলের স্তবক।

কিন্তু সব থেকেও কেমন যেন ম্লান চারিদিক। প্রাণের

সাড়া নেই কোথাও। একটা বিষাদের কালিমা যেন সেই জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। বাইরের খোলা আকাশে যেন পুঞ্জীভূত বেদনার ছায়া, বাতাসে যেন কোন অশরীরীর দীর্ঘনিঃশ্বাস।

মুখোমুখি বসেছিল নবাবজাদী আজিমুন্ ও রঘুনন্দন। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

আজিমুনের পটলচেরা চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল মুক্তাবিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা জল। আর রঘুনন্দন গম্ভীর।

নবাবজাদা দিলজিতের মৃত্যুর পর দিন তিনেকের মধ্যে আজিমুনের সঙ্গে দেখা করেনি রঘুনন্দন। দেখা করতে পারে নি। একটা নিদারুণ ক্ষোভ যেন অহরহ দগ্ধ করছিল তাকে। প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি তার। বাঁচাতে পারেনি দিলজিতকে। নবাবজাদার দেহের উষ্ণ রক্ত আর হাবসী জল্লাদের শাণিত কুঠারের মধ্যে কোন ব্যবধান রচনা করতে পারে নি।

অবশেষে চতুর্থ দিন গভীর রাতে এসে হাজির হয়েছিল আজিমুনের সেই বিশ্রাম কক্ষে।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে রঘুনন্দন একসময় বললে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো আজিমুন্।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় আজিমুন্, না—না কুমার, চেষ্টার তো ত্রুটি করোনি তুমি। আমাদেরই নসীব খারাপ বলতে হবে। নইলে বাবা এমন—।

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় আজিমুন্। নীচের ঠোঁটের একটা কোন কামড়ে ধরে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করলেও বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত চোখের কোল বেয়ে নামতে থাকে জলের ধারা।

আজিমুনকে একটু সামলে নিতে সময় দেয় রঘুনন্দন। তারপর আবার বললে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বরাবরই কঠোর প্রকৃতির। তিনি যে এতটা কঠোর তা' আমি সত্যিই ধারণা করতে পারিনি। তবে—

আজিমুন্ মুখে কিছু না বলে কেবল তাকায় রঘুনন্দনের দিকে।

বলতে থাকে রঘুনন্দন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে ন্যায়পরায়ণ। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি তিনি, অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন নি। ক্ষমাহীন দুর্বাশার মতই তিনি কঠোর কঠিন। যদিও মৃত্যুদণ্ডকে আমি কোনদিনই সমর্থন করি না, তবু বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই যে তাঁর দিক থেকে তিনি সত্যি সত্যিই ন্যায়ের মর্যাদা রেখেছেন। নিজের একমাত্র পুত্রকেও রেহাই দেন নি তিনি।

বিষণ্ন প্রতিমার মত স্থির হয়ে বসে রঘুনন্দনের কথা শুনতে থাকে আজিমুন্। একটু পরে আবার ধরা গলায় সে বললে, জানো, কুমার, সব দেখছি, সব শুন্‌ছি তবুও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, যে আমার সেই হতভাগ্য দাদা আর নেই। এ জীবনে আর কোনদিন দেখতে পাবো না তাকে। প্রাণ দিয়ে সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—

বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আজিমুন্।

রঘুনন্দন আলতোভাবে নিজের একখানি হাত আজিমুনের পিঠের উপরে রেখে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেই কান্নার বেগ আরও বেড়ে ওঠে তার। কান্নার দমকে তার সারা শরীরটা কেঁপে উঠ্‌তে থাকে।

রঘুনন্দন সরে গিয়ে আরও একটু ঘন হয়ে বসে আজিমুনের কাছে। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

আবেগময় কণ্ঠে বললে, শান্ত হও, আজিমুন্। তুমি তো সাধারণ স্ত্রীলোক নও, তুমি যে নবাবজাদী। তোমার কি এত অধীর হওয়া মানায় ?

অকস্মাৎ আজিমুন্ দু'হাতে রঘুনন্দনকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর মাথা রেখে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে, নবাবজাদী হলেও আমি যে নারী ; কুমার, খুদাতালা যে আমাদের এমনি মন নিয়েই গড়েছেন।

সেই গভীর রাতে হারেমে নবাবজাদী মহলের বিশ্রামকক্ষে একে অন্যের একান্ত সান্নিধ্যে বসে থাকে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র কন্যা আজিমুন্নেসা আর নবাবের প্রিয়পাত্রদের অন্যতম ব্রাহ্মণ যুবক রঘুনন্দন।

ছয়

নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান।

স্বভাব চরিত্রে খোদ্ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর যেন একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তেমনি দৃঢ়চেতা, তেমনি কঠোর প্রকৃতির।

নবাবজাদী আজিমুনের প্রধানা সহচরী রাবেয়াকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল মহম্মদ জান। যদিও সেদিন সে ভাল মতই জান্‌তো, আজিমুন্ অসন্তুষ্ট হবে তার উপর, তবুও নিজের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সেই প্রথম অনুরোধ রক্ষা করতে পারে নি সে। অনুরোধটা যে ছিল অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়। নবাবের সঙ্গে যে বেইমানী করতে হত তা'হলে।

তাই নবাবজাদা দিলজিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে একদিকে যেমন কোন অতিরিক্ত উৎসাহ ছিল না তার, তেমনি ছিল না কোন অহেতুক ঔদাসীন্য। নবাবজাদা ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী তার বিরুদ্ধে সত্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হুকুম দিয়েছিলেন খোদ্ নবাব। সেই হুকুম সে অমান্য করতে পারতো কেমন করে? নবাবজাদীর অনুরোধ রাখতে হলে যে তাকে নীতিভ্রষ্ট হতে হত। হোক্ সে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রী। হোক্ সে এমন এক অসামান্যা নারী যাকে প্রথম দর্শনেই

ভালবেসে ফেলেছিল সে। তবুও ভালবাসার খাতিরে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিতে পারবে না সে কোনদিন। তাতে যত ক্ষতিই তাকে স্বীকার করতে হোক্ না কেন, সে পিছিয়ে যাবে না। অন্যায়ের সাথে সন্ধি করার শিক্ষা কোনদিন পায় নি মহম্মদ জান।

মাঝে মাঝে একান্ত মনে চিন্তা করে মহম্মদ জান, সে যেমন আজিমুনকে মনে প্রাণে ভালবেসেছে, আজিমুনও কি তেমনি ভালবেসেছে তাকে? কিন্তু তাকে ভালবাসার সুযোগ কোথায় পেল আজিমুন্? অবশ্য সে নিজেও তেমন কোন সুযোগ পায় নি, তবুও মাত্র প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসেছে সে। আজিমুনও কি তেমনি ভালবেসেছে তাকে?

বোধ হয় তাই। নইলে তাকে সাদী করতে সে রাজি হয়েছিল কেন? আর, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও কি নিজের বিদুষী কন্যার সম্মতি না নিয়েই তার সাদীর ব্যবস্থা করেছিলেন?

অবশ্য, তা নাও হতে পারে। পিতার সম্মতিতেই কন্যা সম্মতি দিয়েছিল হয়ত। পিতার পছন্দই খুশী মনে গ্রহণ করেছিল কন্যা।

কিন্তু এই ঘটনার পর আজিমুন্ যদি তার মত পাল্টায়? কথাটা কেবলমাত্র মনে হতেই বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করে মহম্মদ জান। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে সে ধারণাই করতে পারে নি যে একদিন সত্যি সত্যি তার সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হবে। আজিমুন্ সত্যি সত্যিই মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দিক থেকে।

একদিন নিভৃতে তাকে সেই খবরটা দিয়েছিল হারেমেরই

এক বাঁদী। বাঁদীটি তার খুবই অনুগত। তার সুপারিশেই স্ত্রীলোকটি নকরী পেয়েছিল নবাবের হারেমে।

বাঁদীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল মহম্মদ জান, কী বললি? নবাবজাদী আজকাল আমার নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না? আমার সম্বন্ধে তার মনে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? বদ্‌নামী হয়েছে আমার?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল বাঁদী।

কেন? কী করেছি আমি? প্রশ্ন করেছিল মহম্মদ জান।

বাঁদী জবাব দিয়েছিল, তা' তো ঠিক জানি না, জনাব আলি। তবে আজকাল আপনাকে নবাবজাদীর খুবই বেপছন্দ্। তিনি বলেন, আপনার মনে নাকি সাংঘাতিক গুনাহ্। আপনার মনটা নাকি পাপে ভর্তি।

গুনাহ্—পাপ! কথাটা পুনরাবৃত্তি করেছিল মহম্মদ জান।

হ্যাঁ, জনাব আলি। গোস্তাকি মাপ্ হয় তো একটা কথা বলি। বাঁদীর কণ্ঠে দ্বিধার সুর।

বেশ, বল। যা' জানো নির্ভয়ে বল।

বাঁদী আবার বলেছিল, নবাবজাদীর কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছে যে আপনি ইচ্ছে করলে নবাবজাদাকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু নিজেরই স্বার্থে নাকি আপনি তা' করেন নি।

কী স্বার্থ আমার? ভ্রু-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেছিল মহম্মদ জান।

আপনি নাকি চেয়েছেন নবাবজাদার অবর্তমানে নবাবজাদীকে সাদী করে আপনিই নবাব সাহেবের পর তাঁর এই মসনদে বসবেন। তাই আপনি ইচ্ছে করেই

তাকে বাঁচান নি। সেই মুহূর্তে সামনে একটা গোখ্‌রা সাপ পড়লেও বোধহয় এতটা চমকে উঠ্‌তো না মহম্মদ জান, যতটা সে চমকে উঠেছিল বাঁদীর মুখের কথা শুনে।

ইস্‌, আজিমুনের তবে এমনি একটা ধারণা হয়েছে তার উপর? মানুষ মানুষকে এত ছোট ভাবতে পারে? যে কথা স্বপ্নেও তার মনে কোনদিন স্থান পায় নি তেমনি একটা কথা দিব্বি বিশ্বাস করে বসে আছে নবাবজাদী?

তীব্র অভিমান জ্বালায় মনটা পুড়ে খাক্‌ হয়ে যেতে থাকে মহম্মদ জানের। নিজের প্রণয় মোহের উপর জন্মে একটা প্রচণ্ড ধিক্কার। একটা সূক্ষ্ম অথচ অব্যক্ত বেদনাবোধ তার মনটাকে তোলপাড় করতে থাকে। সেই মুহূর্তে মনে মনে যেন একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে মহম্মদ জান—না, এই স্বার্থকলুষিত সংসারে ভালবাসার খেলা এই মুহূর্তেই শেষ হোক্‌। যেখানে বিশ্বাসের একান্ত অভাব সেখানে প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি শব্দগুলো একেবারেই নিরর্থক। সে আর ভাববে না নবাবজাদীর কথা। তার কোন চিন্তাই কোনদিন মনে স্থান দেবে না। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে বাড়িতে নিজের শয্যায় শুয়ে একান্তভাবে নবাবজাদীর কথা চিন্তা করার উপর চিরতরে যবনিকা টেনে দিতে হবে। তার জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাক্‌ আজিমুনের স্মৃতি। ভুলে যাবে সে নবাবজাদীকে।

অবলম্বনহীন মহম্মদ জান নিজের কর্ত্তব্যকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। ডুবে যেতে চায় কাজের মধ্যে। নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যেই হারিয়ে ফেলতে চায় নিজেকে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেই ভুলে যেতে চায় আজিমুনের স্মৃতি।

কিন্তু ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ ? ভুলে যাবো বললেই কি ভুলে যাওয়া যায় ?

মহম্মদ জান আজিমুনকে যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করে ততই যেন তার স্মৃতি চেপে বসে তার মনের মধ্যে। যে প্রেমের বীজটিকে একান্ত সংগোপনে লালন পালন করে এতদিনে একটা বিরাট মহীরুহে পরিণত করেছিল তার কঠিন শিকড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সমস্ত মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল ইতিমধ্যে। সেই শিকড় কি এত সহজেই উৎপাটিত করা চলে ?

ভাববো না, চিন্তা করবো না, প্রভৃতি কথাগুলো বার বার মনের মধ্যে উচ্চারণ করেও মনের আয়নায় প্রতিনিয়ত যে মুখখানি ভেসে ওঠে তা' ঐ নবাবজাদীরই মুখ। স্বপ্নের মধ্যে যার সান্নিধ্য মনটাকে বিহ্বল করে তোলে, সে ঐ আজিমুন্ ছাড়া আর কেহই নয়।

কঠোর প্রকৃতির মহম্মদ জান জীবনে কেবলমাত্র ঐ একটি নারীকেই ভালবেসেছিল। ভেবেছিল নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাকেই সাদী করে প্রেমের পূর্ণতা আনবে। ভেবেছিল, সেই প্রেম তাদের বিবাহিত জীবনকে সুষমামণ্ডিত করে তুলবে।

কিন্তু তা' হল না। তাই কঠিন হাতের নিষ্পেষণে সেই প্রেমের কণ্ঠরোধ করতে নিস্ফল চেষ্টা করতে থাকে মহম্মদ জান। ভুলতে চায় আজিমুনকে।

এমনি দিনে হারেমের সেই বাঁদী এমন আর একটি খবর নিয়ে এসেছিল যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না মহম্মদ জান। এমনকি কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেনি সে। তাই ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেছিল, তুই নিজে দেখেছিল্ ?

আজ্ঞে না জনাব আলি। আমার নিজের দেখার সুযোগ কোথায়? তবে যার কাছ থেকে শুনেছি, তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি।

কিন্তু রঘুনন্দন তো শুনেছি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার পক্ষে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই একটু সময় চিন্তা করেছিল মহম্মদ জান। তারপর হঠাৎ প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলিত করে বলে উঠেছিল, না—না। তা' হতেই পারে না। তার মত একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না। সকলের চোখে ধূলো দিয়ে গোপন সুড়ঙ্গ পথে নবাবের হারেমে ঢুকে নবাবজাদীর সঙ্গে—। না—না। তুই ভুল শুনেছিস্। একদম বেওকুফ্ তুই। তাই হয়ত কেউ তোর সঙ্গে মস্করা করেছে।

মহম্মদ জানের কথা শেষ হতেই বাঁদীটি মৃদু হেসে উঠেছিল।

হাসছিস্ যে? বিহ্বল দৃষ্টিতে বাঁদীর মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল মহম্মদ জান।

জবাবে বাঁদীটি বলেছিল, হাসছি আপনার কথা শুনে, জনাব আলি। রঘুনন্দন যে সচ্চরিত্র তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সচ্চরিত্র বলেই মহব্বত করতে কোন বাধা আছে নাকি? আর এমন সচ্চরিত্র সুপুরুষ নওজোয়ান বলেই তো আমাদের খুবসুরত নবাবজাদী তাকে ভালবেসেছেন।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি মহম্মদ জানের। বলেছিল, তাই বলে রঘুনন্দন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়ে এমনি কাজ—।

এবার সত্যিই আপনি হাসালেন, জনাব আলি। মহব্বতিতে কি হিন্দু মুসলমান আছে নাকি? সত্যি সত্যি

যদি কখনও চোখে চোখ পড়ে তো হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ কিছুই থাকে না। তখন আমীরও যা, ফকীরও তাই।

মহম্মদ জান আর কিছু না বলে চুপ করেছিল খানিকক্ষণ। আর সেই সুযোগে খোসামোদের সুরে বলেছিল সেই বাঁদী, আপনার জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়, জনাব আলি। খোদ্ নবাব সাহেব যখন আপনাকে জামাতা করবেন বলে ঠিক্ করেছেন, তখন নবাবজাদী যে এমনি একটা কাজ করে বসবেন, তা' চিন্তাই করা যায় না।

মহম্মদ জানকে চুপ করে থাকতে দেখে বাঁদীর সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাই সে উপদেশের ভঙ্গিতে আবার বলেছিল, আপনি বরঞ্চ নবাব সাহেবকে সব কথা জানিয়ে দিন, জনাব আলি। ঐ হিন্দু রঘুনন্দন তাঁর হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

কথার জবাব না দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসেছিল মহম্মদ জান। তার মনে তখন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন। মাথায় জট্‌পাকানো চিন্তার জাল।

সাহস আরও বেড়ে গিয়েছিল সেই বাঁদীর। তেমনি ভঙ্গিতে আবার বলেছিল, আপনি বরঞ্চ ঐ রঘুনন্দনের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে ওকে হারেমের গোপন সুড়ঙ্গ পথে ধরে ফেলুন, জনাব আলি। তারপর, নিয়ে যান নবাব সাহেবের কাছে—

অকস্মাৎ ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়েছিল মহম্মদ জান। রক্তবর্ণ চোখে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, চুপ কর্ বেওকুফ্! কোতোয়াল মহম্মদ জান তোর কথামত কাজ করবে নাকি? আমার নিমক্ খেয়েছিস্, তাই নিমক্ হারামী না করে আমাকে খবর দিতে এসেছিস্। তাই বলে তোর

বুদ্ধিমত আমাকে চলতে হবে নাকি রে, জেনানী উজবুক্?

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেই বাঁদী। একটা ঢোক গিলে বিনীত কণ্ঠে সে বলেছিল, গোস্তাকি মাপ্ হয়, জনাব আলি। বেচাল্ বলে ফেলেছি আপনার সামনে। আর কখনও এমনি হবে না। বরাবর ইয়াদ্ থাকবে, জনাব আলি।

হ্যাঁ, তাই যেন থাকে। বলেই একটা মোহর বাঁদীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মহম্মদ জান আবার বলেছিল, এই নে তোর ইনাম্। এবার তুই যেতে পারিস্।

সারাটা রাত বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করেছিল মহম্মদ জান। সেই হীন চিন্তার জাল বুনে চলেছিল কেবল।

আজিমুন্—নবাবজাদী আজিমুন্ বেইমানী করেছে তার সঙ্গে। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যখন জেনে গেছে যে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর কন্যাকে সঁপে দেবেন তারই হাতে, তখন-ই আজিমুন্ বেইমানী করে ঐ হিন্দু রঘুনন্দনের সাথে এক অসামাজিক মহব্বতিতে মেতে উঠেছে। খবরটা যেদিন জানাজানি হয়ে যাবে সেদিন রঘুনন্দনের বরাতে যাই ঘটুক না কেন, তার নিজের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। লজ্জায় সে আর মুখ দেখাতে পারবে না কারুর কাছে।

কিন্তু কেন? আজিমুন্ কেমন করে বেইমানী করল তার সঙ্গে? এ'কে কি বেইমানী বলা চলে? নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছে থাকলেও নবাবজাদী আজিমুন্ যে সত্যই তাকে পছন্দ করেছিল তেমন কোন প্রমাণ তো সে পায়নি। তাই, আজ যদি সে সত্যই ঐ রঘুনন্দনকে ভালোবেসে থাকে, তো তার অপরাধ কোথায়?

অবশ্য, হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করবার দোষে রঘুনন্দন

দোষী। কিন্তু দোষ কি ষোল আনা তার একার? খোদ্ নবাবজাদীও তো রয়েছে এর মধ্যে। তবে?

তবুও রঘুনন্দনের কথা মনে হতেই মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল মহম্মদ জানের। লোকটা ভণ্ড ব্রাহ্মণ। নইলে এক মুসলমানের সঙ্গে মহব্বতে মেতে ওঠে?

সেই মুহূর্তে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার ঐ লোকটাকে কঠিন শাস্তি দিতে হাতটা নিস্‌পিস্ করে উঠেছিল তার। মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই বাঁদীর অযাচিত উপদেশ। জেনানাটাকে ধমকে তাড়িয়ে দিলেও তার কথাই যেন ঠিক্ বলে মনে হয়েছিল তার। যুক্তিহীন এক প্রচণ্ড ঈর্ষার জ্বালায় সারা দেহ মন সেই মুহূর্তে জ্বলে যাচ্ছিল মহম্মদ জানের।

হ্যাঁ ঠিক্ কথাই বলেছিল সেই বাঁদী। গুপ্তচর লাগিয়ে ঐ রঘুনন্দনকে সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথেই আটক করতে হবে। তারপর, তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে চেহেল সেতুনে নবাবের দরবারে। হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করার জন্যে কঠিন শাস্তি পেতে হবে রঘুনন্দনকে।

কিন্তু—

ঈর্ষার দগ্ধ ক্ষতের উপর একটা কল্যাণকামী শক্তির প্রলেপের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে অনুভব করে মহম্মদ জান। কী প্রয়োজন তার? কেন সে রঘুনন্দনকে ধরিয়ে দেবে? তার হয়ত তাতে শাস্তি হবে। নবাবের মনটা হয়ত রঘুনন্দনের উপর বিষিয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে তার নিজের লাভ কী? এ করে কি নবাবজাদীর মনটাকে তার নিজের প্রতি ফিরিয়ে আনতে পারবে সে? বরঞ্চ তার হীনতাই প্রকাশ হয়ে পড়বে নবাবজাদীর কাছে। আর লাভ ক্ষতির কথা ছেড়ে

দিলেও যে কী করে এমন একটা ছোট কাজ করবে? পাওনা থেকে নিজে বঞ্চিত হয়েছে বলে অন্যকে বঞ্চনা করবার কী অধিকার আছে তার?

নবাবজাদী আজিমুন্‌কে সে একদিন ভালবেসেছিল। তার সেই ভালবাসা আজও অটুট। শুধু অটুট নয়, আরও গভীর। নবাবজাদীর উপেক্ষা সত্বেও তা' আজও তেমনি গাঢ়। এতটুকু মালিন্য স্পর্শ করে নি সেই ভালবাসায়।

সে কি নবাবজাদীর সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ নিতে চায় এমনি ভাবে? রঘুনন্দনের উপর বদ্‌লা নিয়ে কি সে আজিমুন্‌কে শিক্ষা দিতে চায়? ছি—ছি। এটা যে মানুষের অতি নিকৃষ্ট মনের পরিচয়। সে এত নীচে নামবে কেমন করে? ভালবাসার খেলায় অনেক বিঘ্ন আছে, অনেক দ্বন্দ্ব আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করে মনের আক্রোশ হয়ত মিটিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তাতে কি ভালবাসার মর্যাদা রক্ষিত হয়?

না—না। সে পারবে না এমন কাজ করতে। আজিমুন্ যখন নিজের ইচ্ছায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন সেটাকেই বিধিলিপি বলে তার অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। মানুষের কিসমৎ আল্লাহতালার নিজের হাতে তৈরি। তার উপর জোর খাটান চলে না। রঘুনন্দন আর যা-ই করুক না কেন, তার সাধ্য কি, সে মহম্মদ জানের মন থেকে আজিমুনের স্মৃতি মুছে ফেলে? সে শক্তি রঘুনন্দনের নেই। রঘুনন্দন কেন তুনিয়ার কারুর-ই নেই।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদে 'বেরা' উৎসব।

রাজধানীর আমীর ওমরাহ থেকে আরম্ভ করে গরীব গৃহস্থ পর্যন্ত মেতে ওঠে এই উৎসবে। উৎসবের বিশেষ দিনটিতে হাজার হাজার নাগরিক এসে ভিড় করে ভাগীরথীর তীরে। হিন্দুরাও অংশ গ্রহণ করে এই উৎসবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে।

পীর খাজা খিজিরের প্রতি সম্মান দেখানো উপলক্ষে প্রতি বছর এই 'বেরা' উৎসব। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় শত শত কলাগাছের ভেলা ভাসানো হয় ভাগীরথীর জলে। সেই ভেলার উপর থাকে রং বেরংয়ের কাগজে তৈরি কারুকার্য-খচিত ছোট বড় অট্টালিকা। ভাগীরথীর স্রোতের মুখে সেই গৃহপরিশোভিত ভেলা তর তর করে ভেসে যেতে যেতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

উৎসবের আগের দিন রাতে মৃদু হেসে আজিমুন্ বলেছিল রঘুনন্দনকে, কাল আমাদের 'বেরা' উৎসব।

হ্যাঁ, জানি। জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন।

প্রতি বছরের মত এবারও আমি ভেলা ভাসাবো। বলেছিল আজিমুন্।

তাই নাকি? তুমিও কি তবে নদীর পাড়ে যাবে?

না, ওখানে যেতে পারি না আমরা। এই হারেম থেকে একটা তৈরী খাল সোজা নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই পথেই আমরা ভেলা ভাসাই।

ও, তাই নাকি?

কেন, তুমি কখনও দেখ নি?

দেখেছি, তবে ঠিক্ খেয়াল করি নি।

হারেম থেকে যে ক'টা ভেলা ভেসে যায় তার মধ্যে সবচাইতে বড়টাই আমার।

তাই, নাকি ? এবার তা'হলে খেয়াল করে দেখবো।

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে আজিমুন্। চাঁপাকলির মত আঙ্গুল দিয়ে একটা গোলাপের কুঁড়ি নাড়াচাড়া করতে করতে আবার প্রশ্ন করেছিল, তুমি নিজে কখনও ভেলা ভাসাও নি ?

না। জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন।

কেন, রাজ্যের অনেক হিন্দুই তো ভাসায়।

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল রঘুনন্দন, হ্যাঁ, তা' জানি, এটা ঠিক্ তোমাদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, একটা আনন্দ উৎসব মাত্র। তাই অনেক হিন্দুও এতে অংশ গ্রহণ করে। আমিও প্রতি বছর দেখতে যাই। তবে কোন দিন নিজে ভাসাই নি।

আজিমুনের কণ্ঠস্বরে একটা আবদারের সুর ফুটে ওঠে। বললে, এবার তুমিও একটা ভেলা ভাসাও না।

তুমি যদি বল তো ভাসাতে পারি। তবে, তাতে তোমার লাভ কী ? তুমি তো আর বাইরে এসে দেখতে পাবে না।

বাইরে এসে না দেখলেও মহলের একেবারে উপর-তলার জানালা দিয়ে আমরা প্রতিবছর তা' দেখি।

কিন্তু, শত শত ভেলার মধ্যে অতদূর থেকে আমারটা তুমি চিনবে কী করে ? প্রশ্ন করেছিল রঘুনন্দন।

হ্যাঁ। তা' বটে। বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করেছিল আজিমুন্।

তারপর হঠাৎ বালিকা সুলভ চাপল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল, এসো, এক কাজ করি।

কি ? জিজ্ঞেস করেছিল রঘুনন্দন।

চোখে মুখে খুশীর আমেজ ফুটিয়ে তুলে আজিমুন্

বলেছিল, সবাই রংবেরংয়ের কাগজে ভেলা তৈরি করে। আমি এবার শুধুই সবুজ রংয়ের কাগজে তৈরি করবো। আর তুমি—তুমি, লাল রংয়ের—।

আজিমুনের কথা শেষ হবার আগেই রঘুনন্দন বলে উঠেছিল, না আজিমুন্ লাল রং নয়। ঐ রংটা আমি তেমন পছন্দ করি না। আমি গেরুয়া রংয়ের কাগজে তৈরি করবো।

তুমি বুঝি গেরুয়া রংটা খুব পছন্দ করো ?

হ্যাঁ। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল রঘুনন্দন।

হেসে উঠেছিল আজিমুন্।

ও, কি হাসছো কেন ?

জবাবে আজিমুন্ বলেছিল, তোমার পছন্দ দেখে হাসছি। গেরুয়া রংটাকে তো তোমরা বৈরাগ্যের প্রতীক বলে মনে করো।

হেসে বলেছিল রঘুনন্দন, ওটা আবার শৌর্য বীর্যেরও প্রতীক।

একটু থেমে হাতের গোলাপের কুঁড়িটি রঘুনন্দনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আজিমুন্ আবার বলেছিল, বেশ তাই হোক। তোমারটা গেরুয়া রংয়ের, আর আমারটা শুধুই সবুজ, কেমন ?

বেশ, তাই হবে।

আজিমুন্ সতর্ক করে দিয়েছিল রঘুনন্দনকে, অন্ধকার হবার আগেই কিন্তু তোমার ভেলা ভাসাবে, নইলে আমি দেখতে পাবো না।

একটু স্নিগ্ধ হাসি হেসে সায় দিয়েছিল রঘুনন্দন।

সূর্য অস্ত যায় নি তখনও।

ভাগীরথীর তীরে প্রচুর জনসমাগম। কাতারে কাতারে লোক নদীর দুইপাড়ে দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে মত্ত।

একটি দু'টি করে ভেলা ভাসতে আরম্ভ করেছে নদীর জলে। উৎসাহী জনতা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে ভেলার মালিকদের।

নিজামত কেল্লার পাশ দিয়ে যে খালটি সোজা চলে গেছে হারেমের মধ্যে সেই খাল বেয়ে দু'টি একটি করে ভেলা ভেসে আসছে নদীর দিকে—হারেমের জেনানাদের তৈরি ভেলা। বিচিত্র তাদের বর্ণ, চমৎকার তাদের কারুকার্য।

নিজের তৈরি সম্পূর্ণ গেরুয়া কাগজের ভেলাটি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়েছিল রঘুনন্দন। আজ আর জনসাধারণ রাজপুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ্ নেই। ফকীর আমীর সবাই আজ এক।

রঘুনন্দন তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল খালের দিকে। ঐ খাল বেয়েই তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল আজিমুনের সেই সবুজ কাগজের ভেলাটি।

সত্যিই সুন্দর। যেমনি আকৃতিতে বড় তেমনি তার কারুকার্য। কলাগাছের ভেলার উপর তৈরি বাড়িটি একেবারে নিখুঁত একটি অট্টালিকার প্রতিচ্ছবি।

রঘুনন্দনের ভেলাটি তখন হেলতে দুলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল মাছ দরিয়ায়। আশেপাশে ছোট বড় অনেক ভেলা।

খাল বেয়ে ভাগীরথীর জলে পড়েই কিন্তু তর তর করে এগিয়ে যেতে থাকে আজিমুনের ভেলাটি। গতি তার রঘুনন্দনের ভেলাটির দিকে।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনন্দন। সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত।

ভারি আশ্চর্য লাগে রঘুনন্দনের। নদীর জলে এত ভেলা ভেসে চলছে কিন্তু ঐ সবুজ ভেলাটা বিশেষ করে তার নিজের ভেলাটিকে অনুসরণ করছে কেন? হয়ত এর কোন বিশেষ কারণ নেই। হয়ত স্রোতের গতিই এর জন্যে দায়ী। তবুও, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে রঘুনন্দনের চোখে। ঘটনাটা যেন কোন একটা বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে।

আজিমুনের ভেলাটি ততক্ষণে অন্যটির নাগাল পেয়েছে। পাশাপাশি প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে ভেসে চলছে সবুজ ও গেরুয়া রংয়ের ভেলা দু'টি। স্রোতের মুখে তর তর করে ভেসে যেতে যেতে ক্রমশই ছোট দেখাচ্ছে তাদের।

সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই রঘুনন্দনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে দু'টি শব্দ—আশ্চর্য—অদ্ভুত!

অকস্মাৎ কে যেন পাশ থেকে তার মনের কথাটিই বলে ওঠে, কিছুই আশ্চর্য কিম্বা অদ্ভুত নয়, খাজাঞ্চিজী। এটা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনেরই ইঙ্গিত।

কে—কে! চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই রঘুনন্দনের চোখে পড়ে তার একেবারে পাশটিতে দাঁড়িয়ে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান। দৃষ্টি তার দূরে অপস্রিয়মান সেই ভেলা দু'টির দিকে।

এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে রঘুনন্দন বললে, এই যে, কোতোয়ালজী, আপনি এখানে! তা' আপনি নিজে এবার ভেলা ভাসান নি?

হ্যাঁ, একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় মহম্মদ জান, ভাসিয়েছিলাম।

কোন্‌টা আপনার? নদীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে রঘুনন্দন।

সেটা নেই।

ভেসে গেছে বুঝি?

না, ভাসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে গেছে। একেবারে ভরাডুবি। তেমনি ম্লান হেসে জবাব দেয় মহম্মদ জান।

সত্যি?

আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ?

রঘুনন্দন আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকে।

মহম্মদ জান শান্ত দৃষ্টিতে একবার তাকায় তার মুখের দিকে। সেই দৃষ্টিতে ক্রোধ কিম্বা বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই।

তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, বাস্তবিকই সুন্দর লাগছিল ভেলা দু'টিকে। যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে জীবন দরিয়ায় পাড়ি দিচ্ছিল তারা।

একটু অস্বস্তি বোধ করে রঘুনন্দন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে। তারপর বললে, ঐ সবুজ ভেলাটি কার, আপনি জানেন?

সঠিক না জানলেও একটা কিছু অনুমান করে নিয়েছি, খাজাঞ্চিজী। আর আমার অনুমান সহসা মিথ্যে হয় না।

রঘুনন্দনের কণ্ঠস্বরে এবার যেন একটু দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। বললে, আপনি কি অনুমান করেন, কোতোয়ালজী, যে আপনার ভেলাটির ডুবে যাবার কারণ ঐ গেরুয়া রংয়ের ভেলাটি?

না—না। কক্ষনো নয়; খাজাঞ্চিজী। এটা তো স্রেফ খোদাতালার মর্জি। আপনার ঐ গেরুয়া রংয়ের ভেলাটার সাধ্য কি যে আমার ভেলাটিকে ডুবিয়ে দেয়? আল্লাহ্‌-তালার হুকুমত-এ এসব ব্যাপার ঘটে। তবে—

তবে কি কোতায়ালজী? উৎসুক কণ্ঠস্বর রঘুনন্দনের!

না, এমন কিছু নয়। আপনাকে তো বরাবরই সাহসী, দৃঢ়চেতা মানুষ বলেই জানি। তাই ভেবেছিলাম, আপনি যা-ই কিছু করুন না কেন খোলাখুলি সামনে এগিয়ে এসেই করবেন। রেখে ঢেকে কিছু করার লোক তো আপনি নন্। তাই একটু আশ্চর্য হয়েছি। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে স্মিত হেসে জবাব দেয় রঘুনন্দন, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে কোতোয়ালজী? আপনি বোধহয় জানেন, এমন অনেক ঘটনা আছে যা গোপনে ঘটলেই তার মাধুর্য বেশি ফুটে ওঠে। প্রকাশ্যে তা' মাধুর্য হারিয়ে একেবারেই সাধারণ হয়ে পড়ে। সৌন্দর্যের হানি ঘটে।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। কিন্তু তাতে যে আবার সময় সময় বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়; তাও বোধ করি আপনার অজানা নয়।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠে রঘুনন্দন, এবার আপনি সত্যই হাসলেন, কোতোয়ালজী। বিপদ আপদকে আমি কতটা ভয় করি তা' বোধ হয় আপনি জানেন। তবে হ্যাঁ, পাপকে আমি ঘৃণা করি। আর তা' করি বলেই নিজের বিচারে যেটাকে পাপ বলে মনে করি তা' আমি করি না।

আপনি কি মনে করেন, আপনার নিজের বিচারই শ্রেষ্ঠ বিচার?

হ্যাঁ, অন্ততঃ আমার নিজের ব্যাপারে তো বটেই। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন।

অন্য কেউ যদি তা' মনে না করেন? প্রশ্ন করে মহম্মদ জান।

জবাব দেয় রঘুনন্দন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

তা' হলে, আপনার নিজের ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মতামত অগ্রাহ্য করতেও আপনি প্রস্তুত ?

হ্যাঁ, প্রস্তুত। একটু থেমে রঘুনন্দন আবার বললে—যাকে অন্যায় বলে মনে করি না অন্য কারুর মতামতই আমার সেই মত পাল্টাটে পারবে না।

যদি স্বয়ং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার মতকে সমর্থন না করেন ?

সেক্ষেত্রেও আমি সম্পূর্ণ নিরুপায় ; কোতোয়ালজী।

যদি আপনার ন্যায়কে তিনি অন্যায় মনে করে আপনাকে শাস্তি দেন ?

তা' তিনি দিতে পারেন বৈকি। তিনিই যখন রাজ্যের অধীশ্বর তখন তাঁর সেই অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাই বলে কিছুতেই স্বীকার করে নেব না যে তাঁর প্রদত্ত সেই শাস্তি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করেছে।

এবার একটু বিস্মিত কণ্ঠেই বলে ওঠে মহম্মদ জান, সেকি, খাজাঞ্চিজী ? খোদ্ নবাবের বিচার বিবেচনার উপরও আপনি প্রশ্ন তুল্‌তে চান্ ?

আবার একটু মৃদু হেসে জবাব দেয় রঘুনন্দন, দেখুন কোতোয়ালজী, আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা রাজ্যের অধীশ্বরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেই অভ্যস্ত, তা তিনি যে ধর্মাবলম্বীই হোন্ না কেন। তবে তিনি শুধুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। খোদ ঈশ্বর নন্ কিছুতেই। তাই তাঁরও সাধারণ মানুষের মত ভুল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। ঈশ্বর এবং রাজ্যের অধীশ্বর কোন ভুল করতে পারেন না—এই তত্ত্বের প্রথমটি স্বীকার করে নিলেও দ্বিতীয়টি কিছুতেই আমি স্বীকার করতে পারিনা। তাই সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধির জন্যে

প্রাণ বিসর্জন দিতে পারলেও নিজের ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দিতে পারিনা কিছুতেই। মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ মনুষ্যত্বের সঙ্গে জড়িত। সেই বোধকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থই হল মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়া। মনুষ্যত্ব যে প্রাণের চাইতেও মূল্যবান।

রঘুনন্দন ও মহম্মদ জান তাদের আসল বক্তব্যটিকে ঘিরে আলোচনা চালিয়ে গেলেও কেউই কিন্তু সেই আসল কথাটা মুখফুটে বলে ফেলে নি। সেই কথাটিকে উপলক্ষ্য করে তাদের আলোচনার ধারা এগিয়ে চললেও দু'জনেই কিন্তু সেই কথাটিকে সযত্নে পরিহার করে চলছিল।

দু'জনেই কিন্তু দু'জনার কথায় ও ব্যবহারে বিস্ময় বোধ করছিল। মহম্মদ জানের বিস্ময়ের কারণ রঘুনন্দনের দৃঢ়তা। তার গোপন প্রণয়ের কথা সে জেনে ফেলেছে—একথা বুঝতে পারার পরও রঘুনন্দন এতটুকু বিচলিত হয় নি। খোদ্ নবাবের কানে একথা উঠবার সম্ভাবনা থাকলেও এতটুকু শংকা বোধ করেনি।

রঘুনন্দনের বিস্ময়ের কারণ কিন্তু ভিন্ন। মহম্মদ জান্ ন্যায় অন্যায় নিয়ে আলোচনা করলেও তার কথাবার্ত্তায় যে ঈর্ষাহীনতার ভাবটুকু ফুটে উঠেছিল তাতেই বিস্মিত হয়েছিল রঘুনন্দন। তার কথায় হয়ত সূক্ষ্ম বেদনার সুর লুকিয়ে ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষার কোন ইঙ্গিতই ছিল না তাতে।

ভাগীরথীর তীরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

শেষ হল রাজধানী মুর্শিদাবাদের 'বেরা' উৎসব। নাগরিকরা যে যার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে। ভিড়ও পাতলা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

রঘুনন্দন ও মহম্মদ জান্ একে অপরকে বিদায় সম্ভাষণ

জানিয়ে যখন সেই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন একের মনে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার এতটুকু ঘাটতি হয়নি। বরঞ্চ সেই শ্রদ্ধা বেড়েই গিয়েছিল খানিকটা। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি চিরাচরিত ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণার পরিবর্তে উভয়ই মনে মনে উভয়কে প্রশংসা করছিল। আর তা' সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই।
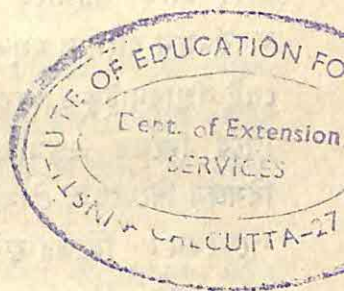
(সাত)

চিন্তিত হয়ে ওঠেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

এতদিন তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, ভাল হোক্ খারাপ হোক্ রীতি অনুসারে তার একমাত্র পুত্র দিলজিত খাঁই তাঁর অবর্ত্তমানে বাংলার মস্‌নদে বসবে। কিন্তু দিলজিতের মৃত্যুতে সেই সম্ভাবনাটুকুও আর রইল না। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজের হাতে যেমন তিনি বিসর্জন দিয়েছেন, তেমনি আবার পুত্রশোকেও অভিভূত হয়ে পড়েছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্যে যদিও কোন অনুশোচনা জাগে নি, কিন্তু সন্তান হারা পিতার দুঃখ তাঁর মনেও বেজেছিল। হৃদয়ের কঠিন আবরণের নিচে যে স্পর্শকাতর সংবেদনশীল মনটি লুকিয়েছিল, সেই মনটি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠেছিল।

মনের দৃঢ়তা ও ঈশ্বর প্রীতির জোরেই অল্পসময়ের মধ্যেই সেই কঠিন শোক ভুলতে পেরেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। আর তারপরেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন তিনি বাংলার মস্‌নদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর চিন্তায়।

অবশ্য তেমন কিছু চিন্তার থাকত না যদি পূর্বের ব্যবস্থামত কন্যা আজিমুন্ নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান্‌কে বিয়ে করতে রাজি হত।

খবরটা তিনি প্রথমে শুনেছিলেন নসেরু বেগমের কাছ থেকে। হারেমের বেগম মহলে স্বামীর কাছটিতে বসে নসেরু বেগমই খবরটা তুলেছিল তাঁর কানে। বলেছিল, মেয়ের বয়স তো কম হল না। এবার ওর সাদীর ব্যবস্থা করো—

মখমল পাতা বিছানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গড়গড়ায় সোনালী জরি লাগানো নলটা মুখে দিয়ে বাদশাভোগ তামাকের সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিয়েছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ, হ্যাঁ, আর দেরি করা চলবে না। আজিমুনের সাদীর ব্যবস্থা এবার করতেই হবে। পাত্র তো হাতের কাছে ঠিক্ হয়েই রয়েছে। এবার মৌলবীকে ডেকে— ।

নবাবের কথার মাঝখানেই বলে উঠেছিল নসেরু বেগম, তুমি যে পাত্র ঠিক করে রেখেছ সেই নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান্‌কে তোমার মেয়ের পছন্দ হবে কিনা সে কথা কি ভেবে দেখেছ ?

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন নবাব, কী যে বল, এমন একটি পাত্র নবাব বাদশাদের ঘরেও দুর্লভ। যেমনি দেখতে শুনতে, তেমনি স্বভাব-চরিত্র আর কর্মকুশলতা। এমন একটি রত্ন আমার গোটা রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমি মনে করি না।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলেছিলেন, খোদাতালার ইচ্ছা অন্য। তাই, আমার ঐ জামাতাই হবে মসনদের উত্তরাধিকারী। লোকচরিত্রে যদি আমার একটুও জ্ঞান জন্মে থাকে তাহলে বলতে পারি ঐ মহম্মদ জান্ মস্‌নদে বসে সত্যিই রাজ্যের মঙ্গল করতে পারবে। সে ক্ষমতা ওর আছে।

কিন্তু তাকে যদি আজিমুনের পছন্দ না হয়? প্রশ্ন করেছিল নসেরু বেগম।

এতদিন পর তুমি আজ হঠাৎ এ' প্রশ্ন তুলছো কেন, বুঝতে পারছি না নসেরু।

কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। শান্ত অথচ চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল নসেরু বেগম।

কী কারণ? ভ্রু-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেছিলেন নবাব, আজিমুন্ কি তোমাকে কিছু বলেছে?

মুখে কিছু না বলে কেবল মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল নসেরু বেগম।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নবাব আবার বলেছিলেন, আজিমুন্ কি তোমাকে বলেছে যে, সে মহম্মদ জানকে সাদী করতে চায় না?

হ্যাঁ।

কেন?

একটু ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিল নসেরু বেগম, স্ত্রীলোকের পছন্দ অপছন্দের মধ্যে সবসময় 'কেন' থাকে না।

ও—আচ্ছা। গম্ভীর মুখে আবার খানিকক্ষণ চিন্তা করে নবাব বলেছিলেন, বেশ, তবে তাই হবে। আজিমুন্ শিক্ষিতা, তার মতের বিরুদ্ধে আমি তার সাদীর ব্যবস্থা করতে চাই না। আমাকে তা' হলে আবার অন্য চেষ্টা করতে হবে।

তেমন কোন চেষ্টা হয়ত তোমাকে নাও করতে হতে পারে।

তার মানে?

তার মানে, পাত্র এই মুর্শিদাবাদেই রয়েছে।

আবার ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল নবাবের। জিজ্ঞেস

করেছিলেন, কে সে? সরাসরি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেছিল নসেরু বেগম, তাকে তুমিও ভালমতই চেন। মহম্মদ জানের মত সেও তোমার একজন প্রিয়পাত্র। দেখতে শুনতে কর্মক্ষমতায় সেও মহম্মদ জানের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

কী বলছ তুমি নসেরু? এমন কোন লোককে তো আমি চিনি না।

হ্যাঁ, চেন। তবে—।

তবে কি?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিয়েছিল নসেরু বেগম, তবে সে মুসলমান নয়, হিন্দু।

কী—কী কললে? সে হিন্দু? তুমি কি—তুমি কি রঘুনন্দনের কথা বলছো?

হ্যাঁ। তাকেই তোমার কন্যার পছন্দ! সে সেদিন আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছে, ঐ রঘুনন্দন ছাড়া সে আর কাউকেই বিয়ে করবে না। প্রয়োজন হলে সে সারাজীবন কুমারী থাকতেও রাজি। তবুও না।

সেই মুহূর্তে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল মুর্শিদকুলী খাঁর। মনে মনে বলেছিলেন তিনি—আল্লা রসুল! এ আবার কি নতুন বিপদ এসে দেখা দিল? রাজ্যে এত মুসলমান আমীর, ওমরাহ, খান-ই খানান থাকতে ঐ হিন্দু রঘুনন্দনকে সাদী করতে মেতে উঠ্‌লো কেন আজিমুন্? রঘুনন্দন যে সত্যিই উপযুক্ত তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু শারিয়তকে অগ্রাহ্য করে কেমন করে ঐ হিন্দু ব্রাহ্মণের হাতে তিনি তুলে দেবেন তাকে? এমন অদ্ভুত খেয়াল কেন হল আজিমুনের? কী সূত্রে এমন মহব্বত ঘট্‌ল তাদের মধ্যে?

নসেরু বেগমের কাছ থেকে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনটি দিন নিজের মনে আলোচনা করেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। অবশেষে চতুর্থ দিন তিনি গোপনে এত্তেলা দেন রঘুনন্দনকে।

ব্যাপারটা আগেই টের পেয়েছিল রঘুনন্দন। তাই নবাবের আহ্বানের কারণটি বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না তার। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নবাব মহলের বিশ্রাম কক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় সে।

দীর্ঘ কুর্নিশের পর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নবাব কিছু সময় স্থির দৃষ্টিতে রঘুনন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন, তোমাকে কেন ডেকেছি, বুঝতে পেরেছো ?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন, সঠিক বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে পেরেছি, জাঁহাপনা।

শুনতে পেলাম, আমার বেটি আজিমুন্ নাকি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই সাদী করতে চায় না—এ খবর কি সত্যি ? সোজাসুজি প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে রঘুনন্দন অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ জাঁহাপনা। যতদূর বুঝতে পেরেছি তার মনোভাব ঐ রকম।

তুমিও কি তাকে সাদী করতে চাও ! আবার প্রশ্ন করেন নবাব।

তেমনি অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন, হ্যাঁ জাঁহাপনা।

হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমানকে সাদী করতে তোমার আপত্তি নেই ?

না, জাঁহাপনা। আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। একটু থেমে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আবার প্রশ্ন করেন, আমার বেটীর সাথে প্রতিদিন তোমার সাক্ষাৎ হয় ?

প্রশ্নটা শুনেই রঘুনন্দনের মনে পড়ে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে নবাবের হারেমের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্ন সে তুলেছিল! এই মুহূর্তে নবাবের ঐ প্রশ্নের গতিও সেইদিকেই। তিনিও হয়ত সেই প্রশ্নই তুলবেন।

রঘুনন্দন এক মুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর অবিচল কণ্ঠে জবাব দেয়, হাঁ জাঁহাপনা। সাক্ষাৎ হয়। তবে প্রতিদিন নয়। মাঝে মাঝে।

কোথায়, কী সূত্রে সাক্ষাৎ হয় তার সঙ্গে ? মুর্শিদকুলী খাঁর কণ্ঠে যেন কৈফিয়ত তলবের সুর!

সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দনের মনটাও একটু কঠিন হয়ে ওঠে। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, একজন যুবাপুরুষ একটি যুবতীর সাথে কোথায় কীভাবে সাক্ষাৎ করে সে খবর কি আপনার না জানলেই নয়, জাঁহাপনা ? তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠবার খুঁটিনাটি খবর কি আপনার একান্তই প্রয়োজন ? অবশ্য জাঁহাপনা যদি হুকুম করেন তো আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাটি পর্যন্ত আপনার কাছে প্রকাশ করতে আমি বাধ্য। তবে আমার মনে হয়, জাঁহাপনা, সম্ভবতঃ নিজের কন্যার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু বলতে আমাকে আদেশ করবেন না।

বুদ্ধিমান নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কিন্তু তখনই সতর্ক হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা

করেন না তিনি। তাই আবার বললেন, আমি যদি তোমাদের এই সাদীতে মত না দিই?

তা' আপনার অভিরুচি, জাঁহাপনা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন।

দীর্ঘ সময় বসে চিন্তা করেন মুর্শিদকুলী খাঁ। রাজ্য, রাজত্ব, মসনদ, প্রজাপুঞ্জ শরিয়তি কানুন প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে অতি দ্রুত চিন্তা করেন তিনি। সমাজ, সংস্কার প্রভৃতিও বাদ যায় না তাঁর ভাবনার আওতা থেকে।

অবশেষে এক সময় সম্মুখে দণ্ডায়মান রঘুনন্দনের মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের এই সাদীতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, রঘুনন্দন। তোমরা পরস্পরকে জীবনসঙ্গী-রূপে লাভ করে সুখী হও, আমিও তাই কামনা করি। আমার আজিমুন্‌কে সাদী করে তুমিই ভবিষ্যতে বাংলার মস্‌নদের অধিকারী হবে। বলতে আমার দ্বিধা নেই যে মস্‌নদে বসবার যোগ্যতা তোমার আছে। তবে—!

মাথা নীচু করে মুর্শিদকুলী খাঁর কথা শুনছিল রঘুনন্দন। অকস্মাৎ কথার মাঝখানে নবাব থেমে যেতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায় সে।

মুর্শিদকুলী খাঁ আবার বলতে থাকেন, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি ইস্‌লামের দাস। খাঁটি মুসলমান আমি। নিয়মমত পাঁচওয়াক্ত নমাজ পড়তে এতটুকু শৈথিল্য নেই আমার। জীবনের প্রতিপদে শরিয়তের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেই আমি অভ্যস্ত। আমার বেটী আজিমুন্‌ও খাঁটি মুসলমান। সেও আমার মত ইস্‌লাম ভক্ত। তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। কাজেই, শরিয়তি কানুন অনুসারে তোমাকে

মুসলমান হতে হবে। তারপর আজিমুন্‌কে তোমার হাতে তুলে দিতে আমার কোনই অসুবিধা থাকবে না।

নবাবের কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দারুন চমকে ওঠে রঘুনন্দন। ধর্মান্তর গ্রহণের কথায় সারা মনটা ঘৃণায় রি—রি করে ওঠে তার। ভাবনা চিন্তার সুযোগটুকু গ্রহণ না করেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, গোস্তাকি মাপ হয় জাঁহাপনা। আপনার কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করতে পারলে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। কিন্তু ধর্মত্যাগ করাটাকে আমি চিরকাল ঘৃণার চোখে দেখি। আমার মতে ধর্ম ত্যাগের চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো। আমিও খাঁটি হিন্দু সন্তান। ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমি কিছুতেই ধর্মত্যাগ করতে পারবো না। আপনি আমাকে মাপ করবেন, জাঁহাপনা।

কিন্তু তুমি হিন্দু হয়ে কি করে একজন মুসলমানকে সাদী করবে? প্রশ্ন করেন নবাব। না, জাঁহাপনা। তাতে আমার কোনই অসুবিধে নেই। আমি আপনার কন্যাকেও কোনদিন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বলবো না। সে মুসলমান, মুসলমানই থাকবে, আমি হিন্দু, হিন্দুই থাকবো। কিন্তু তাই বলে আমাদের মধ্যে কোনদিন মনান্তর হবে না—এ আশ্বাস আপনাকে আমি নিশ্চয়ই দিতে পারি, জাঁহাপনা।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যদিও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু হিন্দু সমাজের উপর তেমন কোন আস্থাও ছিল না তাঁর। সেই মুহূর্তে নিজর জীবনের একটি ঘটনার কথা বারবার মনে পড়ছিল। অনেক—অনেক দিন আগের সেই ঘটনা। তখনও তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ হন নি। নাম ছিল তাঁর মহম্মদ হাদি। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ধর্মান্তরিত ছেলে মহম্মদ

হাদি ইস্পাহান থেকে ফিরে এলেন দাক্ষিণাত্যে। হিন্দুধর্মের প্রতি তখনও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাই, সেদিন তিনি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজের শিরোমণিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ছিলেন স্বধর্মে ফিরে যাবেন বলে। কিন্তু সে পথ তখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। হিন্দুসমাজ ঠাঁই দেয়নি তাঁকে। বরং ধর্মান্তরিত বলে সেদিন তারা তাঁকে ঠাট্টা করেছিল, বিদ্রূপ করেছিল, ঘৃণা করেছিল।

সেদিন মহম্মদ হাদি চিৎকার করে তাদের জানিয়েছিলেন, আমি নিজের ইচ্ছায় ধর্মান্তরিত হই নি। দাস ব্যবসায়ীরা আমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ইস্পাহানের বাজারে বিক্রয় করেছিল। সেখানে, আমার ক্রেতা আমার মতামতের কোনই মূল্য না দিয়ে আমাকে ধর্মান্তরিত করেছিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সেই গোঁড়া হিন্দুসমাজ সেদিন তাঁর কোন কথাই কানে তোলে নি। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তাঁকে।

রঘুনন্দনের সাথে কথা বলতে বলতে সেই ঘটনার কথাই বার বার মনে পড়ছিল নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর। তিনি ভাবছিলেন বাংলার মসনদের কথা। তাঁর অবর্ত্তমানে রঘুনন্দন এই মসনদে বসলে বাংলার ইতিহাসে মুসলমান যুগ শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে হিন্দু যুগ। তা' তিনি হতে দিতে পারেন না। এটা হবে গোটা মুসলমান সমাজের সঙ্গে বেইমানীর সমতুল্য।

মুর্শিদকুলী খাঁ জিজ্ঞেস করেন, হিন্দু ব্রাহ্মণের মুসলমান স্ত্রীকে তোমাদের হিন্দুসমাজ গ্রহণ করবে?

একটু দ্বিধা করে রঘুনন্দন। সন্দেহ দেখা দেয় তার মনে। বাংলার হিন্দুসমাজ তার অপরিচিত নয়। তাই সে জবাব

দেয়, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়েও আমার গোঁড়ামী নেই বলে এখনও হিন্দুসমাজ আমাকে তেমন প্রীতির চোখে দেখে না। আড়ালে তারা উপহাস করে আমাকে। সেদিনও তারা তাই করবে। কিন্তু তাদের ঐ উপহাস অগ্রাহ্য করে আজও যেমন আমি চলছি, সেদিনও তেমনই চলবো জাঁহাপনা।

না, তা' হয় না রঘুনন্দন। তুমি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, আর তোমার স্ত্রী নিষ্ঠাবতী মুসলমান—এমন একটা অবস্থা আমি কল্পনাই করতে পারি না। তা' ছাড়া হিন্দুসমাজ যখন তোমাকে প্রীতির চোখে দেখে না, তখন তো ধর্মান্তর গ্রহণে তোমার আপত্তি থাকতে পারে না।

এবার একটু মৃদু হেসে জবাব দেয় রঘুনন্দন, ঠিক ঐ কারণেই ধর্মান্তর গ্রহণের কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না, জাঁহাপনা। আমি চাই, ওরা দেখুক, বুঝুক যে আমি ওদের মত গোঁড়া নই সত্য, কিন্তু হিন্দুধর্মে আমার নিষ্ঠা ওদের কারুর চেয়েই কম নয়।

একটু ভেবে নিয়ে রঘুনন্দন আবার বলতে থাকে, নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাবতী মুসলমান স্ত্রীর কথা কেন যে জাঁহাপনা কল্পনা করতে পারছেন না, তা' আমি বুঝতে পারছি না। কোন নিষ্ঠাবান মুসলমানের হিন্দু স্ত্রীর কথা কি জাঁহাপনা জানেন না?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। তবে তারা প্রত্যেকেই সাদীর আগে কিংবা পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

সামান্য একটু হাসির রেখা রঘুনন্দনের ঠোঁটের কোনে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। জবাবে সে বললে, জাঁহাপনার বোধ হয় বিস্মরণ হয়েছে। শাহান্‌শা আকবরের বেগমদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন যোধপুরী বেগম। তিনি ছিলেন রাজা

মানসিংহের ভগ্নী—যোধাবাঈ। যোধপুরী বেগম বরাবরই হিন্দু ছিলেন। তিনি কোনদিন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নি। ধর্মাচরণে তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্বয়ং শাহান্‌শা আকবর যোধপুরী বেগমের হিন্দুমতে উপাসনার জন্যে তাঁর মহলে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই পূজার প্রসাদ গ্রহণ করতেও শাহান্‌শা আকবরের কোন আপত্তি ছিল না।

অকাট্য যুক্তি। এর উপর অন্য কোন যুক্তি খাটে না। তাই, যুক্তির আশ্রয় ত্যাগ করে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বললেন, স্বীকার করছি, রঘুনন্দন, তোমার যুক্তি খণ্ডন করা সহজ নয়। কিন্তু মানুষের মন সব সময় যুক্তি মেনে চলে না। তাই আমার ইচ্ছে নয় যে আমার একমাত্র বেটী আজিমুন্‌কে কোন বিধর্মীর হাতে তুলে দিই। আমি এখনই তোমার কাছে কোন জবাব চাই না, রঘুনন্দন। চিন্তা ক'রে পরে তুমি জবাব দিও। আজিমুন্‌কে সাদী করতে হলে তোমাকে মুসলমান হতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রঘুনন্দন, এর মধ্যে আর ভাবনা চিন্তার কিছু নেই, জাঁহাপনা। আপনার কন্যার জন্যে আমি হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করতে পারি। কিন্তু কিছুতেই ধর্মত্যাগ করতে পারবো না।

নবাব মুর্শিদকলী খাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই হিন্দু যুবকটির স্বভাব তাঁর অজানা নয়। অতীতেও রাজকার্যের ব্যাপারে রঘুনন্দনকে দিয়ে তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করাতে পারেন নি তিনি। অবশ্য, প্রতিবারই এই যুবকটির মতামতই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর তাতে রাজ্যের কল্যাণই হয়েছে বলতে হবে।

তাই, আজ রঘুনন্দনের এই দৃঢ়তায় তিনি মনে মনে শংকিত হয়ে ওঠেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আজিমুনের মুখখানা। তাঁর কানের কাছে বাজতে থাকে নসেরু বেগমের মুখে শোনা আজিমুনের সেই কথা—প্রয়োজন হলে চিরকুমারী থাকবো, তবুও রঘুনন্দন ছাড়া কাউকে সাদী করতে পারবো না।

রঘুনন্দনের স্পষ্ট কথার জবাবে একটু যেন অনুনয়ের সুর বেজে ওঠে মুর্শিদকুলী খাঁর কণ্ঠে। তিনি আবার বললেন, না—না, রঘুনন্দন। এমন একটা কঠিন ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে এসো না তুমি। আমি তোমাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। ভাল করে ভেবেচিন্তে সাতদিন পরে জবাব দিও। ভুলে যেও না, একদিকে আমার বেটী খুবসুরত্ আজিমুন্—বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপে-গুণে যে নাকি অদ্বিতীয়া। ত'ছাড়া আছে গোটা রাজ্যের ধন-দৌলত। আর সর্বোপরি বাংলার মস্‌নদ। আর অন্যদিকে তোমার ধর্ম। একটাকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। খুব হুঁসিয়ার হয়ে চিন্তা করে জবাব দিও। ভুলে যেও না, সস্তা আদর্শের ভেল্‌কি দেখিয়ে রাতারাতি বাজার গুল্‌জার করে তোলা চলে। কিন্তু তাতে আখেরে তেমন কিছু হয় না। একবার ভুল করলে জিন্দেগীভোর মাস্থল দিয়েও তার প্রতিকার করা যায় না।

সাতদিন তো দূরের কথা সাত মুহূর্ত সময়েরও প্রয়োজন ছিল না রঘুনন্দনের। তবুও নবাবের সম্মান রক্ষা করতে সাতদিনের সময় নিয়ে সে নবাবের বিশ্রাম কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

সেই রাতেই নবাবজাদী আজিমুনের সথে দেখা হয় রঘুনন্দনের।

সন্ধ্যা থেকেই সেদিন আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। দেবদারু গাছের উঁচু মাথাগুলো যেন পূর্বাহ্নেই ঝড়ের সংকেত পেয়ে থর থর করে কাঁপছে। আকাশে বাতাসে একটা থম-থমে ভাব। সমগ্র পৃথিবী যেন কোন্ এক অজানা আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। নগরের অধিবাসীরা ঝড়ের আশঙ্কায় যে যার আস্তানায় ফিরেছে তাড়াতাড়ি।

রাজকার্য শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে রঘুনন্দন ঠিক করেছিল, সেদিন রাতেই সে যাবে আজিমুনের কাছে। তাকে বলতে হবে সব কথা। শুনতে হবে তার অভিমত।

রাতের প্রথম প্রহরেই ঝড় উঠ্‌লো, কিন্তু তখন তার বেগ তত প্রবল নয়। রাত বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে, গভীর রাতে যেন চারিদিকে প্রলয় সুরু হল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হল বৃষ্টি। বাইরে গাছপালা ভাঙ্গার মড়-মড় শব্দ, আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক্, আর সেই সঙ্গে বাতাসের দাপাদাপি।

রাতের আহার শেষ করে নৈশ অভিযানে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল রঘুনন্দন। ভেবেছিল, একটু পরেই হয়ত ঝড় থেমে যাবে।

কিন্তু তার বদলে ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে দেখে চিন্তিত হয়ে ওঠে রঘুনন্দন। কেমন যেন একটা বিরক্তি অনুভব করে।

একবার ভাবে, নাঃ, এই ঝড়জলের মধ্যে বেরিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে পোষাক পরিচ্ছদ্ ছেড়ে শুয়ে থাকা যাক। কিন্তু পরক্ষণেই নবাবজাদীর মহলের প্রতি কেমন যেন একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। যেন আজই

এখনই তার বলবার কথাগুলো আজিমুন্‌কে না বলতে পারলে সে শান্তি পাবে না। যেন কথাগুলো বলার সুযোগ পাবে না আর কোনদিন।

ঠিকই ভেবেছিল রঘুনন্দন। সেই দিনই গভীর রাতে ঝড়জল মাথায় করে সে যদি আজিমুনের সাথে দেখা করতে না যেত তবে হয়ত আজিমুন্‌কে তার বলার কথা কোনদিনই বলা হত না।

ভিজে সপসপে পোশাকে রঘুনন্দনকে দেখেই আজিমুন্‌ শংকিত কণ্ঠে বলে ওঠে, একি। এই ঝড়জলের মধ্যে আজ না এলেই তো পারতে।

জামার আস্তিনে মুখের জল মুছতে মুছতে জবাব দেয় রঘুনন্দন, না এসে থাকতে পারলাম না আজিমুন্‌।

তাই বলে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে? পথে কত রকম বিপদ হতে পরেতো!

কোন জবাব না দিয়ে একটু ম্লান হাসে রঘুনন্দন।

ওকি, হাসছো যে? প্রশ্ন করে আজিমুন্‌।

জবাব দেয় রঘুনন্দন, হাসছি তোমার শংকা দেখে। এই সামান্য ঝড়জল আর এমন কী বিপদ? তার চাইতেও বড় বিপদ মাথায় করে এই দীর্ঘদিন তোমার এখানে আসছি আমি। রঘুনন্দনের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আজিমুন্‌ ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, কিন্তু কী মুশকিল, আমি পরতেই বা কী দিই?

তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না আজিমুন্‌। ভিজে পোষাকে আমার কিছু হবে না। তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতেই আমি আজ এসেছি।

কী কথা? একটু যেন বিস্মিত হয় আজিমুন্‌।

এক মুহূর্ত থেমে রঘুনন্দন আবার বলে, তোমার বাবা আজ আমাকে ডেকেছিলেন।

কেন?

তোমার আমার সম্বন্ধের কথাটা তিনি জানতে পেরেছেন। সেই জন্যই ডেকেছিলেন।

বোধহয় আমার মা কথাটা বলেছেন বাবাকে! তা' তিনি কী বললেন। আজিমুনের কণ্ঠে এবার আগ্রহের সুর ফুটে ওঠে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললে রঘুনন্দন, তিনি সোজসুজি জানতে চাইলেন, তোমাকে বিয়ে করতে আমি রাজি কিনা।

অকস্মাৎ লজ্জায় আজিমুনের গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে। তার বাবা মুর্শিদকুলী খাঁ তাদের এই ভালবাসাকে কী চোখে দেখবেন সে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ তার মনেও ছিল। কিন্তু তিনি বোধহয় সহজভাবেই নিয়েছেন ব্যাপারখানা। তাই সোজাসুজি সাদীর কথা তুলেছেন রঘুনন্দনের কাছে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে আজিমুন্ বললে, আমি জানতাম, বাবা এর মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পাবেন না। তাঁর মনটা সত্যিই প্রশস্ত। তোমাকে ভালবেসেছি বলে তিনি বিরক্ত হবেন না মোটেই। যা ভেবেছি ঠিক্ তাই হয়েছে। তিনি সাদীর ব্যাপারেই তোমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আর তুমিও নিশ্চয়ই মত দিয়ে এসেছো? কথাটা বলেই একটু লাজুক হাসি হাসে আজিমুন্। রঘুনন্দনের মনের কথা তার অজানা নয়। তাই, সে যে নবাবকে মত দিয়ে আসবে তাতে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তার।

রঘুনন্দন কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, না আজিমুন্। আমি মত দিতে পারিনি। কেমন যেন একটা আশঙ্কায়

হঠাৎ মনটা দুলে ওঠে আজিমুনের। রঘুনন্দনের জবাব যেন শুনেও শুনতে পায়নি সে। বুঝেও যেন বুঝতে পারে নি।

মুখে কিছু না বলে আজিমুন্ কেবল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রঘুনন্দনের মুখের দিকে। সেই মুহূর্তে তার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা যেন কর্পূরের মত উবে যায়।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে রঘুনন্দন বলতে থাকে, না আজিমুন্, সত্যিই আমি মত দিতে পারি নি। তোমাকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে পেতে উদ্‌গ্রীব হয়েও তোমার বাবাকে আমি মত দিতে পারি নি। কারণ তা' দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কেন? অতি মৃদু শোনায় আজিমুনের কণ্ঠস্বর।

কারণ—একটু দ্বিধা করে রঘুনন্দন। তারপর আবার বলে, কারণ, তোমার বাবা আমাদের বিয়ের ব্যাপারে একটি সর্ত আরোপ করেছেন। তোমাকে বিয়ে করতে হলে আমাকে স্বধর্ম ছেড়ে মুসলমান হতে হবে।

ম্লান কণ্ঠে আজিমুন্ বললে, বাবার এই নিষ্ঠুর শর্তের কারণ কী? তিনি তো কোনদিনই হিন্দু বিদ্বেষী নন।

তা' জানিনা আজিমুন্। তবে তাঁর কথায় মনে হল, তোমাকে বিয়ে করে কোন হিন্দু বাংলার মস্‌নদে বসে, তা তিনি চান না। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান বোধহয় তিনি কামনা করেন না।

না—না, এ হতে পারে না। এমন নিষ্ঠুর শর্ত তিনি কিছুতেই আরোপ করতে পারেন না। আমি নিজে তাঁকে বলবো। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে নিজের সাদীর ব্যাপারে আজি নিজেই গিয়ে দাঁড়াবো তাঁর কাছে।

রঘুনন্দনের ঠোঁটের কোণে আবার একটু ম্লান হাসি দেখা দেয়। বললে, চেষ্টা করে দেখতে পারো, আজিমুন্।

তবে কোন ফল হবে বলে আমি মনে করি না। যদিও তিনি তোমার বাবা, কিন্তু তাঁকে আমিও ভালভাবে চিনি। তাঁর কথায় মনে হল, এই শর্তের এতটুকু নড়চড় হবে না কোনমতেই।

তা' হলে উপায়? অসহায় কণ্ঠে বললে আজিমুন্।

কোন উপায় তো দেখছি না। জবাব দেয় রঘুনন্দন।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে আজিমুন্। তারপর আবার বললে, বাবার শর্তে কি তুমি রাজি হতে পারো না, কুমার?

না, তা' সম্ভব নয়।

একটা ঢোক গিলে আজিমুন্ আবার বললে, তোমার কাছে কি তোমার ধর্ম আমার চাইতেও বড়? ধর্মের জন্যে কি তুমি আমাকেও ত্যাগ করতে পারো?

রঘুনন্দনের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে একটা স্পষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ পায় এবার। জবাব দেয় সে, দেখ আজিমুন্, এখানে বড় ছোটর প্রশ্ন নেই। ধর্ম ত্যাগ করা মানে মনুষ্যত্ব ত্যাগ করা বলেই আমি মনে করি। যে ধর্মের উপর আমার অটুট আস্থা, অসীম শ্রদ্ধা, প্রেমের জন্যে সেই ধর্ম আমি ত্যাগ করতে পারি না। মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে তোমাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেতে চাই না আমি।

বাংলার নবাবীর বিনিময়েও নয়?

না, নবাবীর বিনিময়েও নয়। তেমনি দৃঢ় কণ্ঠস্বর রঘুনন্দনের।

মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে আজিমুন্। মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রনার অস্তিত্ব অনুভব করে। কে যেন কঠিন হাতে তার মনটাকে মুচ্‌ড়ে দুম্‌ড়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। সেই অব্যক্ত অসহনীয় যন্ত্রনা

প্রকাশ পায় তার অশ্রুধারায়। হু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে থাকে বহুমূল্য কার্পেটের উপর।

রঘুনন্দন আরও একটু সরে আসে আজিমুনের কাছে। ঝাড়-লণ্ঠনের সহস্র দীপের আলোয় আজিমুনের চিবুক ধরে তার সুন্দর মুখখানা একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করো আজিমুন্, ভালবাসা অমর। মানুষের আত্মার মত ভালবাসারও মৃত্যু নেই। কারণ ঐ আত্মার সঙ্গেই যে ভালবাসার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। না-ই বা হল আমাদের বিয়ে, না-ই বা পেলাম তোমাকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে, তোমার আসন চিরকালই পাতা থাকবে আমার মনের রাজ্যে। সেখান তুমিই সর্বেসর্বা, তুমিই সম্রাজ্ঞী। সেখান থেকে তোমাকে একচুল নড়াবার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারুর নেই। স্বর্গের অপ্সরী, মর্তের নারী, আর পাতালের দানবী, কারুর ক্ষমতা নেই।

কিন্তু—কিন্তু, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আজিমুন্, কিন্তু, বাবার আদেশে যদি ভবিষ্যতে অন্য কোন পুরুষকে সাদী করতে আমি বাধ্য হই, কুমার?

তেমনি রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন, তেমন কোন ঘটনা যদি সত্যিই তোমার জীবনে ঘটে, তখনও আমার এই হৃদয়ের আসনে অম্লান হয়ে থাকবে একমাত্র তোমারই স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি নিয়েই আমি সারাটা জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবো।

আট

সাত দিনের প্রয়োজন হল না।

পরের দিনই চেহেল সেতুনে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে নিজের চূড়ান্ত মতামত জানিয়ে দেয় রঘুনন্দন। খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে থাকেন নবাব। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে তাঁর মুখে। কপালের বলীরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাতের টকটকে গোলাপ ফুলটা একবার মাত্র নাকের কাছে নিয়েই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। পিছনে দাঁড়ানো বিরাট তালপাতার পাখা হাতে লোকদু'টির দিকে একবার বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাতেই তাদের হাতের পাখা জোরে আন্দোলিত হতে থাকে। তারপর রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, বেশ, তোমার অভিমত শুনলাম। এবার তুমি যেতে পারো।

রঘুনন্দন নবাবকে সসম্মানে কুর্নিশ করে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আবার বললেন, হ্যাঁ, আর একটা কথা। এরপর আমার বেটী আজিমুনের সাথে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয় তা' আমি চাই না।

জাঁহাপনার আদেশ আমার মনে থাকবে। জবাব দেয় রঘুনন্দন। তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে চেহেল সেতুন থেকে।

চিন্তিত মুখে আরও খানিকক্ষণ সেখানে বসে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। বোধ হয় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিন্তা করেন তিনি। তারপরই পার্শ্বচরকে ডেকে হুকুম দেন, খবর দাও হারেমে, নবাবজাদীর মহলে যাবো আমি।

কখন যাবেন, জাঁহাপনা? পার্শ্বচরটি বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে।

এখনই। গম্ভীর কণ্ঠস্বর নবাবের।

একটু দ্বিধা করে পার্শ্বচরটি আবার বললে, এখন তো আপনার গোসল্ আর খানার সময়, জাঁহাপনা।

চুপ রও বেয়াদপ্। ধমকে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ, গোসল্ আর খানার সময় আমার ভালই জানা আছে। তোমাকে যা বলছি তাই করো। খবর দাও নবাবজাদীকে। নিজের কর্তব্য করতে গিয়ে নবাবের কাছে ধমক খেয়ে পার্শ্বচরটি আর কিছু না বলে দ্রুত প্রস্থান করে।

সহচরী রাবেয়ার মুখে নবাবের এই অসময়ে আগমনের খবর পেয়ে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে আজিমুন্। হঠাৎ এমন কী প্রয়োজন হল যে, নবাব চেহেল সেতুন থেকে নিজের মহলে না গিয়ে সোজা এখানে আসছেন? কী বলতে চান তিনি?

চিন্তিত মুখেই নবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে আজিমুন্, অবশেষে একসময় গম্ভীর মুখে এসে হাজির হন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার আজিমুনের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, চেষ্টার ত্রুটি করিনি, মা। কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না রঘুনন্দনকে। কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে আজিমুন্। নবাব তাকে কিছু নতুন কথা শোনান নি। আগের দিন রাতেই

সে রঘুনন্দনের নিজের মুখেই তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানতে পেরেছিল।

চুপ করে থাকলেও সেই মুহূর্তে পিতাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল আজিমুনের। সে প্রশ্ন করতো—কেন, কেন তুমি এমন একটা অন্যায় শর্ত আরোপ করতে গেলে? রঘুনন্দনের চরিত্র তো তোমার অজানা নয়। তুমি কি ভেবেছিলে ঐ মস্‌নদের লোভেই সে ধর্মত্যাগ করবে? নাকি এটা কেবল রঘুনন্দনকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টা? তাই যদি হয় তো তুমি খুবই ভুল করেছ, বাবা। তাকে সরিয়ে দিতে পারলেও তার স্মৃতি আমার মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। চোখ বুজলেই যাকে আমি দেখতে পাই, যার উপস্থিতি প্রতিনিয়ত আমি নিজের একান্ত কাছে অনুভব করি, তাকে তুমি সরিয়ে দেবে কেমন করে? সে সাধ্য তোমার কোথায়, বাবা?

আজিমুন্‌কে চুপ করে থাকতে দেখে মুর্শিদকুলী খাঁ আবার বললেন, তুই ভুল করেছিস্‌ মা। রঘুনন্দনকে প্রশ্রয় দিয়ে তুই খুবই ভুল করেছিস্‌। রঘুনন্দন জবরদস্ত, রঘুনন্দন নওজোয়ান, কিন্তু তার এলেমের একান্তই অভাব। তা' ছাড়া, সে যতই উপযুক্ত হোক না, তার কিসমৎ যাবে কোথায়? ঐ হিন্দু ব্রাহ্মণের কিস্‌মতে রয়েছে খাজাঞ্চিগিরি করা, নবাবী ওর ধাতে সইবে কেন? তাই বলছি, ওকে তুই ভুলতে চেষ্টা কর। আমার রাজ্যে তোর উপযুক্ত যে আরও একজন নওজোয়ান রয়েছে তাকে সাদী কর্‌ তুই।

কে, বাবা? এতক্ষণে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে আজিমুন্‌।

কেন, নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান্‌। সে তো কোন

অংশেই রঘুনন্দনের চেয়ে ছোটো নয়। তাই তো তার সাথে তোর সাদীর অনেকদিন আগেই আমি ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু তোর হঠাৎ কী যে হল। কেন যে তুই ওর উপর এমন বেজার হয়ে উঠ্‌লি তা' আজও আমি ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

ঐ লোকটার কথা তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করো না, বাবা। বিরক্তি প্রকাশ পায় আজিমুনের কণ্ঠস্বরে।

কেন—কেন, সে এমন কী করেছে?

লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। আমাকে সাদী করে তোমার মস্‌নদের অধিকারী হবে, সেই লোভেই সে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ—। কথাটা শেষ করতে পারে না আজিমুন্। দিলজিতের কথা মনে হতেই তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

কে—কে তোকে বললে এ কথা? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন নবাব।

যেই বলুক না কেন, তা-ই ছিল ওর আসল মতলব। ঐ লোকটাকে আজও চিনতে পারো নি, বাবা।

খানিকক্ষণ মৌন হয়ে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। ধীর কণ্ঠে বললেন তিনি, তুই মস্তবড় ভুল করেছিস্, মা। সত্যি কথা বলতে কি, আমার রাজ্যে সত্যিকারের নির্লোভ বলে যদি কেউ থাকে তো কেবল দু'টি মাত্র লোকই আছে। তাদের মধ্যে একজন ঐ মহম্মদ জান। আর একটি অবশ্য রঘুনন্দন। মহম্মদ জান যে এমন নীচমনের অধিকারী, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। সে যা' করেছে, তা' কেবল কর্ত্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই করেছে। গভীর নিষ্ঠায় আমার আদেশ পালন করেছে।

আর তুই কিনা তার উপর এমন অবিচার করে বস্‌লি? তার নিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ভুল করলি?

কিন্তু—। কিছু বলতে যায় আজিমুন্‌।

না, মা। এতে আর কিন্তু নেই। আমার যতই বদ্‌নাম থাকুক না কেন, লোক চিনতে ভুল করেছি, এমন বদ্‌নাম আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে দিতে পারে নি।

মুর্শিদকুলী খাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কথাবলার ভঙ্গিতে আজিমুনের এতদিনের দৃঢ় বিশ্বাসের মূল এই যেন প্রথম একটু নড়ে ওঠে, মনে একটু সন্দেহ দেখা দেয়—সত্যিই কি তবে আমি ভুল করেছি? সত্যিই কি মহম্মদ জানের উপর অবিচার করেছি আমি!

কিন্তু—আবার বলতে থাকে আজিমুন, কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না বাবা, ও ছোট ঘরের ছেলে।

কস্‌বীর ছেলে তো? মৃদু হেসে বললেন মুর্শিদকুলী খাঁ, হ্যাঁ মা, তাও আমি জানি। একটু থেমে নবাব আবার বললেন, আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি তোর কথা ভেবে। তুই আমার শিক্ষিতা বেটী হয়ে এই প্রশ্ন তুললি কেমন করে? তুই কি জানিস না, মানুষের ছোট কিম্বা বড় ঘরে জন্ম কেবল খোদাতালার মর্জি? তুই কি জানিস না, মানুষকে বিচার করতে হয় তার নিজের কাজ দিয়ে, তার জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়ে নয়!

পিতার কথায় সত্যিই যেন একটু লজ্জা পায় আজিমুন্‌। কোন জবাব না দিয়ে সে কেবল চুপ করে থাকে।

লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কিন্তু নিজের কন্যার বেলাতেই মস্ত একটা ভুল করে বসেন। কন্যার মৌনতা উৎসাহ জোগায় তাঁকে। ভাবেন, আজিমুনের মন থেকে যখন

ভুল ধারণাটা তিনি সরিয়ে দিতে পেরেছেন, তখন হয়ত মহম্মদ জানকে সাদী করার কথায় সে রাজি হবে।

তাই তিনি আবার বললেন, আর দ্বিধা করিস্ না মা, মহম্মদ জান সত্যিই একটি রত্ন; আমি বলছি, তাকে সাদী করলে তুই সুখী হবি—

মুর্শিদকুলী খাঁর কথা শেষ হবার আগেই অচঞ্চল কণ্ঠে আজিমুন্ বলে ওঠে, না—না, বাবা। ওকথা বলো না তুমি। ও যতই ভাল হোক না কেন, ওকে আমি সাদী করতে পারবো না কিছুতেই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো বাবা।

কেন—কেন পারবি না? সে কি তোর অনুপযুক্ত?

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে আজিমুন্।

কী, চুপ করে রইলি কেন? কথার জবাব দে। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পায় নবাবের। ধীরে ধীরে মাথা তোলে আজিমুন্। তার আয়ত্ত চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। পিতার মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর ম্লান কণ্ঠে বললে, সে কথা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, বাবা।

তবে তুই কী করতে চাস্? অন্য কোন—

না, বাবা, আমার সাদীর প্রয়োজন নেই। এই তো বেশ আছি, মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই যে সাদী করতেই হবে তেমন কি কোন কথা আছে? বাদশাহ শাজাহানের বেটী জাহানারাও তো সাদী করে নি। বাদশাহের কাছে থেকে তাঁর পরিচর্যায় জীবন কাটিয়ে দিলে। আমিও না হয় তেমনি তোমার কাছেই রইলাম। সাদীর প্রয়োজন কি?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন মুর্শিদকুলী খাঁ, তোর প্রয়োজন না

থাকতে পারে, তবে আমার প্রয়োজন আছে, সাদী করতেই হবে তোকে।

তোমার প্রয়োজন!

হ্যাঁ, আমার প্রয়োজন। অস্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে বলতে থাকেন নবাব, এতদিন তোর খামখেয়ালী বরদাস্ত করে এসেছি, কিন্তু আর নয়। সাদী তোকে করতেই হবে, আর তা' করতে হবে ঐ মহম্মদ জানকেই।

মহম্মদ জানকে? কম্পিত কণ্ঠে বললে আজিমূন্।

হ্যাঁ, ঐ মহম্মদ জানকে। তাকেই আমি তোর উপযুক্ত বলে মনে করি।

আজিমুনও নবাবের মেয়ে। নবাবী রক্ত তার ধমনীতেও বইছে। পিতার দৃঢ়তায় তার মনটাও যেন অকস্মাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে হয়ঃ যদি তোমার কথামত না চলি তবে তুমি কেবল শাস্তিই দিতে পারো আমাকে। বেশ শাস্তিই দাও, তবুও একমাত্র রঘুনন্দন ছাড়া আর কাউকে আমি সাদী করতে পারবো না, কিছুতেই না।

কিন্তু বলার সময় অন্য কথা বললে আজিমুন্। বললে, এটা কি তোমার আদেশ বাবা?

হ্যাঁ, আমার আদেশ। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশ। বলেই তিনি তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

প্রচণ্ড অভিমানে মুখখানা থম্‌থমে হয়ে ওঠে আজিমুনের। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে। পিতার কথায় একটু আগে নরম হয়ে ওঠা মনটি আবার কঠিন হয়ে ওঠে মহম্মদ জানের উপর। লোকটা যেন দুষ্ট গ্রহের মত সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। ওর

হাত থেকে যেন কিছুতেই তার মুক্তি নেই। ওর কবল থেকে কিছুতেই যেন পরিত্রাণ নেই তার।

মাথা নীচু করে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে আজিমুন্। ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। তারপর একসময় মাথা তুলে পিতার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, তবে তাই হোক, বাবা। আমার মতামতের যখন কোন মূল্যই নেই তখন তোমার আদেশই পালিত হোক্। ঐ লোকটাকেই আমি সাদী করতে প্রস্তুত। বলেই আর একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ায় না আজিমুন্। দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে যায় নিজের শয়ন কক্ষের দিকে।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উঠে দাঁড়ান। কন্যার প্রতি নিজের এই রূঢ় আচরণে মনে মনে দুঃখিত হলেও ভাবতে থাকেন, সন্তানের অবাধ্যতায় মাঝে মাঝে পিতাকে একটু কঠিন হতে হয় বৈকি! এটাই নিয়ম, এটাই স্বাভাবিক। এমন দিন হয়ত আসবে যেদিন তার নিজের অবর্ত্তমানে বাংলার নতুন নবাব মহম্মদ জানের বেগম আজিমুন্নেশা তার পিতার এই রূঢ় আচরণের কথা চিন্তা করে মনে মনে বলবে, সেদিন তুমি সত্যিই আমার উপকার করেছিলে, বাবা। তোমার সেদিনের সেই রূঢ়তাই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে আমার জীবনে।

সেই দিনই অপরাহ্ণে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানকে এত্তেলা দিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

দীর্ঘ কুর্ণিশ করে মহম্মদ জান নবাবের সামনে এসে দাঁড়াতেই কোনরকম ভূমিকা না করেই নবাব বললেন, তোমাকেই আমি আমার জামাতা করবো বলে ঠিক্ করেছি,

মহম্মদ। তুমি প্রস্তুত হও। অল্পদিনের মধ্যেই আজিমুনকে তোমায় সাদী করতে হবে।

এমন একটা খবরের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না মহম্মদ জান। নবাবের কথায় মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে ওঠে মনটা। আজিমুনের প্রতি তার সেই আত্মবিস্মৃত প্রায় প্রেমের উপর বৈরাগ্যের যে ধূসর ছাই এতদিন একটু একটু করে জমা হচ্ছিল, একটা দম্‌কা হাওয়ায় সেই ছাই যেন সম্পূর্ণ উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রেমের দীপ্ত মরকত মণি। তার দিল্‌-বাগিচার বুলবুল যেন সোনালী ডানায় ভর করে ঘরে ফিরে এল আবার।

সেই মুহূর্তে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে ভিড় করে দাঁড়ায় তার সামনে। তবে কি রঘুনন্দনের সাথে নবাবজাদীর সেই মহব্বত একেবারেই ঝুটা? তা' কি কেবল নবাবজাদীর চোখের নেশা? নেশা কেটে যেতেই কি তবে নবাবজাদীর মনের আয়নায় ভেসে উঠ্‌লো মহম্মদ জানের মুখখানা?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা কথা মনে পড়তেই একটু ম্লান হয়ে ওঠে মহম্মদ জান। আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগে তার। সে কি তবে নবাবজাদীর খেলার পুতুল? যখন ইচ্ছে তাকে দূরে ঠেলে দেবে, আবার ইচ্ছে হলেই কাছে টানবে? নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়ে নবাবজাদীর খেয়াল খুশী মতই তাকে চলতে হবে নাকি?

কথাটা মনে হতেই পৌরুষে আঘাত লাগে মহম্মদ জানের। একটু আগে অকস্মাৎ উদ্বেল হয়ে ওঠা মনের লাগাম টেনে ধরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি জাঁহাপনা?

কী কথা, মহম্মদ? প্রশ্ন করেন নবাব।

নবাবজাদীর এই হঠাৎ মত পাল্টানোর কারণটা জানতে পারি কি?

গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দেন মুর্শিদকুলী খাঁ, আমার হুকুমেই সে মত পাল্টেছে। আমার আদেশ লঙ্ঘন করার স্পর্দ্ধা আজিমুনের নেই।

অকস্মাৎ মহম্মদ জানের তরবারির মত বাঁকানো ভ্রু-জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। ভাবান্তর হয় তার। নবাবজাদী তবে নিজে থেকে মত পাল্টায় নি? নবাবের হুকুম তাকে বাধ্য করেছে মত পাল্টাতে?

নিজের উপরই প্রচণ্ড রাগ হয় মহম্মদ জানের। এতক্ষণ তবে নিজের চিন্তায় মশগুল হয়েই সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল? আপন কল্পনাতেই পৌরুষে আঘাত লেগে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার? আসলে সেসব কিছুই নয়? তার প্রতি নবাবজাদীর মনোভাব তবে এতটুকু পাল্টায় নি? কেবল বাধ্য হয়েই নবাবজাদী তাকে সাদী করতে রাজি হয়েছে?

উচ্ছ্বাস কিংবা আবেগের পরিবর্তে এবার প্রচণ্ড অভিমানে মনটা পূর্ণ হয়ে ওঠে মহম্মদ জানের। সেই পুরান অভিমান। প্রতিদানহীন ভালবাসার ক্ষোভ, প্রেমাস্পদের কাছ থেকে অবহেলার সেই চরম লজ্জা। তাচ্ছিল্যের গ্লানি।

মুহূর্তে মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে মহম্মদ জানের। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন, জাঁহাপনা। আমার অশেষ ভাগ্য যে আপনি আমাকে স্নেহ করেন। আপনি নববাজাদীকে আমার হাতে দিতে চেয়ে আমাকে কল্পনাতীত সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু আমি সত্যিই দুঃখিত, খোদাবন্দ্। নবাবজাদীকে গ্রহণ করতে আমি সত্যিই অক্ষম।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে মহম্মদ জান, আমি স্বীকার করছি, জাঁহাপনা, আমি সত্যিই বেওকুফ! আপনার মুল্লুকে এমন বেওকুফ আর হয়ত দ্বিতীয়টি নেই। রাজ্যের বড় বড় খান্-ই-খানান্‌রা আপনার প্রদত্ত যে সম্মানে নিজেদের ধন্য মনে করতো, আমি সামান্য কোতায়াল হয়ে সেই সম্মান গ্রহণ করতে পারছি না। এর চাইতে বড় বোকামী আর কী থাকতে পারে, জাঁহাপনা? কিন্তু তবুও বলছি, নবাবজাদীকে সাদী করতে আমি অক্ষম।

কেন, কীসের আপত্তি তোমার? প্রায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয় মহম্মদ জান, আপনার হুকুমে জান কবুল করতেও আমি রাজি, খোদাবন্দ্। কিন্তু নবাবজাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আমি সাদী করতে কিছুতেই পারবো না। যেখানে নবাবজাদীর নিজের ইচ্ছা অন্যরূপ, সেখানে কেবলমাত্র আপনার হুকুমমত তাঁকে সাদী করতে পারি না।

বজ্র-নির্ঘোষে নবাব বলে ওঠেন, আমি যদি তোমাকে হুকুম করি?

যদি হুকুম করেন তো আমি তা' তামিল করতে বাধ্য, জাঁহাপনা। কিন্তু তাতে কেবল হুকুম তামিল করাই হবে, সত্যিকারের সাদী হবে না।

কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, মহম্মদ, আজিমুনকে সাদী করার অর্থই হল ভবিষ্যতে বাংলার মস্‌নদ লাভ করা।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় মহম্মদ জান, এতে আর ভাবনাচিন্তার কিছু নেই, জাঁহাপনা। মস্‌নদের লোভে

গররাজি নবাবজাদীকে সাদী করতে পারবো না। আপনি আমাকে মাফ করুন, খোদাবন্দ্।

কথা বলতে বলতে চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে মহম্মদ জানের। কী করে সে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে বোঝাবে যে সে নিরুপায় ? কী করে সে নিজের মুখে তাঁকে বলবে, আপনার কন্যার প্রেমে আমি আত্মহারা, জাঁহাপনা। জীবনে ঐ একটিমাত্র নারীকেই আমি ভালোবেসেছি। সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছি তাকে। কিন্তু তার বদলে তার কাছ থেকে পেয়েছি কেবল অহেতুক তাচ্ছিল্য। তাই আমি পারি না তাকে সাদী করতে। এতবড় অপমান সহ্য করেও যে পুরুষ কেবল মাত্র মস্নদের লোভেই সাদী করতে প্রস্তুত, আমি সে দলে নই, জাঁহাপনা।

স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর একসময় বলে ওঠেন, এই কি তোমার শেষ জবাব, মহম্মদ ?

হ্যাঁ, জাঁহাপনা। এই আমার শেষ জবাব।

বেশ, তা'হলে তুমি এবার যেতে পারো। কেমন যেন এক রিক্ততার সুর ধ্বনিত হয় নবাবের কণ্ঠে। মুখে চোখে একটা অসহায়তার ভাব ফুটে ওঠে।

দীর্ঘ কুর্ণিশে নবাবকে সম্মান জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান। তারপর উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাজপথ ধরে চলতে থাকে। ভুলে যায়, সে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। ভুলে যায়, ঘোড়ার সহিস এখনও তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

অনেকদিন পরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন

মিনারে আরোহণ করেন। মাথার উপর পরিষ্কার নীল আকাশে অসীমের হাতছানি। আর সামনেই স্রোতস্বিনী ভাগীরথী খল্-খল্ ছল্-ছল্ শব্দে বয়ে চলেছে। পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্য বিদায় নেবার আগে রাঙিয়ে দিয়েছে গোটা আকাশটাকে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ। বিদায় লগ্নে ঐ অস্তগামী সূর্যকে যেন বড়ই করুণ মনে হয়। সেই তেজ নেই, সেই দীপ্তি নেই, কিন্তু তবুও কত অপরূপ! বিদায় নেবার সময় সে তার রূপের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে যেন।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার পূব দিকে দৃষ্টিপাত করেন মুর্শিদকুলী খাঁ। সেদিকে কিন্তু অস্তগামী সূর্যের লাল আভা পৌঁছোয় নি। পৌঁছোবেও না কোনদিন। ঐ পূবদিকের সঙ্গে সূর্যোদয়েরই কেবল সম্বন্ধ। সূর্যাস্তের কোনই সম্পর্ক নেই। পূব করে আবাহন, আর পশ্চিম দেয় বিসর্জন।

হিন্দুরা ভাগীরথীর জলে দাঁড়িয়ে উদিত সূর্যকে প্রণাম করে। রঘুনন্দনও হিন্দু। সেও হয়ত তাই করে। আর মুসলমানেরা পশ্চিমের মক্কাশরীফের দিকে তাকিয়ে বিদায় দেয় অস্তগামী সূর্যকে। আজান্ দেয় মগ্‌রিব নামাজের। মহম্মদ জানও হয়ত নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত্ নামাজ পড়ে। এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মধ্যে রয়েছে একটি রাতের ব্যবধান।

হঠাৎ তাঁর আজিমুনের মুখখানা মনে পড়ে। আজিমুন্ বলেছিল, সে থাকতে চায় তাঁর কাছে। থাকতে চায় চির-কুমারী হয়ে। সাদীর নাকি তার প্রয়োজন নেই। বাদশাহ শাজাহানের কন্যা জাহানারা যেমন সারাজীবন স্থিরচিত্তে পিতার সেবা করে গিয়েছিল, তেমনি ভাবেই থাকতে চায় তাঁর কন্যা আজিমুন্নেশা।

তাই হোক্। আজিমুন্ তাঁর কাছেই থাক্। সুখে থাক, শান্তিতে থাক। খোদাতালার কাছে একমাত্র সেই প্রার্থনাই জানান বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

নয়

বাংলার প্রতাপান্বিত নবাব মুর্শিদকুলা খাঁ।

যেমনি কঠোর প্রকৃতির, তেমনি আবার কর্ত্তব্যপরায়ণ। সেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-ই কিন্তু নিজের কন্যাকে স্বমতে আনতে পারলেন না। পারলেন না নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান কিম্বা রাজ্যের মূখ্য খাজাঞ্চি রঘুনন্দনকে নিজের শর্তমত নবাবজীকে সাদী করতে রাজি করতে।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের মনেই তিনি বললেন, বেটী তবে আমার কাছেই থাক। সাদীর প্রয়োজন নেই। আমার অবর্ত্তমানে বাংলার মস্‌নদ্‌ নিয়ে যা হবার হোক্‌। শাহানশা শাহজাহানের কন্যা জাহানারার মত আজিমুন্‌ও আমার কাছেই থাক্‌ চিরকুমারী হয়ে। ওর ইচ্ছায় বাধা দেব না আমি। কিন্তু বাংলার মস্‌নদে একজন হিন্দুর অধিকার কায়েম করে দিয়ে গোটা মুসলমান জাতের সঙ্গে কিছুতেই বেইমানী করতে পারবো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আকাশে ফুটে ওঠে একটা দু'টো করে তারা। আলে জ্বলে ওঠে রাজধানীর নাগরিকদের ঘরে ঘরে। আবছা অন্ধকারে দূরে দেখা যায় নিজামত কেল্লা। তার সুউচ্চ মিনারগুলো আসলে কিন্তু মিনার নয় মোটেই। সদাসতর্ক প্রহরীরা ওখান থেকেই তীক্ষ্ণ-

দৃষ্টি রাখে চারিদিকে। বিষ্ণুপুরের ওস্তাদ কারিগরের তৈরি বিশালাকার কামানগুলো শত্রুর অপেক্ষায় ওৎপেতে বসে রয়েছে কেল্লার এখানে ওখানে।

প্রাসাদের গবাক্ষপথে দেখা যায় কক্ষের অভ্যন্তরস্থ আলোর রোশ্‌নাই। বাইরের অন্ধকারে গাছপালা আকাশ মাটি যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। স্রোতস্বিনী ভাগীরথীকেও আর স্পষ্ট দেখা যায় না। কেবল জলের তরঙ্গাঘাতে হেলতে দুলতে থাকে ভাগীরথীর বুকে নোঙর করা দেশী বিদেশী বাণিজ্য-পোতের আলোগুলো। উঁচু মিনার থেকে নীচে নেমে আসেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

পার্শ্বচরটি বোধহয় এতক্ষণ তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। নবাব নিজের কক্ষে প্রবেশ করতেই পার্শ্বচরটি এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললে, একটা খারাপ খবর আছে, জাঁহাপনা।

খারাপ খবর? কী খারাপ খবর? দিল্লীর বাদশা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলেন নাকি তাঁর উপর? দিল্লীর পথে পাঠানো শকট বোঝাই শাহী-খাজনা লুঠে নিলে নাকি ডাকাতের দল? রাজ্যে কেউ বিদ্রোহ করলো নাকি?

মুর্শিদকুলী খাঁ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পার্শ্বচরটির দিকে তাকাতেই সে বললে, নবাবজাদী—

কী হয়েছে নবাবজাদীর? শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি।

নববজাদী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, জনাব।

কখন?

এই তো, একটু আগে।

হেকিম সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জাঁহাপনা, হয়েছে। তবে এখনও এসে

পৌঁছোন নি। খবর পেয়েই বেগম সাহেবা চলে গেছেন নবাবজাদীর মহলে।

মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন মুর্শিদকুলী খাঁ। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে তাঁর মুখে। অকস্মাৎ চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে পার্শ্ব-চরটিকে বললেন, তুই খবর দে। আমি এখনই নবাবজাদীর মহলে যাচ্ছি।

নবাবজাদী-মহলের শয়নকক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়েছিল আজিমুন্‌। রাজহাঁসের পালকের মত সাদা ধবধবে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল সে। একপাশে লুটিয়ে পড়েছিল তার সোনালী জরির ফিতেয় বাঁধা সাপের মত লম্বা কালো চুলের বেণীটি। তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা থেকে থেকে যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠছিল। কন্যার শিয়রের কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল নসেরু বেগম। চোখ দুটো ছল্‌ ছল্‌ করছিল তার। আজিমুনের পায়ের কাছে বসে ম্লানমুখে পদসেবা করছিল তার একান্ত সহচরী রাবেয়া।

কক্ষের বাইরে দাসী বাঁদীদের সন্তর্পণ চলাফেরা, ফিস্‌ফিস কথাবার্ত্তা! চারিদিকে যেন এমটা অমঙ্গলের সংকেত। হারেমের বাইরে প্রাসাদ-কর্মচারীদের মধ্যে ছুটোছুটি। অশ্বারোহী রাজকর্মচারী ঘন ঘন ছুটছে নবাবের খাস হেকিম সাহেবের আস্তানায়। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে তিনি এখন ফেরেন নি। তাই তার সন্ধানে লোক ছুটছে চারিদিকে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কন্যার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়ায় নসেরু বেগম ও রাবেয়া।

নবাব কন্যার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকেন, আজিমুন্‌—আমার মা! অতিকষ্টে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় আজিমুন্‌।

কী কষ্ট হচ্ছে তোর মা? ব্যাথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন নবাব।

কথা বলার শক্তি নেই আজিমুনের। মসৃণ পেলব হাতের চাঁপাকলির মত আঙুল তুলে সে কেবল নিজের বুকটা দেখিয়ে দেয়। তারপরই আবার যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে চোখ বোজে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর নসেরু বেগমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হয়েছে?

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ধরা গলায় জবাব দেয় নসেরু।

নবাব এবার প্রশ্ন করেন রাবেয়াকে, নবাবজাদীর কী হয়েছে, বলতে পারো?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রাবেয়া বলতে থাকে, বিকেল পর্যন্ত তে কিছুই লক্ষ্য করিনি, জনাব। সকালে আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর থেকেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ছিলেন নবাবজাদী। এমনকি আমার সাথেও ভালমত কথা বলেন নি আজ সারাদিন। ভালমত খাননি পর্যন্ত। সন্ধ্যা হতেই হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন যে তাঁর বুকের মধ্যে নাকি কেমন করছে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেও নাকি কষ্ট হচ্ছে। এই বলেই তিনি শুয়ে পড়লেন। তারপর থেকেই তাঁর এই অবস্থা।

রাবেয়ার কথা শেষ হতেই দ্বাররক্ষী বাঁদী এসে জানায় যে হেকিম সাহেব এসেছেন। হোকিম সাহেবকে ভিতরে নিয়ে আসতে হুকুম দেন নবাব।

পাশের কক্ষে চলে যায় নসেরু বেগম। আর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে বৃদ্ধ হেকিম সাহেব।

হেকিম সাহেবের পরনে সাদা আলখাল্লা। মাথায় জরিদার পাগড়ির একাংশ ঝুলে পড়ছে কাঁধের পাশে। পায়ে জরিদার

নাগরা। চোখের কোণে সুর্মার রেখা। মেহেদী রং মাখানো দাড়ি। রোমশ সাদা ভুরুতেও মেহেদী রংয়ের ছোপ। পাগড়ির নিচে কানের কাছে গোটাকয়েক বিচিত্র আকারের ছোট বড় ধাতুনির্মিত শলাকা। হাতে কারুকার্য-খচিত মাঝারি আকৃতির একটি চামড়ার পেটিকা।

কক্ষে প্রবেশ করেই বৃদ্ধ হেকিম সাহেব নবাবকে দীর্ঘ কুর্নিশ করে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, গোস্তাকি মাফ হয়, জাঁহাপনা। আস্তানায় ছিলাম না, তাই জাঁহাপনার তলবমত ঠিক্ সময় আসতে পারিনি।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কিন্তু তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, আপনি ওকে আগে পরীক্ষা করুন, হেকিম সাহেব। তারপর বলুন কেন ওর হঠাৎ এমন অবস্থা হল। কালক্ষেপ করেন না হেকিম সাহেব। চাম্ড়ার পেটিকা খুলে বিভিন্ন আকৃতির চর্ম ও ধাতু নির্মিত বস্তু বের করে এনে তা' দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন নবাবজাদী আজিমুনকে। দেখতে দেখতে মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে তাঁর।

প্রশ্ন করেন নবাব, কিছু বুঝতে পারলেন ?

মাথা নেড়ে সায় দেন হেকিম সাহেব। তারপর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, খুবই শক্ত অসুখ, জাঁহাপনা। নবাবজাদীর কলিজার দোষ হয়েছে। খুবই দুর্বল কলিজা।

কেন ? হঠাৎ ওর এমন কঠিন অসুখ হল কেন, হেকিম সাহেব ? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর নবাবের।

হেকিম সাহেব বিনীত কণ্ঠে জবাব দেন, দেখুন জাঁহাপনা, মানুষের অসুখের কারণ সবসময় নির্ণয় করা খুবই শক্ত ব্যাপার। মনে হয়, নবাবজাদীর কালিজায় বরাবরই কিছু দোষ ছিল। আজ হয়ত হঠাৎ এমন কিছু ঘটেছে, এই ধরুন,

কোনরকম মানসিক আঘাত কিংবা কোন সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা। যার জন্যে এটা আরও বেড়ে উঠেছে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুখখানা অকস্মাৎ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। আজ সকালে আজিমুনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা মনে পড়ে যায়।

প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ, এবার তা'হলে ভালো দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করুন, হেকিম সাহেব।

হ্যাঁ, জাঁহাপনা করছি। তবে—।

কী, চুপ করলেন কেন? বলুন, কী বলতে চান?

হেকিম সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন, দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা তো করেছি। চেষ্টারও কোনই ত্রুটি হবে না আমার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জাঁহাপনা, আমাদের শাস্ত্রে এই অসুখের তেমন কোন ভালো দাওয়াই নেই।

সেকি, এ অসুখের দাওয়াই নেই?

না, জাঁহাপনা। এই অসুখের তেমন কোন ভালো দাওয়াই নেই। মানুষের কমজোরি কলিজাকে খানিকটা মদত দিতে পারে, সাময়িকভাবে সেই কলিজাকে তেজী করে তুলতে পারে, এমন দাওয়াই থাকলেও দুর্বল কলিজাকে পুরোপুরি ভালো করতে পারে, এমন দাওয়াই সত্যিই নেই আমাদের শাস্ত্রে।

তবে উপায়? উৎকণ্ঠায় কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে মুর্শিদকুলী খাঁর।

আপনি একেবারে নিরাশ হবেন না জাঁহাপনা। বলতে থাকেন বৃদ্ধ হেকিম সাহেব, নবাবজাদীকে আমি যে দাওয়াই দেব তাতে আশা করছি তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বরাত ভালো থাকলে, নবাবজাদী পুরোপুরি

ভালো হয়ে উঠ্তেও পারেন। এখন খুদাতালার মর্জি আর নবাবজাদীর নসীব।

গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

বৃদ্ধ হেকিম তাঁর কারুকার্যখচিত চামড়ার পেটিকা থেকে বের করেন রকমারি দাওয়াই। বিচিত্র তাদের বর্ণ, বিভিন্ন তাদের গন্ধ। তারপর রাবেয়াকে ডেকে দাওয়াই খাওয়াবার নিয়মকানুন তাকে বুঝিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, চিন্তিত হবেন না, জাঁহাপনা। সব দাওয়াইয়ের শ্রেষ্ঠ দাওয়াই খুদাতালার দোয়া। আমার বিশ্বাস নবাবজাদী ভালো হয়ে উঠ্বেন।

বৃদ্ধ হেকিম সাহেব কুনিশ করে চলে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ কন্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর একসময় চিন্তিত মুখে ফিরে চলেন নিজের মহলের দিকে। একটা শঙ্কামিশ্রিত দুর্ভাবনায় মনটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাঁর স্নেহের দুলালী আজিমুনের এই কঠিন অসুখের জন্যে হয়ত মনে মনে নিজেকেই দায়ী করেন তিনি। একটু যেন অনুতপ্তও হন। আজ সকালে তিনি আজিমুনের উপর এতটা কঠোর না হলেও পারতেন। তিনি যদি নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের সঙ্গে তার সাদীর ব্যাপারে জেদ না করতেন, তবে হয়ত আজিমুন্ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ত না। অসুখ নিশ্চয়ই খুব কঠিন। বৃদ্ধ হেকিম নিজের মুখে সেকথা বলে গেলেন। খাস নবাব-দরবারের হেকিম তিনি। এই মুল্লুকের শ্রেষ্ঠ হেকিমদের অন্যতম। এই ব্যক্তিটির সবচাইতে বড় গুণ তিনি রেখে ঢেকে কথা কইতে জানেন না। অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে তিনি খোদ্ নবাবের মনমত কথাও বলেন না। যা সত্যি তা স্পষ্টই বলে দেন। সেই হেকিম সাহেব যখন

স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন, এই অসুখের কোন ভালো দাওয়াই নেই, তখন আর উপায় কী? ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তিনি। এবার বাকি সন্তানটিও নিজের অবিবেচনায় মৃত্যুপথযাত্রী। আল্লাহ্ তালার কী ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন।

মহলে ফিরে এসে গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। একটা নিদারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন তিনি।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কিন্তু আজিমুনের অবস্থার কোন উন্নতি-ই হয় না। দাওয়াই চলতে থাকে নিয়মিত, কিন্তু দিন দিন যেন আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে আজিমুন্। চিন্তা ভাবনায় আহার নিদ্রা ভুলে যান মুর্শিদকুলী খাঁ। নবাব দরবারের সেই বৃদ্ধ হেকিম সাহেবের উপর আর যেন ভরসা রাখতে পারেন না। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হলেও তিনিও তো মানুষ। ভুল ভ্রান্তি তাঁরও তো হতে পারে।

তাই একে একে রাজধানীর অন্য হেকিমদেরও ডাক পড়ে নবাবের হারেমে। হিন্দু কবিরাজও বাদ পড়ে না। কিন্তু সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এ অসুখের তেমন কোন ভালো দাওয়াই নেই। তাই, তারা কেউই নবাজাদীর চিকিৎসার ভার নিতে রাজি হয় না। এমনকি নবাব দরবারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রচুর ধনসম্পত্তির লোভেও নয়। সোজা কথা তো নয়! খোদ্ নবাবজাদীর চিকিৎসা। ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে নবাব কি আর রক্ষা রাখবেন! যেচে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরাগভাজন হতে কেউই পছন্দ করে না।

অবশেষে খবর যায় পাটনার একজন বিখ্যাত কবিরাজের

কাছে। সেখানে নাকি খুব নামডাক তাঁর। লোকে নাকি তাঁকে ধন্বন্তরী বলে জানে।

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আহ্বানে সেই কবিরাজ জলপথে নৌকা করে এসে হাজির হন মুর্শিদাবাদে।

নবাবজাদী আজিমুন্‌কে ভালোমত পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, অসুখটা সত্যিই খুব শক্ত। তবে ভরসা রাখি নবাবজাদীকে কিছুটা হয়ত সারিয়ে তুলতে পারবো।

পারবেন—পারবেন আপনি আমার আজিমুন্‌কে সারিয়ে তুলতে? আগ্রহাতিশয্যে নিজের মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে কবিরাজের হাতটা জড়িয়ে ধরেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

নবাবকে আশ্বাস দিয়ে কবিরাজ বললেন, আমাকে আরও কিছুদিন আগে খবর দিলে হয়ত নবাবজাদীর অবস্থার এতটা অবনতি হত না। একটু দেরী হয়ে গেছে। তবে একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমি যখন আপনার কন্যার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছি, তখন আপনার কন্যার অবস্থা এর চেয়ে কিছুতেই আর খারাপ হবে না। প্রথমে আপনার কন্যার এই খারাপ অবস্থার গতি রোধ করতে হবে, তারপর উন্নতির চেষ্টা করা। দ্বিতীয়টিতে কতদূর সাফল্য লাভ করবো বলতে পারি না, কারণ এ রোগের তেমন কোন ভালো ওষুধ আমাদের শাস্ত্রে নেই। তবে প্রথমটিতে সফল হতে পারবো বলেই মনে করি।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর তখন অগাধ সমুদ্রে খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার মত অবস্থা। দিন দিন মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে আজিমুন্। তাই তিনি বললেন, আপনি তাই করুন কবিরাজ মশাই। মা আমার বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। ওর দিকে যে তাকাতেই পারি না আমি।

সত্যিই তাই। সারাদিনরাত আচ্ছন্নের মত শয্যায় শুয়ে থাকে আজিমুন্। বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ না পেলেও কখনও পুরো জ্ঞান থাকে না তার। থেকে থেকে বুকের ব্যাথায় তার গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুখানা নীল হয়ে ওঠে। হয়ত একটু কাতর শব্দ করে মুখে। পরক্ষণেই আবার নিঃশব্দে ঝিমিয়ে পড়ে। এমনিভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

সারাক্ষণ নবাবজাদীর পরিচর্যায় রত তার একান্ত অনুগত সহচরী রাবেয়া। সকাল সন্ধ্যা নসেরু বেগম এসে কন্যার শিয়রে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় আর অশ্রু বিসর্জন করে। নবাব নিজে প্রতিদিন একবার করে এসে দেখে যান কন্যাকে।

বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে আজিমুন্। রক্তহীন আজিমুনের দেহের দুধে-আলতা রংয়ে যেন দুধের ভাগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। শুকিয়ে গিয়েছে তার ঢলঢলে মুখখানা। তার পেলব হাতের চাঁপাকলির মত আঙ্গুলের মসৃণতা অন্তর্হিত হয়ে ক্রমেই যেন সেগুলো হাড়-সর্বস্ব হয়ে উঠ্‌ছে। কেবল ঠিক আছে তার ডাগর চোখ দুটোর সেই চাউনি। মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখ মেলে করুণ দৃষ্টিতে তাকায় আজিমুন্। তার সেই হরিণচকিত দৃষ্টির চকিত ভাবটুকু অদৃশ্য হয়ে গিয়ে করুণ ভাবটুকু যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে। পরক্ষণেই আবার ক্লান্তিতে বুজে আসে চোখজোড়া।

অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটে মুর্শিদকুলী খাঁর। পুরোপুরি মন দিতে পারেন না রাজকার্যে। চেহেল সেতুনে দরবার কক্ষে বসে সময় সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন তিনি। প্রজাদের কোন আর্জি শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। হাতের

গোলাপের কুঁড়িটি নিচে গড়িয়ে পড়ে যায়। পরমুহূর্তে হয়ত চমকে ফিরে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে ওঠেন। মন দিয়ে আবার শুনতে চেষ্টা করেন আর্জির বিষয়বস্তু।

অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটে রাজ্যের খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ রঘুনন্দনেরও। কড়া ক্রান্তির হিসাবে মাঝে মাঝে ভুল হয় তার। রাজ্যের অর্থনীতির ছক্ তৈরি করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে বসে। পরক্ষণেই আবার শুধরে নেয় সেই ভুল। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়ে।

খোদ্ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনের হিসেবের মধ্যে একটা ভুল বের করে একদিন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, কেন তোমার আজকাল এমন সাধারণ ভুল হচ্ছে রঘুনন্দন? রাজকার্যে এমন ভুলের ফল যে মারাত্মক হয়ে উঠ্তে পারে তা' তো তোমার অজানা নয়।

নবাবের কথায় সেদিন রঘুনন্দনের ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে মনে সেদিন সে বলেছিল, হায় রে! এক অন্ধ আর এক অন্ধকে না দেখতে পাবার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করছে!

রঘুনন্দন শুধু জবাব দিয়েছিল, আমাকে মার্জনা করুন, জাঁহাপনা। এমন ভুল আমার আর কখনও হবে না।

মুর্শিদকুলী খাঁ খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন সেদিন। তারপর ফিরে গিয়েছিলেন অন্য প্রসঙ্গে।

দিনের শেষে কর্মক্লান্ত রঘুনন্দন গৃহে ফেরার পথে প্রতিদিন হারেমের দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। দাসী বাঁদীদের কাছে নবাবজাদীর অবস্থার খবর নিতে চেষ্টা করে। প্রতিদিনই কিছু ভাল খবর আশা করে তাদের কাছে। আর প্রতিদিনই

নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় তাকে। কোন সুখবর দিতে পারে না তারা। পারে না কোন আশার বাণী শোনাতে। একটু একটু করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে নবাবজাদী আজিমুন্! রাজ্যের কোন হেকিম, কবিরাজই পারছে না সেই পথ রোধ করতে। মারাত্মক রোগের কাছে তাদের জ্ঞান, বিদ্যা সম্পূর্ণ পরাস্ত।

গৃহে ফিরে এসেও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় না রঘুনন্দন। গ্রন্থ পাঠের মধ্যে এতটুকু মন বসে না। ভাগীরথীর তীর ধরে ঘোড়ায় চড়ে একা একা বেড়াতেও আর ভালো লাগে না। কেবল নিদ্রাহীন রাতের শেষে ভাগীরথীর জলে প্রাতঃস্নান করতে এখনও তার ভালো লাগে। কাঁধ সমান জলে দাঁড়িয়ে উদিত সূর্যকে প্রণাম করতে করতে সূর্যদেবতাকে মনের আকুল প্রার্থনা জানায় রঘুনন্দন। নবাবজাদী আজিমুনের রোগমুক্তির প্রার্থনা করে সেই সর্বরোগহর সূর্যদেবতার কাছে। তারপর এক সময় ভিজে কাপড়ে স্তোত্র পাঠ করতে করতে গৃহে ফিরে আসে।

অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটে আরও একজনের। সে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান। নাগরিকদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তার স্কন্ধে। কিন্তু সময় সময় সেই গুরুদায়িত্বের কথাও যেন ভুলে যায় সে। জীবনে একমাত্র যে নারীকে ভালবেসে প্রতিদানে এককণা ভালবাসাও আদায় করতে পারে নি, সেই নবাবজাদী আজিমুনের অসুস্থতা তার কর্মক্ষমতাকে যেন একটু একটু করে কেড়ে নিতে থাকে। কাজে উৎসাহ নেই। রাতে ঘুম নেই। রাজকার্যে মন নেই। একটা অসহ্য উৎকণ্ঠা সর্বদা পাষাণভার হয়ে চেপে রয়েছে তার বুকের উপর। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে

মহম্মদ জান, কেন—কেন আমার মনের এই দুর্বলতা? নবাবজাদী আজিমুন্ আমার কে? একদিন ভুল করে ভালবেসেছিলাম তাকে। কিন্তু আজ আর তার সাথে আমার কোন সম্বন্ধই নেই। সে মুছে গেছে আমার জীবন থেকে। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। আমার হৃদয়রাজ্যে তার কোন স্থানই নেই আর।

কিন্তু অস্বীকার করতে চাইলেই সব সময় অস্বীকার করা যায় না। ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় না সহজে। কোতোয়াল মহম্মদ জান আজিমুন্‌কে যতই ভুলতে চায় ততই আজিমুনের স্মৃতি আরও জোরে চেপে বসে তার হৃদয় রাজ্যে। আজিমুনের অসুস্থতা বিচলিত করে তাকে। তার আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা নেই—এমনি একটা খবর উদ্‌ভ্রান্ত-বিহ্বল করে তোলে মহম্মদ জানকে। মনে হয় যেন আজিমুনের বদলে সে নিজেই সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুস্থ হয়ে উঠ্‌বার কোন সম্ভাবনাই আর তার নেই! তাই বেঁচে উঠবার দুর্নিবার তাগিদে হেকিম কবিরাজের উপর অহেতুক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মহম্মদ জান। ওরা কেবল বিদ্যার বড়াই করতে জানে। আসলে কঠিন রোগের সাথে যুঝতে ওরা একেবারেই অক্ষম। তাই ওরা নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে চেষ্টা করে ওষুধের দোহাই পেড়ে। বলে, এই কঠিন অসুখের নাকি তেমন কোন ভালো ওষুধই নেই। তাই কি হতে পারে কখনো? হেকিমী কিংবা কবিরাজী শাস্ত্রে কোন বিশেষ রোগের ওষুধ নেই—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। আসলে ওরা জানে না, নিজেদের শাস্ত্রে ওরা নিজেরাই দারুণ অজ্ঞ।

এক এক সময় মহম্মদ জানের মনে হয়, তার নিজের হাতে ক্ষমতা থাকলে এই অজ্ঞ হেকিম করিাজদের সে কঠিন

শাস্তি দিত। নিজেদের শাস্ত্রে যাদের দখল নেই, তারা রোগীর চিকিৎসার ভার হাতে নেয় কোন অধিকারে? মানুষের কলিজায় সাধারণ দোষত্রুটি ধরা পড়লে যারা প্রকৃত ওষুধের ব্যবস্থা করতে জানে না, তারা চিকিৎসক নামেরই অযোগ্য। মুখের কথা দিয়ে তো আর চিকিৎসক যাচাই হয় না। হয় তাদের রোগীকে আরোগ্য করে তুলবার ক্ষমতায়।

মহম্মদ জান জানতো না যে নবাবজাদী আজিমুনের দোষ-ত্রুটি মোটেই সাধারণ নয়। আর ঐ রোগ সচরাচর মানুষের হয়ও না। যাদের হয়, তারা বাঁচে না। যে রোগের সত্যিই কোন ওষুধ নেই, হেকিম কবিরাজের সাধ্য কি তেমন রোগীকে বাঁচায়?

কিন্তু নবাবজাদীর অসুস্থতায় দিশেহারা মহম্মদ জান বুঝেও বুঝতে চায় না সেকথা। গোটা রাজ্যের হেকিম কবিরাজদের উপরই বিতৃষ্ণা জন্মে তার।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে কিন্তু একেবারেই মিথ্যে আশ্বাস দেননি পাটনার সেই বিখ্যাত কবিরাজ। তাঁর চিকিৎসায় নবাবজাদী সুস্থ হয়ে না উঠ্‌লেও, তার অবস্থার কিন্তু অবনতি হয় না আর। পাটনার সেই কবিরাজ রোগীকে নিরাময় করতে না পারলেও রোগের বিস্তৃতি সত্যিই রোধ করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশি একটি পাও এগোতে পারেন নি তিনি। আজিমুনের রোগের উপশম হল না কিছুই। দীর্ঘ তিন মাস ধরে চিকিৎসা করেও তেমন কোন ফল পাওয়া গেল না।

রঘুনন্দনের মত মহম্মদ জান কিন্তু হারেমের দেউড়িতে গিয়ে আজিমুনের খবর জোগাড় করে না। হারেমের দাসী বাঁদীদের মধ্যে যারা তার অনুগত তারাই নিয়মিত খবর পাঠায়

তাকে। তাছাড়া মহম্মদ জান মাঝে মাঝে রাজধানীর হেকিম কবিরাজদের কাছেও যাতায়াত করে আজিমুনের অবস্থার প্রকৃত খবর নিতে। তারা কিন্তু সবাই একবাক্যে সেই পুরোণ কথাই পুনরাবৃত্তি করে—এই রোগের তেমন কোন ভালো ওষুধই নেই। থাকলে এতদিনে আজিমুন্ সেরে উঠ্তো।

স্থানীয় হেকিম কবিরাজের দল নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের এই উৎকণ্ঠায় মনে মনে হাসে। নবাবজাদীর সঙ্গে তার অতীত এবং বর্ত্তমান সম্পর্কের কথা তাদের অজানা নয়। শুধু তারা কেন, রাজধানীর প্রায় সকলেই এ কথা জানে। আর জানে বলেই নবাবজাদীর জন্যে তার এই উৎকণ্ঠায় মনে মনে হাসে। অবশ্য মুখে সে কথা প্রকাশ করবার সাহস নেই তাদের। স্বয়ং নগর কোতোয়ালের বিরাগ-ভাজন হতে চায় না কেউ।

আজিমুনের জন্যে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও চিন্তিত। তার এই খুবসুরত্ বেটীর আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য পাটনার কবিরাজ আশ্বাস দিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, নবাবজাদীর জীবনের কোন আশংকা আর নেই। আর সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় একটা দুঃসংবাদও দিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, সারাজীবনটা নাকি আজিমুন্‌কে এমনি-ভাবেই কাটাতে হবে। চেতনা ও অর্দ্ধচেতনার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে তাকে।

চিন্তায় কোন ফল হবে না জেনেও চিন্তিত মুর্শিদকুলী খাঁ। দুর্ভাবনায় কেবল নিজের দেহমন খারাপ হবে জেনেও দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পান না। আজিমুনের যন্ত্রনাকাতর মুখের পানে তাকিয়ে পয়গম্বর রসুলকে স্মরণ করেন তিনি। মুঘল

বাদশা বাবরের কাহিনী মনে পড়ে তাঁর। পুত্র হুমায়ুনকে বাঁচাতে বাদশা বাবর নাকি পুত্রের রোগ নিজের দেহে ধারণ করতে আল্লাহ্‌তালাকে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আর সত্যিই নাকি হুমায়ুন তাতে আরোগ্যলাভ করেছিলেন, আর বাদশা বাবর পুত্রের সেই রোগে আক্রান্ত হয়েই নাকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও যদি তেমনি প্রর্থনা করেন তবে কি আরোগ্যলাভ করবে আজিমুন্? তাঁর প্রার্থনা কি শুনতে পাবেন খুদাতালা? তাঁর নিজের জীবনের আর প্রয়োজন কী? তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন রাজ্যপাট উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে পারলেই তো তাঁর ছুটি।

একটা জীবনে তো কিছু কম করেন নি তিনি! দাক্ষিণাত্যের সেই মহম্মদ হাদি একটা রাজ্য গড়ে তুলেছেন। হ্যাঁ, গড়ে তুলেছেনই বলতে হয়। হিন্দুস্তানের এই মুল্লুকের ভার নিজের হাতে নেবার আগে এখানে কী ছিল? দেশটা অবশ্য ঠিকই ছিল, কিন্তু সেই দেশে না ছিল শৃংখলা, না ছিল শান্তি। দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেব তো এই মুল্লুকটাকে খরচের খাতায় রেখে দিয়েছিলেন। গোটা দেশে চোর ডাকাতের রাজত্ব। একটি পয়সা রাজস্ব আদায় নেই। কেবল রাজ্য-পরিচালনা করতে একটা বিরাট খরচের বোঝা। পৌত্র আজিমুশ্বান বিলাস ব্যসনে মত্ত। তাছাড়া রাজ্য শাসনের তেমন ক্ষমতাও ছিল না তাঁর।

তেমনি একটা মুল্লুকে শান্তি, শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। প্রতিবছর শাহী-খাজনার পরিমাণ বাড়াতে থাকেন তিনি। রাজ্যের প্রজাকুল আনন্দিত। স্বয়ং দিল্লির বাদশা ঔরঙ্গজেব চমৎকৃত।

এখন তবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে ভয়

কী তাঁর? আজিমুন্ থাকবে, আর থাকবে তাঁর ভবিষ্যৎ জামাতা—সে মহম্মদ জান্-ই হোক্, আর রঘুনন্দন-ই হোক্। এদের দু'জনের মধ্যে একজনকে তাঁর জামাতা হতেই হবে। দু'জনেই নবাব হবার উপযুক্ত। দু'জনেই কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তবে কেন তিনি বাদশা বাবরের মত আজিমুনের রোগ নিজের দেহে ধারণ করে তাকে রোগমুক্ত করতে খুদা-তালার কাছে প্রার্থনা জানাবেন না? কেন তিনি বলবেন না, হে ঈশ্বর, আজিমুন্‌কে সুস্থ করে তুলে তার রোগ আমার দেহে সংক্রামিত করো। আমি মরব, কিন্তু আজিমুন্ যেন বেঁচে থাকে। তার মনোভাবের যেন পরিবর্ত্তন হয়। সে যেন চিরকুমারী হয়ে থাকার বাসনা পরিত্যাগ করে ওদের দু'জনের একজনকে সাদী করে।

কিন্তু বাদশা বাবরের সঙ্গে কি তাঁর নিজের তুলনা চলে? বাবর ছিলেন সত্যিকারের ধার্মিক। খুদাতালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি নিজে তা পারছেন কই? আল্লাহ্‌তালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্বিকার চিত্তে নিজের কর্তব্য করে যাবার মত মনের জোর তাঁর কোথায়?

দশ

বিপদ কখনও একা আসে না।

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁরও তখন ঘরে বাইরে সর্বত্রই বিপদ। অন্দরে একমাত্র কন্যা আজিমুন্‌কে নিয়ে নবাবের দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে। আর এমনি দিনেই কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেস্ একটা নতুন ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তুলল। অবশ্য ব্যাপারটা একেবারেই নতুন নয় মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে। কিছুদিন থেকেই তিনি টের পাচ্ছিলেন রবার্ট হেজেস্ তার সহকারী এডওয়ার্ড পেজ ও ষ্টক্‌হাউসের সাহায্যে নাকি গোপনে বিনাশুল্কে বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল দেশের মধ্যে। এমন একটা খবর শুনে চুপ করে বসে থাকার ব্যক্তি নন মুর্শিদকুলী খাঁ। কিন্তু প্রথমে নিজের পুত্র দিলজিৎ খাঁ এবং পরে কন্যা আজিমুনের ব্যাপারে চিন্তিত থাকায় তিনি ঐ বিষয়ে নজর দিতে পারেন নি। তাছাড়া তিনি জানতেন, দিল্লীর দরবারে হেজেস্ বেশ কিছুটা প্রতিপত্তি করে নিয়েছে। তাই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা মানেই দিল্লীর সঙ্গে কাজিয়া বাধানো।

অবশ্য তিনি তখন দিল্লির তোয়াক্কা করেন না। মাত্র দিল্লীর অধীন তিনি। আসলে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রায় স্বাধীন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত তিনি দিল্লীকে

সমীহ করে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বাহাদুর-শাহ্ যখন সম্রাট হলেন, তখন থেকেই মুর্শিদকুলী খাঁ দিল্লীর অধীনতা থেকে নিজেকে একটু একটু করে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রথম বাহাদুর শাহ্ বেশীদিন রাজত্ব করেন নি। তাঁর অবর্ত্তমানে দিল্লীর মস্‌নদ্ নিয়ে শুরু হল তাঁর চারপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

একে মুঘল সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম অবস্থা, তায় আবার মস্‌নদ্ নিয়ে কলহ। কাজেই রাজ্যের দিকে নজর নেই কারুর। সকলের নজরই কেবল ঐ মস্‌নদের দিকে। তামাম হিন্দুস্তানে তখন আত্মকলহের ঢেউ। হিংসা, অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রে ছেয়ে গেছে দেশটা।

বিহারের সুবেদারী ছেড়ে দিল্লীর মস্‌নদের লোভে প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র আজিমুশ্বানও গিয়ে হাজির হয়েছেন দিল্লীতে। তাঁর অন্য তিন ভ্রাতার মত তিনিও মস্‌নদের একজন প্রার্থী। দিল্লীর পথে পথে অলিতে গলিতে তখন সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ধোঁয়া। আজিমুশ্বানও মস্‌নদের লোভে গা ঢেলে দিলেন সেই অবস্থার মধ্যে।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না আজিমুশ্বান। অন্য তিন ভ্রাতাকে ডিঙ্গিয়ে দিল্লীর মস্‌নদ্ অধিকার করে বসলেন জাহান্দার শাহ্।

হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন আজিমুশ্বান। এতদিনে তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, এই দীর্ঘদিন বাংলায় ও পরে বিহারে সুবেদারী করে কেবল বিলাসব্যসনের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে রাজনীতির গূঢ় তত্বকথা আয়ত্ব করতে পারেন নি। বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, দিল্লীর

মস্‌নদ্ লাভ করতে হলে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন সেই বুদ্ধি সত্যিই তাঁর নেই। তাই বাদশা ঔরঙ্গজেবের পৌত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও ভাই জাহান্দার শাহ্ দিব্বি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে মস্‌নদ্ অধিকার করে বসতে পারলেন। নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিতে তাই বাধ্য হয়েছিলেন আজিমুশ্বান।

কিন্তু আজিমুশ্বান অদৃষ্টকে মেনে নিলেও তাঁর পুত্র ফারুক্‌শিয়ার কিন্তু নির্বিকার চিত্তে ব্যাপারটা মোটেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন পিতৃব্যের বিরুদ্ধে।

অবশেষে পিতৃব্য জাহান্দার শাহ্‌কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে দিল্লীর মস্‌নদে আরোহণ করলেন ফারুক্‌শিয়ার নিজে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ফারুক্‌শিয়ার নিজেও কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। পিতৃব্য জাহান্দার শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার ব্যাপারে ফারুক্‌শিয়ারকে যাঁরা মদত্ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন অন্যতম। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আসল নাম হুসেন আলি ও আবদুল্লা খাঁ।

দিল্লীর মস্‌নদে আরোহণ করে ফারুক্‌শিয়ার কিন্তু এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই পরিচালনা করতেন ফারুক্‌শিয়ারকে।

ব্যবস্থাটা তেমন মনঃপুত হল না ফারুক্‌শিয়ারের। তিনি তলে তলে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠ্‌তে পারেন।

হুসেন আলি ও আবদুল্লা খাঁ ব্যাপারটা টের পেয়েই কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে

তাঁরা সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের চোখদুটো উৎপাটন করে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে দিল্লীর মস্‌নদে বসালেন জাহান্দার শাহের পুত্র রোশন আখতারকে। এই রোশন আখতারই পরবর্ত্তীকালে মহম্মদ শাহ্‌ নাম নিয়ে বেশ কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন।

কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেস্‌ যখন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের ব্যাপারে একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তুলেছিলেন তখন দিল্লীর মস্‌নদে ছিলেন ফারুক্‌শিয়ার।

পিতৃব্য-হত্যাকারী এই হীনচেতা সম্রাটকে কোনদিনই তেমন পছন্দ করতেন না মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি জানতেন, দিল্লীর মস্‌নদে এই ফারুক্‌শিয়ার একটি পুতুল ছাড়া আর কিছুই নন। সেই ফারুক্‌শিয়ার যখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে রবার্ট হেজস্‌কে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার অবাধ অধিকার দিয়ে ফরমান্‌ জারী করলেন তখন একেবারে ক্ষেপে উঠলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

সেদিনটা ছিল জুম্মাবার—বিশেষ নামাজের দিন। নামাজ শেষে অশান্ত মনটাকে শান্ত করে চেহেল সেতুনে এসে বসেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। কন্যা আজিমুনের চিন্তায় মনটা ভারী হয়ে থাকলেও রাজকার্যে মন না দিয়ে উপায় নেই। দরবার কক্ষে রাজ্যের খান্‌-ই-খানান্‌ আর রাজপুরুষেরা যে যাঁর আসনে উপবিষ্ট।

ঠিক এমনি সময় অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেস্‌ তার সহকারী এডওয়ার্ড পেজ ও ষ্টক হাউসকে নিয়ে দরবার কক্ষে এসে হাজির হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভ্রু-কুঞ্চিত করে তাদের দিকে তাকাতেই

রবার্ট হেজেস্ ঘাড় নিচু করে ফিরিঙ্গী কায়দায় নবাবকে অভিবাদন করে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্যের সেই পুরোন বুলি আওড়াতে শুরু করে।

রবার্ট হেজেস্ নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানত না। তাই বরাবরের মত সহকারী স্টক হাউস সঙ্গে সঙ্গে দিশী ভাষায় অধ্যক্ষের কথার তর্জমা করতে শুরু করে দেয়।

ভ্রু-কুঞ্চিত নবাব খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনেন। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তাদের গোপন বাণিজ্যের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। কিন্তু দূরদর্শী নবাব সেকথা উচ্চারণ না করে গম্ভীর কণ্ঠে কেবল বললেন, আমি তো অনেকদিন আগেই আপনাদের এই আর্জি নামঞ্জুর করেছি। তবে আবার নতুন করে এই আর্জি কেন পেশ করছেন আপনারা?

একটু রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে রবার্ট হেজেসের ঠোঁটের কোণে। জবাব দেয় সে, হ্যাঁ আপনি অবশ্য তা করেছেন, তবে আমরা থেকে দিল্লীর দরবার থেকে শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের ফরমান্ পেয়েছি—।

দিল্লী থেকে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর মুর্শিদকুলী খাঁর!

হ্যাঁ, দিল্লী থেকে। সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার আমাদের ফরমান্ দান করেছেন।

কই সেই ফরমান্? বজ্র-নির্ঘোষে প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

রবার্ট হেজেস্ এবার একটু বিজয়ীর হাসি হেসে হাতের কাগজখানা এগিয়ে দেয় নবাবের দিকে।

কাগজখানার উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। সত্যিই তো! দিল্লীর ফরমান্-ই বটে! খোদ্

সম্রাটের মোহর অঙ্কিত ফরমান্। সম্রাট রবার্ট হেজেস্‌কে কোম্পানীর তরফে বাংলাদেশে শুল্কহীন অবাধ বানিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন।

ফরমানের বয়ান পড়তে পড়তে চাপা ক্রোধে মুখখানা লাল হয়ে ওঠে নবাবের। কাগজখানা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু নিজেকে সংযত করে বারে বারে ফরমানের বয়ান পাঠের সুযোগে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন। আর নবাবের মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসতে থাকে সেই তিনজন ফিরিঙ্গী বনিক।

ভাবতে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ—তিনি অনায়াসেই এই ফরমান্ অগ্রাহ্য করতে পারেন। সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না। সে ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু সেপথে তিনি যেতে চান না। শুধু শুধু দিল্লীর বিরাগভাজন হবার বাসনা তাঁর নেই। তার চাইতে কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে ঐ ফরমান্ অগ্রাহ্য করা অনেকটা শোভন হবে। তাতে দিল্লীর সম্মানও কিঞ্চিৎ থাকবে, আর তাঁর নিজের ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। কিন্তু কী কারণ দর্শাবেন তিনি?

মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করে সামান্য হাসির রেখা টেনে মুর্শিদকুলী খাঁ রবার্ট হেজেসের দিকে তাকিয়ে বললেন, দিল্লীর মহামান্য সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের ফরমানের উপর আমার আর কী বলার থাকতে পারে? বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার তো আপনারা পেয়েই গেছেন। আমি তো এখন কেবল একটা মামুলি আদেশ জারি করবো। কিন্তু আজ নয়। আগামী পরশু আপনারা এই দরবারে হাজির

থাকবেন। ঐদিনই আমি আপনাদের লিখিত আদেশ দেব।

মুর্শিদকুলী খাঁর কথায় দরবারের অন্যসকলে একটু চমকে ওঠে। নবাব তা'হলে বিনা প্রতিবাদে দিল্লীর এই অন্যায় আদেশ মাথা পেতে নেবেন? ঐ ফিরিঙ্গী বণিকেরা বাংলায় শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাবে?

রবার্ট হেজেস্ ও তার সহকারীরা কিন্তু নবাবের কথায় নিশ্চিন্ত বোধ করে। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় হেজেস্। তারপর ইংরেজ জাতির তরফে নবাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেহেল সেতুন ছেড়ে বেরিয়ে যায় তারা। এতদিনে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন তারা অনায়াসেই দেশী বণিকদের সাথে পাল্লা দিতে পারবে। আর কোন চিন্তা নেই।

ফিরিঙ্গী বণিকেরা চলে যেতেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুখ্য খাজাঞ্চি রঘুনন্দন। রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে কোম্পানীর এই শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই এমন একটা ব্যাপারে তার কিছু বলার থাকতে পারে বৈকি!

নবাবকে কুর্নিশ করে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে রঘুনন্দন বলে, জাঁহাপনা কি সত্যিই দিল্লীর এই অন্যায় আদেশ অনুমোদন করবেন?

মৃদু হেসে মুর্শিদকুলী খাঁ জবাব দেন, তা ছাড়া আর উপায় কী? খোদ্ দিল্লীর হুকুম অমান্য করে আপনারা কি আমাকে বদ্‌নাম কিনতে বলেন?

তেমনি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলতে থাকে রঘুনন্দন, এখানে সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন নেই, জাঁহাপনা। এটা একটা জাতির

জীবন মৃত্যুর সমস্যা। জাঁহাপনা কি একবারও ভেবে দেখেছেন ওদের শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিলে রাজকোষে জমার অঙ্কই কেবল কমবে না, দেশী বণিকদেরও ওরা একেবারে কোনঠাসা করে ফেলবে, আর তা' গোটা রাজ্যের অর্থনীতির উপর দারুন আঘাত হানবে?

কেমন যেন একটু উদাসীন কণ্ঠে জবাব দেন মুর্শিদকুলী খাঁ, তা আর কী করা যাবে? তাই বলে আমি তো আর দিল্লীর সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করতে পারি না।

নবাবের কথায় বিস্ময় বোধ করে রঘুনন্দন। এ কী ধরণের কথা মুর্শিদকুলী খাঁর কণ্ঠে? কোথায় তাঁর সেই তেজ? কোথায় তাঁর সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা? চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে সৈনিক আজ কেন অকস্মাৎ হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ভীরুর মত ছুটে পালাতে চাইছেন? তাঁর এতদিনের সেই হিম্মৎ কোথায়?

নবাবের জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে রঘুনন্দন আবার কিছু বলতে উদ্যত হতেই মুর্শিদকুলী খাঁ হাতের ইশারায় নিরস্ত করেন তাকে। তারপর, দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখের ভাব লক্ষ্য করেন। তাদের মুখে তখন রঘুনন্দনকে সমর্থনের স্পষ্ট চিহ্ন।

ধীরে ধীরে নবাবের ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ফুটে ওঠে। হাতের রক্তগোলাপটাকে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করেন। তারপর শান্ত সংযত কণ্ঠে রঘুনন্দনকে আবার বললেন, আজ রাতে মন্ত্রণা কক্ষে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই দরবার কক্ষের অন্যপাশে উপবিষ্ট নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তিনি।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে নবাবকে কুর্নিশ করে মহম্মদ জান।

পূর্বের কথার রেশ ধরে মুর্শিদকুলী খাঁ মহম্মদ জানকে বললেন, আর, তুমিও তখন উপস্থিত থাকবে মন্ত্রণা কক্ষে।

জো হুকুম, জাঁহাপনা। দীর্ঘ কুর্নিশ করে নিজের আসনে বসে পড়ে মহম্মদ জান।

প্রহরী বেষ্টিত সুসজ্জিত মন্ত্রণাকক্ষে মাত্র চারজন ব্যক্তি উপস্থিত!

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ছাড়া আর আছেন নবাবের বৃদ্ধ উজির, মুখ্য খাজাঞ্চি রঘুনন্দন ও নগর কোতায়াল মহম্মদ জান।

মুর্শিদকুলী খাঁ মহম্মদ জান ও রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের দু'জনকে একসাথে এখানে আসতে বলেছি বলে একটু অবাক হয়েছো, তাই না?

কোন জবাব না দিয়ে দু'জনই চুপ করে থাকে।

এবার কেবল রঘুনন্দনের দিকে ফিরে তাকান মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর বললেন, আমি কিন্তু অবাক হয়েছি তোমার কথা শুনে—।

আমার কথা? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রঘুনন্দনের।

হ্যাঁ, তোমার কথা। একমুহূর্ত থেমে নবাব আবার বলতে থাকেন, তুমি কি করে ধারণা করলে, সম্রাট ফারুকশিয়ারের এই অন্যায় আদেশ আমি মাথা পেতে নেব? তোমার কেন মনে হল, ঐ ফিরিঙ্গী বনিকগুলোর স্বার্থে দেশী বনিকদের আমি বানের জলে ভাসিয়ে দেব?

কোন জবার না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে রঘুনন্দন।

একটু হেসে নবাব আবার বললেন, না—না, এতে তোমার

লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই, রঘুনন্দন। রাজ্যের অর্থনীতির স্বার্থেই ঐ বিষয়ে আমাকে নিরস্ত করতে চেয়ে তুমি তোমার কর্ত্তব্যই করেছো। দেশী বণিকদের প্রতি তোমার ভালবাসাই এতে প্রমাণিত হয়েছে।

একটু থেমে মুর্শিদকুলী খাঁ পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধ উজীরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, আপনি এই দীর্ঘদিন ধরে গুপ্তচর মারফৎ যে খবর পেয়েছেন তা সত্য বলেই আপনি মনে করেন, উজীর সাহেব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জাঁহাপনা। জবাব দেন বৃদ্ধ উজীর।

মুর্শিদকুলী খাঁ আবার মহম্মদ জান ও রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, তোমরা কি জানো, কাশিমবাজার কুঠীর ঐ বিদেশী বণিকগুলো কিছুদিন ধরে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে গোপনে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে?

না, জাঁহাপনা, এ খবর তো আমি পাইনি। তা'ছাড়া নগরে নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করাই আমার কাজ। তাই, এই অর্থ সংক্রান্ত খবর—

কথাটা শেষ করতে পারে না মহম্মদ জান। তার আগেই বলে ওঠেন নবাব, হ্যাঁ তা' ঠিক্। এ খবর তোমার জানার কথা নয়।

কথা শেষ করে মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনের দিকে তাকাতেই রঘুনন্দন বলে ওঠে, আমিও ঠিক এ খবর পাই নি। তবে কিছুকাল ধরে কোম্পানীর দেয় শুল্কের পরিমাণ যে বেশ কমে যাচ্ছে সে খবর বোধহয় আমি জাঁহাপনার কাছে বলেছিলাম।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নবাব বললেন, হ্যাঁ, তা' বলেছিলে। আর সেই সূত্র ধরেই আমি উজীর সাহেবকে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে বলেছিলাম। উজীর সাহেবের

খাস্ গুপ্তচরেরা অনেকদিন ধরেই এই শুল্ক ফাঁকির খবর জোগাড় করেছিল। কিন্তু আমি এতদিন চুপ্ করেই ছিলাম। বলতে পারো, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সেই সুযোগ এসেছে।

কিন্তু, তা'হলে ওরা এত কাঠখড় পুড়িয়ে দিল্লীর দরবার থেকে ফরমান্ আনতে গেল কেন? প্রশ্ন করে মহম্মদ জান!

ওরা এই বে-আইনী ব্যাপারটাকে এখন আইনসম্মত করে তুলতে চেষ্টা করছে। ওরা আগেই জানতো, অপদার্থ সম্রাট ফারুক্শিয়ারের ফরমান্ ওরা পাবেই। তাই আগে থেকেই শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

একমুহূর্ত থামেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললেন, এবার সুযোগ এসেছে। দিল্লীর ফরমান অগ্রাহ্য করার একটা কারণ পেয়েছি এতদিনে। এবার শুধু ঐ ফরমান-ই অগ্রাহ্য করবো না, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা শুল্ক ফাঁকির দায়ে কাশিমবাজার কুঠীর ঐ ফিরিঙ্গীগুলোকেও কঠিন শাস্তি দেবো।

কিন্তু প্রমাণ কোথায়, জাঁহাপনা? ওরা সাকুল্যে কত টাকা ফাঁকি দিয়েছে তা বোঝা যাবে কী করে? প্রশ্ন করে রঘুনন্দন।

হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোমাদের ডেকেছি। আমি ইচ্ছে করেই দু'দিন সময় নিয়েছি। ওদের বলেছি, পরশু আমি আমার আদেশ দেব। কিন্তু সেই পরশু হয়ত আর আসবে না। তার আগে কালই ওদের কুঠীর কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে ফাঁকির অঙ্কটা জানতে হবে। ওরা এখন অসতর্ক। বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার আনন্দে ওরা এখন মশগুল্। এই সুযোগটা গ্রহণ করতে হবে আমাদের।

মুর্শিদকুলী খাঁ থামতেই রঘুনন্দন বললে, আপনার হুকুম তামিল হবে জাঁহাপনা।

তোমার এই কাজে মদত্ দেবে কোতোয়াল মহম্মদ জান। তোমার সঙ্গে একদল সিপাহী নিয়ে মহম্মদও যাবে কাশিমবাজারের কুঠীতে। কী জানি, বলা তো যায় না। ওরা হয়ত বল প্রয়োগ করতে পারে।

মহম্মদ জান জবাব দেয়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জাঁহাপনা। খাজাঞ্চিজীর এতটুকু ক্ষতি হতে দেব না আমি।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। বলতে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ, কাগজপত্রে ফাঁকি ধরা পড়লে কুঠীর সমস্ত ফিরিঙ্গীগুলোকে কয়েদ করে আমার দরবারে এনে হাজির করবে। এতটুকু দয়ামায়া করবে না। ওদের ইমান বলে কোন পদার্থ নেই। স্বার্থের খাতিরে ওরা সবকিছু করতে পারে। ওরা চেনে কেবল মোহর, টাকা, সিক্কা। আসল বেনিয়ার জাত ওরা। নিজেদের স্বার্থে ওরা অনায়াসে নিমকহারামী করতে পারে।

নবাবকে কুর্নিশ করে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ায় মহম্মদ জান ও রঘুনন্দন। তারপর, চলতে চলতে পরের দিন কাশিমবাজার কুঠী অবরোধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে তারা।

কথায় কথায় রাজ্যের অনেক সমস্যাই এসে পড়ে তাদের আলোচনার মধ্যে। কিন্তু নবাবজাদী আজিমুনের অসুস্থতার বিষয়টি অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে দু'জনেই। একটি মৃত্যুপথযাত্রী নারীকে নিয়ে আশংকায় দু'জনেই অস্থির। তাদের অবসর সময়ের অধিকাংশ সময়টুকুই কেটে যায় আজিমুনের চিন্তায়। দু'জনেই কায়মনোবাক্যে তার আরোগ্য কামনা করে। দু'জনেরই রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ঐ

একটিমাত্র নারী। কিন্তু তবুও তারা একে অন্যের কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে না তার কথা। একটা সঙ্কোচ, কেমন যেন একটা লজ্জা এসে কণ্ঠরোধ করে তাদের।

তাই, শেষ পর্যন্ত তাদের আলোচনায় অনুক্তই থেকে যায় নবাবজাদী। কেবল দু'জনেই মনে মনে অনুভব করে, আজিমুনের অসুস্থতার বিষয়ে আলোচনা করে অতি সহজেই তারা মনের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারতো। কিন্তু তা' হবার নয়।

পরের দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরেই কাশিমবাজারের কুঠী অবরুদ্ধ হয়। নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের অধিনায়কত্বে ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা ঘিরে ফেলে সেই কুঠী। মহম্মদ জানের কড়া হুকুম, কুঠীর অভ্যন্তর থেকে একটি প্রাণীও যেন বাইরে চলে যেতে না পারে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে কুঠীর বারান্দায় সহকারীদের নিয়ে এসে দাঁড়ায় অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেস্। আর ঠিক্ সেই মুহূর্তে পাঁচজন সুদক্ষ ইংরাজী-নবীশ খাজাঞ্চি নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যায় রাজ্যের মুখ্য-খাজাঞ্চি রঘুনন্দন।

খাজাঞ্চিদলকে দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করে নেয় বুদ্ধিমান রবার্ট হেজেস্। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনস্থির করে ফেলে দু'পা এগিয়ে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের।

অভ্যর্থনার ঘটায় একটু বিস্মিত হয় রঘুনন্দন। পরক্ষণেই নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর লিখিত আদেশপত্রখানা তুলে দেয় দেশী-ভাষায় অভিজ্ঞ ষ্টক্‌হাউসের হাতে।

আদেশপত্রের উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় ষ্টক্‌হাউস্। তারপর মাতৃভাষায় ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করে অধ্যক্ষ হেজেসের কাছে।

রবার্ট হেজেসের মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে। রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমি সত্যিই দুঃখিত যে নবাব আমাদের সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা করেছেন!

বলা বাহুল্য, দোভাষী ষ্টক্‌হাউসের সাহায্যেই সে কথা বলতে থাকে মুখ্য খাজাঞ্চি রঘুনন্দনের সঙ্গে।

রঘুনন্দন জবাব দেয়, আমিও দুঃখিত যে আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারছি না, সাহেব। আমরা রাজকর্মচারী, নবাবের আদেশ প্রতিপালন করাই আমাদের একমাত্র কাজ।

তা তো বটেই! এমনিভাবে আপনাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে পাঠিয়ে নবাব শুধুমাত্র আমাদেরই অপমান করেন নি, গোটা ইংরেজ জাতকে অপমান করেছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একটু বিরক্ত ভঙ্গিতেই কথাটা বলে রবার্ট হেজেস্।

জবাব দেয় রঘুনন্দন, তা আপনাদের অভিরুচি। ইচ্ছে করলে আপনারা দরবারে গিয়ে নবাবের কাছে আপনাদের প্রতিবাদ জানাতে পারেন। কিন্তু তার আগে নবাবের হুকুম তামিল করতে সুযোগ দিন আমাদের।

তা' কী করে হয়? প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে রবার্ট হেজেস্, নবাবের কাছে আমরা দরবার করবো। সেই দরবারের ফলাফলের উপরই নির্ভর করবে আমাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করার সুযোগ আপনারা পাবেন কিনা।

কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। বললে, না, তা' হয় না, সাহেব। নবাবের হুকুম আমাদের তামিল করতেই হবে। আর তা' এখনই।

বাধ্য হয়েই সময় সময় পছন্দ করতে হয় একমাত্র দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে। তা' ছাড়া উপায় কী? তাদের ফুটফুটে গায়ের রং সুন্দরী স্ত্রীরা তো সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে। কাজেই প্রয়োজনের মুহূর্তে এদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। আর, এদেশের এই গড়গড়াও হেজেসের খুব পছন্দ। দেশীয় প্রথায় তাম্রকূট সেবনের এই অভিনব পদ্ধতিটি সত্যিই তার ভালো লাগে। সত্যিই, এই পদ্ধতির মধ্যে একটা নবাবী আমেজের স্বাদ পাওয়া যায়।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রঘুনন্দনের সঙ্গে কথা বললেও রবার্ট হেজেসের মনটা পড়েছিল তার শয়ন-কক্ষের আলমারীর মধ্যে। কী উপায় করা যাবে ঐ কাগজপত্র নিয়ে? এই সময় সকলের অগোচরে ওসব পুড়িয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। তাতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। তার চাইতে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কী সেই ব্যবস্থা?

দপ্তরখানা থেকে ঘুরে এসে রঘুনন্দন নিজের আসনে বসতে বসতে রবার্ট হেজেসের দিকে তাকিয়ে বললে, কী সাহেব, একটু আগে তো বললেন, মাত্র দশ বিশ হাজার টাকার গরমিল হতে পারে। এখন তো দেখছি মোটেই তা' নয়। গরমিল মোটেই নেই। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। এটা গরমিল নয়, স্রেফ ফাঁকি। আরও কত বেরোবে, কে জানে? এখন পর্যন্ত তো আপনার দপ্তরের আধাআধি কাগজও দেখা শেষ হয় নি! এরপর, দপ্তরখানা ছাড়া অন্য কোন ঘরে কাগজপত্র আছে কিনা তাও পরীক্ষা করতে হবে।

ধূর্ত হেজেস্ কিন্তু একটু ম্লান হেসে জবাব দেয়, না—না,

অন্য কোথাও আর কাগজপত্র নেই। সবই আছে কেবল ঐ দপ্তরখানায়। বলেই ষ্টক্‌হাউসের দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইঙ্গিত করতেই ষ্টক্‌হাউস্ কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। হেজেস্ আবার গড়গড়া টানতে থাকে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।

ষ্টক্‌হাউসের প্রতি হেজেসের সেই ইঙ্গিত কিন্তু চোখ এড়ায় না রঘুনন্দনের। কিন্তু সে কোন কথা না বলে চুপ করেই থাকে।

একটু পরেই কক্ষের মধ্যে আবার প্রবেশ করে ষ্টক্‌হাউস্। তার পিছনে কুঠীর একমাত্র খানসামা ইয়াকুব। ইয়াকুবের দু'টো ভারী থলি।

ষ্টক্‌হাউসের নির্দেশে ইয়াকুব এগিয়ে এসে থলি দুটো রঘুনন্দনের পায়ের কাছে রাখতেই রঘুনন্দন চম্‌কে তাকিয়ে বললে, একী! এসব কী?

বিনীত ভঙ্গিতে হেজেস্ জবাব দেয়, না, তেমন কিছু নয়। মাত্র দু'লাখ টাকা আছে এতে। আপনার নজরানা।

আমার নজরানা। কেন, আমার আবার নজরানা কেন? ব্যাপারটা বুঝতে পারে রঘুনন্দন। তাকে উৎকোচে বশীভূত করতে চেষ্টা করছে ফিরিঙ্গীরা। ঘৃণায় মনটা রি-রি করে ওঠে তার। ক্রোধে আপদমস্তক জ্বলতে থাকে।

নিজেকে কঠিন সংযমে সামলে রেখে শান্ত কণ্ঠেই রঘুনন্দন আবার বললে, আপনারা চাইছেন, আমি আপনাদের দেওয়া এই উৎকোচ গ্রহণ করে নবাবের সঙ্গে বেইমানী করি তাই না, সাহেব?

সঙ্গে সঙ্গে হেজেস্ নিজের বুকে ক্রস্ এঁকে বলে ওঠে, ছি-ছি! আমি কি আপনাকে এ কথা বলতে পারি?

আপনি হচ্ছেন রাজকর্মচারী। তবে আপনি যদি দয়া করে এই টাকাটা গ্রহণ করে আমাদের কিছু অভয় দেন তো—।

ক্রোধে এবার ফেটে পড়ে রঘুনন্দন, মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে তার। একমুহূর্ত চিন্তা করে সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টাকার থলির উপর একটা লাথি মেরে চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার দেয়, সরিয়ে নিন—সরিয়ে নিয়ে যান এই পাপের টাকা। আপনাদের ঔদ্ধত্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনারা আমাকে সঠিক চেনেন না, তাই আমাকে উৎকোচে বশীভূত করতে চেষ্টা করছেন। এ তো মাত্র দু'লাখ টাকা! আপনাদের দেশের রাজভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য আছে, সব একত্রে আমার পায়ের কাছে এনে জড়ো করলেও আমাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারবেন না। আপনারা হচ্ছেন বেনিয়ার জাত। তাই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ প্রভৃতি শব্দগুলোর সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই পদ্ধতিতে আপনারা দিল্লীর সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের কাছ থেকে ফরমান্ আদায় করেছেন। এদেশের সম্পদ লুটেপুটে জাহাজ ভর্তি করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেই আপনারা সর্বদা সচেষ্ট। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনারা বেইমানী করেছেন। আর উৎকোচে বশীভূত করে আমাকেও বেইমান করে তুলতে চাইছেন।

একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু দম নেয় রঘুনন্দন। তারপর আবার তেমনি কঠোর কণ্ঠে বলতে থাকে, কিন্তু আপনাদের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সফল হবে না, সাহেব। আপনাদের আমি কিছুতেই অব্যাহতি দেব না। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করার ফল আপনাদের ভোগ করতেই হবে।

কিন্তু আপনি একবার ভেবে দেখুন। দু'লাখ টাকা—।

আবার ঐ কথা? এখনই এই থলিদুটো সরিয়ে নিন এখান থেকে। নইলে, আমি ওদুটো জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল রবার্ট হেজেসের। একমুহূর্ত সে রঘুনন্দনের মুখের পানে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর টাকার থলিদু'টো সরিয়ে নিতে হুকুম দেয় ইয়াকুবকে।

অশান্ত রঘুনন্দন তখনও ক্রোধে কাঁপছিল। টাকার থলি নিয়ে ইয়াকুব হুট্‌হাউসের পেছন পেছন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই অপেক্ষাকৃত শান্ত হয় রঘুনন্দন। নিজের আসনে বসে সে কেবল জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর উত্তেজিত অপমানিত রবার্ট হেজেস্ ঘন ঘন গড়গড়ার নল টানতে টানতে ভাবতে থাকে তার পরবর্তী প্রচেষ্টার কথা।

তখনও দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা শেষ হয় নি। আরও সামান্য কিছু বাকি। ইতিমধ্যেই ফাঁকি দেওয়া টাকার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় একলাখের কাছাকাছি।

ঠিক সেই সময় খাজাঞ্চি পঞ্চানন এসে দাঁড়ায় রঘুনন্দনের সামনে।

কিছু বলতে চান আপনি? প্রশ্ন করে রঘুনন্দন।

মাথা নেড়ে সায় দেয় পঞ্চানন। তারপর বললে, হঠাৎ শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, মাথাটা ঘুরছে। কাজ করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার।

তাই নাকি? রঘুনন্দনের কণ্ঠে উদ্বেগ। বললে, তাহলে আপনি এবার বাড়ি যান। আপনার এখানে থাকার আর

প্রয়োজন নেই। বাকি কাজটুকু ওদের দিয়েই আমি চালিয়ে নেব।

কিন্তু আরও যদি কাগজপত্র পাওয়া যায় তো ওদের চারজনের খুবই কষ্ট হবে। আমি বরং—। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে পঞ্চানন বললে।

না—না। বলে ওঠে রঘুনন্দন, আপনি চিন্তা করবেন না। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। তেমন কোন অসুবিধা দেখলে আমি খাজাঞ্চিখানা থেকে আরও দু'একজনকে আনিয়ে নেব। অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে না।

কৃতজ্ঞভঙ্গিতে রঘুনন্দনকে অভিবাদন করে মৃদু পদক্ষেপে চলে যায় পঞ্চানন। আর কাজের তদারকি করতে দপ্তরে আবার এসে হাজির হয় রঘুনন্দন।

নবাবের সিপাহীরা কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠীকে ঘিরে রেখেছে। সিপাহীদের প্রতি কোতোয়াল মহম্মদ জানের কড়া নির্দেশ, নবাবের খাজাঞ্চিরা যতক্ষণ কুঠীর ভিতরে বসে কাজ করবে, ততক্ষণ তারা যেন কাকপক্ষীটিকেও কুঠীর বাইরে যেতে না দেয়। একটুকরো কাগজও যেন কোন মতে কুঠীর বাইরে চলে যেতে না পারে।

কুঠীর এলাকাটা ছোট নয়। নিজের সাদা রংয়ের ঘোড়ায় চেপে সিপাহীদের তদারকি করছিল কোতোয়াল মহম্মদ জান। সঙ্গে সিপাহীদের সর্দার গোলাম রসুল।

অকস্মাৎ দূরে একটা গোলমালের শব্দ কানে যেতেই সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায় তারা।

একজন দেশী ব্যক্তির মাথায় লাল শালু দিয়ে বাঁধা বিরাট কাগজপত্রের পাহাড়। কুঠীর দিক থেকেই এসেছিল লোকটা। বাইরে যেতে চাইছিল সে।

ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা পথরোধ করেছে তার। লোকটি সেই পাহাড় প্রমাণ কাগজ মাথা থেকে নামিয়ে রেখে হাতমুখ নেড়ে তর্ক করছিল সিপাহীদের সঙ্গে। কিছু বোঝাতে চাইছিল তাদের। কিন্তু সিপাহীরা নাছোড়বান্দা। তারা কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না।

কোতোয়াল মহম্মদ জানকে এগিয়ে আসতে দেখেই সিপাহীরা একটু সরে যায়। মহম্মদ জান লোকটির একেবারে কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ায়।

লোকটির আপাদমস্তক ও তার পাশে পড়ে থাকা লাল শালু দিয়ে বাঁধা কাগজপত্রের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টিতে লোকটির মুখের পানে তাকিয়ে মহম্মদ জান প্রশ্ন করে, কে তুমি? কী চাই তোমার?

একটা ঢোক গিলে লোকটি জবাব দেয়, আজ্ঞে, আমি ইয়াকুব। কুঠীয়াল সাহেবদের খানসামা।

কী চাই তোমার? এই কাগজগুলো কীসের?

আজ্ঞে, এগুলো সাহেবদের দপ্তরের কাগজ। খাজাঞ্চিজীর হুকুমে এগুলো খাজাঞ্চিখানায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

কেন?

তা তো বলতে পারবো না হুজুর। খাজাঞ্চিজী বললেন, এগুলো নাকি এখানে বসে পরীক্ষা করা চলবে না। তিনি এগুলো তাঁর দপ্তরে বসে পরীক্ষা করবেন।

খাজাঞ্চিজী নিজে একথা বলেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

তিনি কোথায়?

তিনি সাহেবদের দপ্তরে বসে কাজ করছেন।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মহম্মদ জান। একবার তাকায় সেই কাগজের দিকে। তারপর আবার প্রশ্ন করে, খাজাঞ্চিজী তোমাকে কোন লিখিত অনুমতিপত্র দিয়েছেন ?

মাথা নাড়ে ইয়াকুব। বললে, আজ্ঞে না, হুজুর।

একটু বিস্ময় বোধ করে মহম্মদ জান। রঘুনন্দন এমন একটা কাঁচা কাজ করলে কেমন করে ? সে কি জানে না, লিখিত অনুমতিপত্র ছাড়া সিপাহীরা একটি লোককেও কুঠীর বাইরে যেতে দেবে না ?

লোকটির দিকে তাকিয়ে মহম্মদ জান আবার বললে, বেশ, এই কাগজপত্র এখানেই থাক্। সিপাহীরা পাহারা দেবে। তুমি আমার সঙ্গে কুঠীর ভিতরে চল। সেখানে খাজাঞ্চিজীর সঙ্গে দেখা করে তবেই তোমাকে যেতে দেব।

ইয়াকুব অনিচ্ছা সত্ত্বেই ফিরে দাঁড়ায় কুঠীর দিকে। মহম্মদ জানও তার ঘোড়ার পিঠে আবার উঠ্‌তে যাবে ঠিক এমনি সময় লোকটি দূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে ওঠে, ঐ তো—ঐ তো এক বাবু এসে পড়েছেন। উনিই যাবেন আমার সঙ্গে।

ঘোড়ার পিঠে আর ওঠা হয় না মহম্মদ জানের। সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরেই এসে হাজির হয় খাজাঞ্চি পঞ্চানন। তার মুখে চোখে তখন আনন্দের ঢেউ। অসুস্থতার চিহ্নমাত্র নেই তার দেহের কোথাও।

মহম্মদ জানের কাছে এগিয়ে এসে কণ্ঠে খুশীর ভাব ফুটিয়ে তুলে পঞ্চানন বললে, খুব ভালো খবর, কোতোয়াল সাহেব। ফিরিঙ্গী ব্যাটারা লাখ টাকার উপর শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে। এখনও কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করতে বাকি

আছে। তার উপর এইগুলোর মধ্যে যে আরও কত লক্ষ টাকার হিসেব পাওয়া যাবে কে জানে? বলেই পঞ্চানন আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কাগজগুলো দেখিয়ে দেয়।

মহম্মদ জান প্রশ্ন করে, এগুলো এখানে পরীক্ষা করা হবে না?

না, কোতোয়াল সাহেব। জবাব দেয় পঞ্চানন, সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই খাজাঞ্চিজী এগুলো আমাদের দপ্তরে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। রাতে এই ফিরিঙ্গীদের আড্ডায় বসে কাজকর্ম করা তো তেমন নিরাপদ নয়।

হ্যাঁ, তা ঠিক। মাথা নেড়ে সায় দেয় মহম্মদ জান। তারপর আবার প্রশ্ন করে, এই লোকটি কে?

জবাব দেয় পঞ্চানন, এ এই কুঠীয়ালদের খানসামা। এই অসময়ে আবার কোথায় গাড়ি ঘোড়া ঠিক করতে যাবো, তাই এই ব্যাটাকেই কিছু বকশিসের লোভে এগুলো আমাদের দপ্তরে পৌঁছে দিতে রাজি করিয়েছি। বলেই পঞ্চানন অকস্মাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে ইয়াকুবকে হাঁক দেয়, এই ব্যাটা, তুই হাঁ-করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নে—নে। এগুলো মাথায় তুলে নে।

কাগজের বোঝা সমেত ইয়াকুবকে সঙ্গে নিয়ে আবার চলতে শুরু করে পঞ্চানন। যাবার আগে কোতোয়াল মহম্মদ জানকে অভিবাদন করে উৎসাহিত কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, বুঝলেন কোতোয়াল সাহেব, এবার এই ফিরিঙ্গী ব্যাটাগুলো যা জব্দ হবে! নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এবার ব্যাটাদের নকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বেন।

পঞ্চানন চলে যেতেই সিপাহীদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ

দিয়ে মহম্মদ জান ঘোড়ায় চেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। গোলাম রসুলও অনুসরণ করে তাকে।

হঠাৎ কী মনে হতেই মহম্মদ জান সিপাহীদের সর্দার গোলাম রসুলকে বললে, আমি একটু বিশেষ কাজে যাচ্ছি। আপনি এদের তদারকি করবেন। আমার ফিরতে দেরি হলে আমার জন্যে আপনারা অপেক্ষা করবেন না। খাজাঞ্চিজীর কথামত চলবেন, বুঝলেন?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গোলাম রসুল বললে, আপনি আজ ফিরবেন না, জনাব?

একটু চিন্তা করে মহম্মদ জান জবাব দেয়, তা' এখনই বলতে পারি না। তবে দেখবেন, আমার হুকুমমত যেন কাজ হয়। কাজে কোনরকম গাফিলতি কিংবা গল্‌তি না হয়, বুঝলেন?

গোলাম রসুল জবাব দেয়, বিলকুল আপনার হুকুম মতই কাজ হবে, জনাব আলি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

মহম্মদ জান কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না সেখানে। পায়ের গোড়ালী দিয়ে ঘোড়ার পেটে আঘাত করতেই শিক্ষিত ঘোড়া বিদ্যুৎগতিতে তাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর তলব মত মুখ্য-খাজাঞ্চি রঘুনন্দন ও সিপাহী সর্দার গোলাম রসুল এসে হাজির হয় নবাবের বিশ্রাম কক্ষে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভ্রু কুঞ্চিত করে গোলাম রসুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে?

আমি জাঁহাপনার বান্দা গোলাম রসুল। সিপাহীদের সর্দার। বিনীত কণ্ঠে গোলাম রসুল জবাব দেয়।

তুমি কেন? তোমাকে তো আমি ডাকিনি। কোতোয়াল মহম্মদ জান কোথায়?

গোস্তাকি মাপ হয়, জাঁহাপনা। কোতোয়াল সাহেবের খবর আমি জানি না। তিনি বিকেলে কাশিমবাজার কুঠী অবরোধকারী সিপাহীদের ভার আমার উপর দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

আশ্চর্য! বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ, এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব তোমার উপর ফেলে দিয়ে সে চলে গেল? কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ করলে মহম্মদ? যদি কোন ঝঞ্ঝাট হত ওখানে? যদি কোন খুনখারাবী হয়ে যেত?

না, খোদাবন্দ্। তেমন কিছুই হয়নি। খাজাঞ্চিজীর হুকুমমত আমরা ঐ তিনজন ফিরিঙ্গীকেই ধরে নিয়ে এসে কয়েদখানায় রেখে দিয়েছি। কোন ঝঞ্ঝাটই হয়নি।

কেবল—

কেবল কী? প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

এবার জবাব দেয় রঘুনন্দন। বললে, না জাঁহাপনা। তেমন কিছুই নয়। কাশিমবাজার থেকে সাহেবদের নিয়ে আসার সময় অধ্যক্ষ রবার্ট হেজেসের কুচকুচে কালো রংয়ের বিলিতি পোষা কুকুরটা যে কখন আমাদের অনুসরণ করছিল আমরা টের পাইনি। রাজধানীতে ফিরে এসে সাহেবদের কয়েদখানায় ঢোকাবার সময় হঠাৎ সেই কুকুরটা পিছন থেকে ছুটে এসে কয়েদখানার একজন সিপাহীকে কাম্‌ড়ে দেয়। আমাদের একজন সিপাহী গুলি ছুঁড়েছিল। কুকুরটা জখম

হয়েছিল, কিন্তু মরে নি। সেই অবস্থায় সেটা পালিয়ে যায়।

তাই নাকি ? বলতে থাকেন মুর্শিদকুলী খাঁ, জখম কুত্তা তো শুনেছি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ওটাকে ধরা গেল না ?

জবাব দেয় গোলাম রসুল, না জাঁহাপনা। কয়েদখানার সামনে সাহেবদের দেখতে অনেক লোক ভীড় করেছিল। তারাও কুত্তাটাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। দু'জন লোককে কামড়ে দিয়ে সেটা কোথায় যেন পালিয়ে গেল। মাথায় গুলি লাগা সত্ত্বেও কুত্তাটা কেন যে মরে নি, সেটাই আশ্চর্য, খোদাবন্দ।

মাথা নেড়ে নবাব বললেন, হ্যাঁ, বিলিতি কুত্তা কিনা, কড়া জান ওদের। মরেও মরে না ওরা।

একটু থেমে মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, সে যাক্। এবার বল, ঐ ফিরিঙ্গী বেনেরা কত টাকা শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে ?

আজ্ঞে, এক লাখ দশ হাজার টাকা, জাঁহাপনা। জবাব দেয় রঘুনন্দন।

সেকি! বিস্মিত কণ্ঠস্বর নবাবের ; মাত্র এক লাখ দশ হাজার টাকা ? তোমরা ভালমত কাগজপত্র পরীক্ষা করেছ ?

হ্যাঁ, জাঁহাপনা। আমাদের হিসাবে কোন ভুল নেই।

কুঠীর সমস্ত ঘর তল্লাসী করে দেখেছ, ওরা কোন কাগজপত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা ?

হ্যাঁ, জাঁহাপনা। কোথাও কিছু পাওয়া যায় নি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে নবাব আবার বললেন, তুমি ঠিক্ কথা বলছ, রঘুনন্দন ?

নবাবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে একটু বিস্ময় বোধ

করে রঘুনন্দন। নবাব তাকে কোন রকম সন্দেহ করছেন নাকি ?

শান্ত কণ্ঠে রঘুনন্দন জবাব দেয়, আমি মিথ্যে কথা বলি না, জাঁহাপনা।

এবার অকস্মাৎ গোলাম রসুল রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, সেকি খাজাঞ্চিজী! আপনি-ই তো আপনার একজন খাজাঞ্চি মারফত্ প্রচুর কাগজপত্র এখানে আপনার দপ্তরে বসে পরীক্ষা করবেন বলে পাঠিয়েছেন। সে কথা ভুলে গেলেন ?

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনন্দন বললে, আমি পাঠিয়েছি। কী বলছেন আপনি ? আপনি ভুল করেছেন, সর্দারসাহেব।

হঠাৎ গর্জে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। বজ্রনির্ঘোষে বলে ওঠেন তিনি, না, গোলাম রসুল মোটেই ভুল করে নি। তুমিই ইচ্ছা করে মিথ্যা বলছ, রঘুনন্দন। আমিও আমার গুপ্তচর মারফত্ এ খবর আগেই জোগাড় করেছি। তুমি অস্বীকার করতে পারো, তোমার খাজাঞ্চি পঞ্চানন মারফত্ প্রচুর কাগজপত্র তুমি কুঠীর বাইরে পাচার কর নি ?

বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যায় রঘুনন্দন। সেই মুহূর্তে কোন কথাই তার মুখে জোগায় না।

নির্বাক রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে এবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন নবাব, ছি—ছি, রঘুনন্দন। সামান্য অর্থের লোভে তুমি আমার সঙ্গে এত বড় বেইমানী করলে ? তোমাকে যে আমি নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতাম। এমনিভাবে তুমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করলে ? ছি—ছি, তোমাকে যে আমি কী বলব বুঝতে পারছি না—।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন জ্বলে যাচ্ছিল রঘুনন্দনের। বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন একটা তপ্ত লৌহ-

শলাকা চেপে ধরেছে। যন্ত্রণায় যেন চিৎকার করে উঠ্‌তে চাইছে মনটা। কিন্তু পারছে না। সেই শীতের রাতেও কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে সে। কল্পনাতীত এই অপমান সে কেমন করে সহ্য করছে তা' যেন নিজেই ভেবে পায় না। অদ্ভুত শীতল কণ্ঠে রঘুনন্দন শুধু বললে, অসুস্থতার অজুহাতে খাজাঞ্চি পঞ্চানন আমার কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল। সে যে—

কথাটা শেষ করতে পারে না রঘুনন্দন। তার আগেই মুর্শিদকুলী খাঁ বলে ওঠেন, ছি—ছি। নিজের অপরাধের বোঝা একজন অধস্তন কর্মচারীর ঘাড়ে চাপাতে চাইছো? এত ছোট তোমার মন? তবে কি বুঝবো, তামাম বাংলা মুল্লুকে ইমানদার লোক বলে কেউই নেই? যাদের এতদিন সব চাইতে বেশি বিশ্বাস করে এসেছি তারা সকলেই তোমার মত বেইমান? তারা সকলেই এতদিন তোমার মত ধোঁকাবাজী করে বাজীমাৎ করতে চেষ্টা করেছে নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে? খোদাতালার এই দুনিয়ায় সকলেই তোমার মত বিলকুল ঝুট্‌?

প্রতিবাদের ভাষা জোগায় না রঘুনন্দনের কণ্ঠে। প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তিও হয় না। রঘুনন্দন দৃঢ় পদক্ষেপে নবাবের সামনে দু'পা এগিয়ে যায়। তারপর নিচু হয়ে নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে নবাবের কাছে রেখে বললে, বেইমানকে আর কাজে বহাল রাখবেন না, জাঁহাপনা। এই মুহূর্তে আমি চাকুরি ত্যাগ করছি—।

আবার গর্জে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। বললেন, তুমি কি ভেবেছ, মাত্র চাকুরি ত্যাগ করলেই তোমার বেইমানীর শাস্তি হবে?

এবার দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় রঘুনন্দন, বেশ, তবে আমাকে শাস্তি দিন, জাঁহাপনা।

হ্যাঁ, কঠিন শাস্তিই দেব তোমাকে। তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবো। এতদিন তোমাকে সোনা বলেই জেনে এসেছি। এখন দেখছি তুমি একটি নগণ্য মাটির ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নও।

ঠিকই বলেছেন, জাঁহাপনা। খাজাঞ্চিজীকে এতদিন সোনা ভেবে সত্যিই আপনি ভুল করেছেন। বলতে বলতে দীর্ঘ পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে কোতোয়াল মহম্মদ জান। তারপর নবাবকে দীর্ঘ কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললে, খাজাঞ্চিজী মোটেই সোনা নন। তিনি খাঁটি হীরের টুক্‌রো।

বিস্মিত নবাব কোতোয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলছ তুমি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

আজ্ঞে, সেই খবর দিতেই তো জাঁহাপনার কাছে ছুটে এলাম। একটু থেমে মহম্মদ জান আবার বলতে থাকে, নগদ দু'লাখ টাকা উৎকোচ দিয়ে খাজাঞ্চিজীকে বশীভূত করতে না পেরে ফিরিঙ্গীরা খাজাঞ্চি পঞ্চাননের শরণ নেয়। পঞ্চানন আমার চোখে ধূলো দিয়ে কুঠীর খানসামা ইয়াকুবের মাথায় প্রচুর কাগজপত্রের বোঝা চাপিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাপারটা আমি যখন বুঝতে পারি, তখন তারা আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। গোলাম রসুলের উপর সিপাহীদের ভার দিয়ে ছুটলাম তাদের সন্ধানে। অবশেষে ভাগীরথীর তীরে এক নির্জন প্রান্তরে দেখা পেলাম তাদের। তারা তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাগজপত্র ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল। দু'জনকেই

আমি গ্রেপ্তার করলাম। সেই কাগজপত্রও নিয়ে এলাম এখানে। খানসামা ইয়াকুবের কাছে সব কিছু জানতে পারলাম। ওদের আমি কয়েদখানায় রেখে, সেই কাগজপত্র খাজাঞ্চিখানায় জমা দিয়ে এইমাত্র ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি জাঁহাপনার কাছে। কোতোয়াল মহম্মদ জান থামে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উঠে দাঁড়ান। তিনি হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারেন না। মহম্মদ জানের দিকে একবার প্রসংশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি এগিয়ে যান রঘুনন্দনের কাছে। হাতে তাঁর রঘুনন্দনের পাগড়ি। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমার ভুল হয়েছে রঘুনন্দন। এই নাও তোমার পাগড়ি।

ধীরে ধীরে মাথা তোলে রঘুনন্দন। নবাবের মুখের পানে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, তা' হয় না, জাঁহাপনা। ভুল করে হলেও একবার যখন আমার প্রতি অবিশ্বাসের বীজ আপনার মনে ঢুকেছে, তখন এমন দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য থেকে আমার সরে দাঁড়ানোই উচিত।

একটু সময় স্থির হয়ে থেকে নবাব আবার বললেন, তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি তাতে সত্যিই আমি লজ্জিত। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ওকথা বলবেন না, জাঁহাপনা। আমরা হিন্দুরা দেশের রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করি। ওকথা শুনলেও আমাদের পাপ হয়।

তবে কি এমনিভাবে আমাকে অপরাধী করে তুমি পরিত্যাগ করতে চাও আমাকে?

না, জাঁহাপনা। আপনাকে অপরাধী করার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আপনার স্নেহ কোনদিনই আমি ভুলতে

পারবো না। আর, পরিত্যাগ তো করছিনা আপনাকে। কেবল যে চাকুরী আমি স্বেচ্ছায় এই মাত্র পরিত্যাগ করেছি, সেই চাকুরী গ্রহণ করতে আমাকে অনুরোধ করবেন না। নিজের মুখের কথা ফিরিয়ে নিতে আমি পারবো না, জাঁহাপনা।

কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার রাজ্যের খাজাঞ্চিখানা চলবে কী করে, রঘুনন্দন? এতবড় দায়িত্ব আমি কাকে দেব?

মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে রঘুনন্দনের ঠোঁটের কোনে। জবাব দেয় সে, আপনি তো জানেন, জাঁহাপনা, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই কোনদিন অপরিহার্য নয়। আমি না থাকলেও আপনার চলবে।

কিন্তু তুমি এসে আমার রাজত্বের অর্থনীতির মোড় যেভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছ, তেমনটি হয়ত আর কেউ পারবে না।

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে রঘুনন্দন।

মুর্শিদকুলী খাঁ ধরাগলায় আবার বললেন, তুমি আমার পাশে থাকবে না, একথা যে আমি ভাবতেই পারছিনা রঘুনন্দন। তুমি আর একবার ভেবে দেখ। আমার অপরাধ ক্ষমা করে তুমি এই পাগড়ি আবার গ্রহণ করো। ভেবে দেখ। আমি স্বয়ং বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তোমাকে অনুরোধ করছি।

আমাকে এভাবে অনুরোধ করে আমার পাপের বোঝা আর বাড়াবেন না, জাঁহাপনা। নিজের মুখের কথা ফিরিয়ে নেবার শিক্ষা আমি কোনদিন পাইনি। চাকুরী ত্যাগ করলেও এই রাজধানীতেই আমি থাকবো। জাঁহাপনা যখন যেভাবে আমার সাহায্য চাইবেন আমি যথাসাধ্য তা' করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবো।

বিমর্ষ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কেবল উচ্চারণ করেন, খোদা মেহেরবান!

* * *

কাশিমবাজারের কুঠীয়াল রবার্ট হেজেস্ এবং তার সহকারী এড্ওয়ার্ড পেজ্ ও ষ্টক্‌হাউসকে কোন কঠিন শাস্তি দেন না মুর্শিদকুলী খাঁ। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বানিজ্য করবার অপরাধে তিনি কাশিমবাজার কুঠী বন্ধ করে দিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

মাদ্রাজে গিয়ে আশ্রয় নেয় তারা। আর এই সুযোগে দিল্লীর সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের শুল্কহীন অবাধ বানিজ্যের ফরমান্‌ও অগ্রাহ্য করেন মুর্শিদকুলী খাঁ। খবর পেয়ে ফারুক্‌শিয়ার একটু অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ক্ষমতাহীন সম্রাট প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তখন দিল্লির তক্ত সামলাতেই ব্যস্ত।

ফিরিঙ্গী বনিকদের কথা ভুলতে পারলেও রাজধানীর নাগরিকেরা কিন্তু তাদের সেই ভয়ঙ্কর বিলিতি কুকুরটার কথা ভুলতে পারে না। সেই বিলিতি কুকুর সম্বন্ধে নানারকম কল্পিত কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীতে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কেউ বলে, মাথায় গুলি খেয়েও যে কুকুর পালিয়ে যেতে পারে, সেই কুকুর মোটেই সাধারণ নয়। আসলে সাহেবদের মন্ত্রঃপুত কোন জীন্। আবার কেউ সমস্ত ব্যাপারটাই হেসে উড়িয়ে দেয়। তারা বলে, ওটা আবার বেঁচে আছে? কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। কেউ আবার বলে, রাতে নাকি কুকুরটা রাজধানীর অন্ধকার রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। কালো কুচকুচে তার চেহারা। চোখদুটো আগুনের মত জ্বলে। লক্‌লকে জিভ বেয়ে লালা গড়িয়ে পরে। কপালের উপর নাকি দগ্‌দগে ঘা। সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে নাকি সারারাত কুকুরটা খুঁজে ফেরে তার মনিবকে।

এগারো

মানুষটি একটু পাগলাটে ধরনের।

রোগা লিকলিকে দেহটি লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। বয়সের ভারে সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে সেই দীর্ঘ দেহ। হাঁটু পর্যন্ত মালকোচা দিয়ে পরা খাটোধুতির উপর গায়ে একটা ঢলঢলে কুর্তা। শুকনো মুখে দাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। তার মুখের সঙ্গে বেমানান ধবধবে সাদা লম্বা গোঁফ জোড়া কুণ্ডলি পাঁকিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। সবচাইতে বেমানান তার দেহের দুই প্রান্তসীমার সাজসজ্জা—উপরের প্রান্তে অর্থাৎ মাথায় সাদা কাপড়ের একটা বিরাট পাগড়ি। মনে হয় যেন ঐ বিরাট পাগড়ির ভারে তার সরু ঘাড়টি এখনই ভেঙ্গে পড়বে। আর নিচের প্রান্তে অর্থাৎ পায়ে একজোড়া অস্বাভাবিক বড় মাপের নাগরাই।

এই নাগরাই জোড়া নিয়েই লোকে তাকে ঠাট্টা করে। বলে, আচ্ছা বলুন তো হেকিম সাহেব, আপনার এই জুতো জোড়া তৈরী করতে ক'টা গরুর প্রয়োজন ?

ফোক্‌লা দাঁতে হেসে জবাব দেয় হেকিম সুফী, আরে তোবা—তোবা! গরু কেরে বুরবক্ ? গরুর চামড়ার জুতো আমি পায়ে দিই না।

তবে ?

আমি পায়ে দিই খাঁটি শেরের চামড়ার জুতো।

সেকি হেকিম সাহেব? বাঘের চাম্ড়ার জুতো হয় নাকি?

হয় রে উজবুক্, হয় তোরা জানিস্ না। তোদের এই বাংলা মুল্লুকের শেরের চামড়ায় হয় না, কিন্তু আমাদের ইরানী শেরের চামড়ায় খুব ভালো জুতো তৈরী হয়।

হেকিম সুফী নিজেকে ইরাণের লোক বলে বেড়ায় তার পূর্বপুরুষ নাকি কোনকালে সুদূর ইরাণ থেকেই এসেছিল হেকিমী ব্যবসা করতে। সেই থেকে তারা এই বাংলা মুল্লুকেই থেকে গেছে।

একহাতে একখানা আস্ত বাঁশের লাঠি, আর অন্যহাতে একটা চাম্ড়ার থলি নিয়ে রোগীদের বাড়ি ঘুরে বেড়ায় হেকিম সুফী। কেউ বলে, লোকটা আস্ত পাগল। আবার কেউ বলে, একটু পাগলাটে ধরনের হলেও লোকটির কিন্তু হাতযশ আছে।

অনেকের মত হেকিম সুফীও একদিন এসেছিল অসুস্থ নবাবজাদী আজিমুনকে দেখতে। নবাবজাদীকে পরীক্ষা করে গম্ভীর কণ্ঠে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে বলেছিল, কলিজার কঠিন রোগ। এ রোগের দাওয়াই জোগাড় করাই মুশকিল। হেকিম সুফীর অদ্ভুত পোষাক পরিচ্ছদ্ আর সামঞ্জস্যহীন কথাবার্তায় একটু যেন বিরক্ত বোধ করছিলেন নবাব। কিন্তু অন্য সব নামী দামী হেকিম কবিরাজেরা যেখানে একবাক্যে বলে গেলেন যে, এ রোগের নাকি কোন দাওয়াই নেই, সেখানে হেকিম সুফীর কথায় একটু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

হেকিম সুফীর শুক্নো মুখের পানে তাকিয়ে নবাব বলেছিলেন, আপনি বলছেন যে এ রোগের দাওয়াই তবে আছে।

আলবৎ আছে। সেকালের চিকিৎসকেরা কোন রোগের দাওয়াই বাতলে দিতেই ভুলে যান নি।

তবে, আপনি সেই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করুন, হেকিম সাহেব।

অসম্ভব! দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছিল হেকিম সুফী।

কেন, অসম্ভব কেন? নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র কন্যার জন্যে দাওয়াই জোগাড় করা অসম্ভব কেন? কত অর্থ আপনার চাই? রাজকোষ খুলে দিচ্ছি আমি। আপনি আপনার প্রয়োজন মত অর্থ নিয়ে সেই দাওয়াই কিনে আনুন, হেকিম সাহেব।

ফোকলা দাঁতে একটু হেসে উঠেছিল হেকিমী সুফী। তারপর বলেছিল, না, তা হয় হয়।

কেন হয় না? এতই কি দামী বস্তু সেই দাওয়াই? প্রশ্ন করেছিলেন নবাব।

দামী! নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলেছিল হেকিম সুফী, হ্যাঁ, দামীই বটে! আপনার রাজকোষ তো তুচ্ছ, তামাম হিন্দুস্তানের সমস্ত রাজকোষের অর্থ একত্র করেন তার দাম দেওয়া চলে না।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে মুর্শিদকুলী খাঁ বলেছিলেন, বলেন কি, হেকিম সাহেব? এত দামী সেই বস্তু?

একমুহূর্ত থেমে হেকিম সুফী আবার বলেছিল, আবার বলতে পারেন তার কোন দামই নেই। একটি সিক্কাও খরচ করতে লাগে না তা জোগাড় করতে।

হেকিম সুফীর হেঁয়ালীপূর্ণ কথায় এবার সত্যিই বিরক্ত বোধ করেন নবাব। বললেন, ওসব কথা রাখুন, হেকিম

সাহেব। আপনি বলুন, আমার বেটীর জন্যে ঐ দাওয়াই আপনি এনে দিতে পারবেন কি না ?

অসম্ভব। আমার পক্ষে তা জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব।

বেশ, তা'হলে আপনি এবার আসুন। বিরক্ত ভঙ্গিতে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নবাব।

হেকিম সুফী চলে যাবার পরও মুর্শিদকুলী খাঁ তার কথাই চিন্তা করেছিলেন খানিকক্ষণ। তারপর, মনে মনে বলেছিলেন, লোকটা সত্যিই পাগল। একেবারেই উন্মাদ।

সেই হেকিম সুফীই একদিন বিনা এত্তেলায় চেহেল সেতুনে নবাবের সামনে এসে হাজির হল।

বিরক্ত ভঙ্গিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নবাব প্রশ্ন করেন, কী প্রয়োজন, আপনার ?

আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

একটু সময় চিন্তা করে নবাব বললেন, বেশ, জিজ্ঞেস করুন।

কোন রকম ভূমিকা না করে হেকিম সুফী বললে, আপনার বেটী এখন কেমন আছেন ? পাটনার সেই বিখ্যাত কবিরাজের চিকিৎসায় কি কোন উন্নতি হয়েছে ?

একটু ভেবে জবাব দেন নবাব, না, উন্নতি একটু হয়নি, তবে অবনতিও হয়নি। একই অবস্থা।

পাটনার কবিরাজ কি বলেছেন যে তিনি তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারবেন ?

না। বলেছেন, কোনদিনই নাকি সে সেরে উঠ্‌বে না। এমনিভাবেই নাকি বেঁচে থাকতে হবে তাকে।

হুঁ। মুখে একটা শব্দ করে নিজের পাকা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নেয় হেকিম সুফী। তারপর আবার বললে, আমি আপনার বেটীর চিকিৎসা করবো।

সহসা নবাবের সেই অমূল্য দাওয়াইয়ের কথা মনে পড়ে। প্রশ্ন করেন তিনি, আপনি সেবার যে দাওয়াইয়ের কথা বলেছিলেন, তা' কি যোগাড় হয়েছে ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

কী করে হল ? কত টাকা খরচ হয়েছে তাতে ?

একটি সিক্কাও নয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ গম্ভীর মুখে চিন্তা করতে থাকেন। এমনি একটি পাগলের হাতে আজিমুনের চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা, তাই চিন্তা করতে থাকেন তিনি। অবশেষে মনস্থির করেন, সবাই তো জবাব দিয়ে গেছে, এখন এই ব্যক্তিকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী ?

মুর্শিদকুলী খাঁ কিছু বলার আগেই হেকিম সুফী বলে ওঠে, আমি যেদিন থেকে নবাবজাদীর চিকিৎসা আরম্ভ করবো, সেদিন থেকে পাটনার সেই কবিরাজের দাওয়াই আর চলবে না।

চমকে ওঠেন নবাব। বললেন, তাঁর দাওয়াইয়ে আজিমুনের কিছু উন্নতি না হলেও অবনতি কিছুই হয় নি। এখন, ঐ দাওয়াই বন্ধ করে দিলে যদি তার অবস্থার কোন অবনতি হয় ?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় হেকিম সুফী, না তা' হবে না। কিছুতেই তাঁর অবস্থার অবনতি হবে না। দিন দিন তিনি ভালো হয়ে উঠবেন।

যদি তা' না হয় ? যদি তার রোগ আরও বেড়ে যায় ? গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নবাব।

জবাব দেয় হেকিম সুফী, তবে আমি দায়ী রইলাম।

আমার বেটীর যদি কোন ভালোমন্দ হয়েই যায়, তখন আপনাকে দায়ী করে কী লাভ হবে আমার?

একটু সময় চিন্তা করে হেকিম সুফী আবার বললে, আমার উপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, নবাবসাহেব আমি বুড়ো হয়েছি, ইন্তেকালের সময়ও আসন্ন। এই বয়সে আপনাকে আমি ঝুট্ বলবো না। আমি আমার গর্দানা আপনার কাছে বাজী রাখলুম। নবাবজাদী আমার দাওয়াই খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। শুধু তাই নয়, এ রোগ জীবনে আর কখনও হবে না তাঁর। হেকিম সুফীর কথার ধরনে উৎসাহ বোধ করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। মনে মনে ভাবেন, সংসারে অনেক সময় অনেক আলৌকিক ব্যাপার তো ঘটতে দেখা যায়। এটাও হয়ত তেমনি কোন অলৌকিক ব্যাপার হবে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেন মুর্শিদকুলী খাঁ, বেশ আমি রাজি, হেকিম সাহেব। কবে থেকে আপনি আজিমুনের চিকিৎসা আরম্ভ করতে চান? যদি আপনি সত্যিই ওকে সারিয়ে তুলতে পারেন তবে জানবেন, আপনাকে আমার কিছুই অদেয় থাকবে না। আপনি আমার কাছে যা চাইবেন তাই পাবেন।

হেকিম সুফীর তোবড়ানো মুখে ফুটে ওঠে একটু রহস্যময় হাসি। সে জবাব দেয়, চাওয়াপাওয়ার কথা পরে হবে নবাবসাহেব। এখন কথা হচ্ছে, কবে থেকে আপনার বেটীর চিকিৎসা আরম্ভ করবো। একটু সময় ভেবে নিয়ে সে আবার বললে, ঠিক কবে থেকে আরম্ভ করবো তা এখনই আমি বলতে পারি না, নবাবসাহেব। তবে আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই আরম্ভ করতে পারবো।

বেশ, তাই হবে হেকিম সাহেব।

আমার এই চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা বলতে চাই, নবাবসাহেব।

বলুন।

আমি আপনার বেটীকে ঠিক তিরিশ দিন চিকিৎসা করবো। প্রতিদিন শেষ রাতে আমি আমার নিজের বাড়িতে টাটকা দাওয়াই তৈরী করে আমার নোকরের হাতে পাঠিয়ে দেব আপনার হারেমে। প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই নবাবজাদী ঐ দাওয়াই খাবেন। দাওয়াই খাবার আগে তিনি অন্য কিছুই খেতে পারবেন না। দাওয়াই-য়ের স্বাদও হবে ভালো, সুন্দর গন্ধও থাকবে। খেতে কোনই কষ্ট হবে না নবাবজাদীর। একাদিক্রমে তিরিশ দিন তাঁকে দাওয়াই খেতে হবে। একটি দিনও বাদ গেলে চলবে না। একটি দিন বাড়ানো কিংবা কমানোও চলবে না। তিরিশ দিনের একটি দিন বাদ গেলেই কিন্তু আপনার বেটীর অবধারিত মৃত্যু। সেই মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা থাকবে না আমার।

গম্ভীর কণ্ঠে নবাব বললেন, আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে, হেকিম সাহেব।

বেশ, আমি তবে আজ চললুম। সময়মত আপনি খবর পাবেন। বলেই উঠে দাঁড়ায় হেকিম সুফী। তারপর নবাবকে কুর্নিশ করে বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চেহেল সেতুন ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাজধানীর দিকে দিকে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে খবরটা! কেউ বিশ্বাস করে; কেউ করে না। কেউ বলে, নবাবও দেখ্‌ছি ঐ পাগলটার পাল্লায় গিয়ে পড়েছেন! আবার কেউ বলে, বলা তো যায় না। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে যে ধোঁকাবাজী চলে না, সেকথা বুঝবার মত বুদ্ধি ঐ পাগলা বুড়োটার নিশ্চয়ই আছে।

বারো

পাগলা হেকিম সুফীর অত্যাশ্চর্য দাওয়াই।

কালো রংয়ের সেই তরল পদার্থ যেন খানিকটা তরল কষ্টি পাথর। এমনি তার ঔজ্জ্বল্য; এমনি তার জৌলুস। আর সেই সঙ্গে কস্তুরীর টাট্‌কা গন্ধ।

জয়পুরী কাজ করা রূপোর বাটিতে করে সেই দাওয়াই নিয়ে নবাবজাদীর খাস পরিচারিকা রাবেয়া যখন হারেমের প্রধান ফটক থেকে ভিতরে নবাবজাদীর মহলের দিকে যাচ্ছিল, তখন তার গতির ছন্দে বাটির গায়ে ছল্‌কে ছল্‌কে পড়ছিল সেই তরল কষ্টিপাথর। আর বিদ্যুৎছটার মত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তা থেকে।

মহলের সারা পথে কস্তুরীর গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে রাবেয়া সেই দাওয়াই নিয়ে আজিমুনের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে। তখন সেখানে নসেরু বেগম তো বটেই, স্বয়ং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁও উপস্থিত। অত সকলে তিনিও শয্যাত্যাগ করে এসে হাজির হয়েছেন কন্যার রোগশয্যার পাশে। শঙ্কা মিশ্রিত আশা নিয়েই তিনি এসেছেন। হেকিম সুফীর উপর যেমন পুরোপুরি ভরসা করতে পারছিলেন না, তেমনি আবার অবিশ্বাসও করতে পারছিলেন না তাকে। তাই প্রথম দিনের দাওয়াই সেবনের ফলাফল নিজের চোখেই দেখতে চান তিনি।

নবাবজাদী আজিমুন্ কিন্তু তেমনি অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে শয্যায়। বাহ্যজ্ঞান একরকম নেই বললেই চলে। তার অস্থিচর্মসার দেহটি যেন একেবারে মিশে রয়েছে শয্যার সঙ্গে।

রাবেয়া আজিমুনের মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর

মাথা নিচু করে তার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে ডাকে, নবাবজাদী—নবাবজাদী, এই দাওয়াইটুকু খেয়ে নিন।

একবার—ছ'বার—তিনবার।

চতুর্থবারে যেন শুনতে পায় আজিমুন্। অতিকষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

রাবেয়া আবার ডাকে তাকে।

এবার ঈষৎ কাত করে রাখা মাথাটা খানিকটা সোজা করে আজিমুন্। তারপর শুকিয়ে ওঠা ফ্যাকাশে গোলাপের পাপ্ড়ির মত ঠোঁট ছ'খানি একটু ফাঁক করে প্রতীক্ষা করতে থাকে। রাবেয়া অতি সন্তর্পণে নবাবজাদীর মুখে একটু একটু করে ঢালতে থাকে সেই দাওয়াই। আর আজিমুন্ও তন্দ্রাচ্ছন্নের মধ্যেই সবটুকু তরলপদার্থ পান করে ধীরে ধীরে। তারপর আবার মাথাটা একপাশে হেলিয়ে নির্জীবের মত পড়ে থাকে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন কন্যার শয়ন কক্ষে। তারপর একসময় ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যান নিজের মহলের দিকে। একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই তাঁর চলবে না। গোটা রাজ্যের অধীশ্বর তিনি। রাজকার্য পরিচালনা করতেই হবে তাঁকে।

আশা নিরাশায় ছুলতে ছুলতে সমস্ত দিন কন্যার দিকে নজর রাখে নাসেরু বেগম। অবশেষে সন্ধ্যায় রাবেয়াকে বললে, বুঝলি রাবেয়া, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

কী বিশ্বাস হয় না, বেগম সাহেবা? নসেরু বেগমের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে রাবেয়া প্রশ্ন করে।

জবাব দেয় নসেরু বেগম, বলছি, হেকিম সুফীর এই দাওয়াই-এর কথা। বড় বড় হেকিম কবিরাজেরা যখন

জবাব দিয়ে গেলেন, তখন এই হেকিম সুফীর সাধ্য কতটুকু ?

কথার জবাব না দিয়ে রাবেয়া একটু হাসে।

ওকী, হাসছিস্ যে ?

গোস্তাকি মাপ্ হয়, বেগম সাহেবা। হাসছি আপনার কথা শুনে। বড় বড় হেকিম কবিরাজেরা মাসের পর মাস নবাবজাদীকে দাওয়াই খাইয়েও যখন কিছু করতে পারলেন না, তখন আপনি কী করে আশা করেন যে ঐ বুড়ো হেকিমের একমাত্র দাওয়াইতেই নবাবজাদী সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন ?

তা' অবশ্য ঠিক্‌ই বলেছিস তুই। কিন্তু ভুলে গেলি কেন হেকিম সুফী বলেছেন যে মাত্র তিরিশ দিনের মধ্যেই নাকি আজিমুন্ ভালো হয়ে উঠ্‌বে। তাই যদি হয় তো, প্রথম দিনের দাওয়াই খেয়েই তো তার কিছুটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল।

বুদ্ধিমতী রাবেয়া আবার জবাব দেয়, তা' কি সবসময় হয়, বেগম সাহেবা ? দাওয়াইয়ের ক্রিয়া তো আর অঙ্কশাস্ত্রের হিসাব মত চলে না যে তিরিশ দিনে সম্পূর্ণ হতে হলে প্রথম দিনে অন্ততঃ তিরিশ ভাগের একভাগ সুস্থ হয়ে উঠ্‌তেই হবে।

তোর যে দেখ্‌ছি ঐ হেকিম সুফীর উপর অগাধ বিশ্বাস।

একটু থেমে জবাব দেয় রাবেয়া, বিশ্বাস না করে উপায় কী, বেগম সাহেবা ? রোগী যতক্ষণ যে হেকিম কবিরাজের চিকিৎসায় থাকবে, ততক্ষণ তার উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। কথায় বলে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সেই আশায় বুক বেঁধেই তো মানুষ রোগীর পরিচর্যা করে।

তবে কি তুই মনে করিস্ এই দাওয়াইতেই আজিমুন্ ভালো হয়ে উঠ্‌বে ?

আবার একটু হেসে জবাব দেয় রাবেয়া, মনে না করার মত সময় তো এখনও পার হয়ে যায় নি, বেগমসাহেবা।

নসেরু বেগম আর কিছু না বলে কন্যার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে। তারপর একসময় ম্লান কণ্ঠে আবার বললে, কী জানি, রাবেয়া তুই কি করে যে এখনও বিশ্বাস করছিস্ তা' তুই-ই জানিস। বোধহয় আমি ওর মা বলেই ওর সম্বন্ধে আশঙ্কাটাই আমার মনের মধ্যে সব সময় প্রবল হয়ে রয়েছে। তাই দীর্ঘদিন চিকিৎসাতেও যখন কোন ফল হল না, তখন আর কিছুতেই বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

রাবেয়া জবাব না দিয়ে কেবল শুনে যেতে থাকে নসেরু বেগমের কথা। একটু সময় চুপ্ করে থেকে নসেরুবেগম আবার বলতে থাকে, খুদাতালার মনে কী আছে তা' তিনিই জানেন। পয়গম্বর রসুলের মর্জিতে দুটি সন্তান পেটে ধরেছিলাম। তার একটি তো অসময়ে নবাবের রোষানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর অন্যটিরও এই অবস্থা। থাকে কি যায়, আল্লাহ্তালা জানেন।

নসেরুবেগম থামতেই আশ্বাসের সুরে রাবেয়া বললে, আপনি আর চিন্তা করবেন না, বেগমসাহেবা। আমার মন বলছে, নবাবজাদী ভালো হয়ে উঠবেন। এতদিন ভুগেও যখন আল্লাহ্তালার কৃপায় উনি বেঁচে আছেন, তখন নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

তোর কথাই যেন সত্যি হয়, রাবেয়া। ধরা গলায় কথাটা বলেই নসেরুবেগম ঘাড় ফিরিয়ে আবার ছল ছল চোখে তাকায় কন্যার মুখের দিকে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাবেয়ার।

নবাবজাদীর কক্ষেই মেঝেয় শুয়েছিল সে। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন ডাকছে তাকে। মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে নাম ধরে ডাকছে। প্রথমটায় স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল

তার। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে মানুষ কি এত স্পষ্ট শুনতে পায়?

ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে রাবেয়া। তারপর কান দু'টো খাড়া করে রাখে। কিন্তু কই, কেউ তো আর ডাকছে না। তবে বোধহয় স্বপ্নই হবে।

একটা হাই তুলে আবার শোওয়ার উদ্যোগ করতেই ভেসে ওঠে সেই মৃদু কণ্ঠস্বর—রাবেয়া, রাবেয়া।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিট্‌কে উঠে দাঁড়ায় রাবেয়া। একি স্বপ্ন না সত্যি! নবাবজাদী আজিমুন্ ডাকছে তাকে। এই দীর্ঘদিনের রোগভোগের মধ্যে কথা বলা তো দূরের কথা সামান্য যন্ত্রণাকাতর শব্দও যার মুখে তেমন করে ফুটে উঠ্‌ত না, কোন্ মন্ত্রবলে সে এমনি স্পষ্ট উচ্চারণে তাকে ডাকছে?

আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে রাবেয়ার। ছুটে যায় সে নবাবজাদীর কাছে। তারপর, মাথা নিচু করে কম্পিত কণ্ঠে বললে, এই যে—এই যে আমি, নবাবজাদী। আমাকে ডাকছিলেন?

রাবেয়ার বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যে চোখ মেলে তাকায় আজিমুন্। ক্লান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে, সে—সে কোথায়?

কে—কে, নবাবজাদী? কার কথা আপনি বলছেন? নবাবজাদীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে রাবেয়া।

আজিমুন্ কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটু সময় স্থির হয়ে থাকে। তারপর আবার বললে, একটু জল, রাবেয়া।

আনন্দে আত্মহারা রাবেয়া। নবাবজাদীর মুখের কাছে জলের পাত্রটা তুলে দিতে গিয়ে উত্তেজনায় হাতটা থর থর করে কাঁপতে থাকে তার। মনে মনে উচ্চারণ করে, খোদা মেহেরবান!

উভয়েরই স্বভাবগুণে আজিমুন্‌ ও রাবেয়ার মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল তা' বান্ধবীর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। তাই আজিমুনের শারীরিক অসুস্থতার এই হঠাৎ পরিবর্তনে আনন্দে প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠেছিল রাবেয়া।

একরকম জেগেই বাকি রাতটুকু কেটে গেল রাবেয়ার। শেষ রাতে প্রাসাদের মহলে মহলে ছড়িয়ে পড়ল সেই অত্যাশ্চর্য খবর।

সকলেই বিস্মিত—চমৎকৃত। ছুটে এল নসেরু বেগম। ছুটে এলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ স্বয়ং। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তায় কালো মুখের উপর একটা আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর। ঘোর অমানিশার রাত কেটে গিয়ে যেন প্রথম সূর্যের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

সেদিন নিজের মহলে ফিরে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন তিনি। নামাজ শেষে বহুক্ষণ সেখানেই বসে রইলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার করুণার কথা স্মরণ করতে করতে চোখের কোল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তাঁর।

তৃতীয় দিনেই শয্যায় উঠে বসে নবাবজাদী আজিমুন্‌। মাত্র তিনটি দিনের মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন তার। শুক্‌নো গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত ঠোঁট দুখানা আবার সরস হয়ে উঠ্‌ল। সামান্য রং ধরল তাতে। গালেও তার সেই রং-য়ের ছোপ্‌। তার পটল-চেরা চোখ জোড়ায় ফিরে এল দীপ্তি।

চতুর্থ দিন সকালে নিজের হাতেই সেই আশ্চর্য তরল পদার্থটুকু পান করে আজিমুন্‌। বাটিটা পাশে নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাতেই রাবেয়া জিজ্ঞেস করে, দাওয়াই-য়ের স্বাদ কেমন, নবাবজাদী ?

একটু মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে আজিমুনের ঠোঁটের কোনে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, খুব ভালো।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। স্বাদের খবর তো পাইনি, কিন্তু গন্ধে একেবারে মাতাল করে তোলে। হেকিমী দাওয়াইয়ের গন্ধ যে এত চমৎকার হতে পারে তা' আমার আগে জানা ছিল না, নবাবজাদী। হেকিম সুফীও ঠিক্ ঐ কথাই বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্বাদে গন্ধে নাকি এই দাওয়াই অতুলনীয়। নবাবজাদীর খেতে কোন কষ্টই হবে না।

আবার একটু হেসে জবাব দেয় আজিমুন্, কষ্ট তো নয়-ই। একবার খেলে এই দাওয়াইয়ের স্বাদ আর ভোলা যায় না। সমস্ত দিন যেন এর স্বাদ মুখে লেগে থাকে।

তাই নাকি? উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করে রাবেয়া।

রাবেয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টার ছলে আজিমুন্ বললে, তোরও বুঝি খেতে খুব ইচ্ছে করছে রাবেয়া।

বহুদিন পর নবাবজাদীর কণ্ঠে এই ঠাট্টার সুর শুনতে পায় রাবেয়া। হাসি ঠাট্টায় অভ্যস্ত রাবেয়ার কানে মধু ঢেলে দেয় আজিমুনের এই কণ্ঠস্বর। সেও কৃত্রিম ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয়, ইচ্ছে তো করে, নবাবজাদী। কিন্তু উপায় কী?

বেশ তো, কাল সকালে না হয় তুই একটু চেখে দেখবি। হেসে আজিমুন্ বললে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কাঁচুমাচু করে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে রাবেয়া বলে ওঠে, রক্ষে করুন, নবাবজাদী। এ সব নবাবী দাওয়াই কেবল আপনাদের পেটেই সইবে। আমাদের মত দাসী বাঁদীরা এ সব খেলে কি আর রক্ষে আছে? সেই কোন বাদশাহের ফরাসের মত অবস্থা হবে না?

সে আবার কি? প্রশ্ন করে আজিমুন্।

তা' বুঝি জানেন না? তবে বলি শুনুন। একটু থেমে

রাবেয়া আবার সরস ভঙ্গিতে বলতে থাকে, একজন বাদশাহ্ প্রতিদিন একটি করে পান খেতেন। সেই পানের এমনই সুন্দর গন্ধ যে গোটা মহলটাই সেই গন্ধে ম-ম করতো। এমনকি, বাদশাহ যে পানের পিক্ ফেলতেন সেই পিক্ থেকেও ছড়িয়ে পড়ত সেই মনমাতানো গন্ধ। বাদশাহ প্রতিদিন পান খান, পানের পিক্ ফেলেন, আর সেই পিক্ পরিষ্কার করে মহলের এক ফরাস। সেই পিকের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ফরাস প্রতিদিন ভাবতো, এমনি একটি পান যদি সে একদিন খেতে পেতো। রোজই ফরাস এ কথা ভাবে। কিন্তু ভাবলেই তো আর বাদসাহী পান পাওয়া যায় না। একদিন ফরাস পিক্ পরিস্কার করতে গিয়ে দেখতে পায়, পিক্ নেই। কেবল সামান্য চিবানো একটি বাদশাহী পান পড়ে আছে। কি কারণে বাদশাহ্ সেদিন সামান্য চিবিয়েই পানটি ফেলে দিয়েছেন। আনন্দে মনটা নেচে উঠ্ল ফরাসের। একটুও দ্বিধা না করে টপ্ করে পানটি মুখে পুরে দিয়ে মনের আনন্দে চিবোতে লাগল। আর যায় কোথায়। গরমে ফরাসের গা থেকে আগুন বেরোতে লাগল। খুলে ফেলল গায়ের কামিজ, খুলে ফেলল মাথার পাগড়ি, অবশেষে পরণের কাপড়খানাও খুলে ফেলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলে।

রাবেয়ার গল্প বলার সরস ভঙ্গিতে আজিমুন্ খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। রাবেয়াও হাসতে হাসতে বললে, তাই তো বলছিলাম, নবাবজাদী, আমিও হয়ত আপনার দাওয়াই চেখে দেখতে গিয়ে সেই ফরাসের মত—। হঠাৎ হাসি থামিয়ে রাবেয়া বললে, এই দেখুন, গল্প বলতে গিয়ে আপনার নাস্তার কথা একদম ভুলে বসে আছি, নবাবজাদী। বলেই সেখান থেকে দ্রুত উঠে যায় রাবেয়া।

খেতে খেতে রাবেয়ার সঙ্গে আবার গল্প জুড়ে দিল আজিমুন্।

একসময় রাবেয়া আজিমুনের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, নবাবজাদী ?

বল্।

আচ্ছা, সেদিন রাতে প্রথম জেগে উঠে আপনি কাকে খুঁজছিলেন ?

অকস্মাৎ মুখখানা মলিন হয়ে ওঠে আজিমুনের। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে জবাব দেয়, তোকে।

ঝুট্ বললেন, নবাবজাদী। এই বাঁদীর জন্যে আপনার যেন কত দরদ !

সস্নেহ দৃষ্টিতে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে আজিমুন্ বললে, কেন, তোর জন্যে বুঝি আমার একটুও দরদ নেই ?

তা' আছে কি নেই সে হচ্ছে পরের কথা। কিন্তু, আমি ঠিক্ বলে দিতে পারি সেদিন আপনি কাকে খুঁজছিলেন।

বল্ তো কাকে ?

আপনার কুমারকে। রঘুনন্দনজীকে।

মুহূর্তে মুখের ভাব পাল্টে যায় আজিমুনের। সেই হাসিখুশী মুখের উপর একটা কালো পর্দা নেমে আসে যেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে রাবেয়া। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এইসময় নবাবজাদীর কাছে রঘুনন্দনের কথাটা না তুলতেই ভাল হত।

আজিমুন্ কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নেয় নিজেকে। তারপর, মৃদু কণ্ঠে বললে, বলতে পারিস্ রাবেয়া, সে কেমন আছে ?

ওমা, কেমন থাকবেন আবার ? ভালই আছেন। প্রতিদিন

হারেমের প্রধান ফটকে এসে আপনার খবর নিয়ে যান। তবে—। ছুটতে ছুটতে গভীর খাদের সামনে এসে হঠাৎ যেমনি ঘোড়া তার সামনের পা দু'খানার উপর দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত করে নিজেকে সামলে নেয়, ঠিক্ তেমনি ভাবে নিজের জিভখানাকে সংযত করে রাবেয়া।

তবে কী? উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে আজিমুন্।

না, নবাবজাদী। কিছু না। ভালই আছেন তিনি। কথাটা ঢাকতে চেষ্টা করে রাবেয়া।

আজিমুন্ রাবেয়ার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, আমাকে লুকোতে চেষ্টা করিস্ না, রাবেয়া। সত্যি করে বল্ তার কী হয়েছে।

আবার নিজের উপর রাগ হয় রাবেয়ার। নবাবজাদীর মনে এমনি একটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলবার কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু সে ইচ্ছে করে কথার শেষে সেই 'তবে' টুকু যোগ করে নি। আপনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলতে গিয়েই তার মনে হয়েছিল, এতে হয়ত নবাবজাদী মনে আঘাত পেতে পারেন। তাই অকস্মাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

রাবেয়াকে চুপ্ করে থাকতে দেখে আজিমুন্ আবার বললে, দোহাই রাবেয়া। চুপ্ করে থাকিস্ না। সত্যি করে বল তার কী হয়েছে।

না, নবাবজাদী। খোদার কসম্, সত্যি কথা বলছি। রঘুনন্দনজী ভালই আছেন।

তবে—তবে তিনি দরবারের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন।

কেন? বিস্মিত কণ্ঠস্বর আজিমুনের।

একমুহূর্ত চিন্তা করে রাবেয়া। তারপর কাশিমবাজার কুঠী অবরোধ, আর তার পরিণতিতে রঘুনন্দনের উপর

নবাবের সন্দেহ এবং তার চাকুরী পরিত্যাগ করার সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করে।

কথার শেষে রাবেয়া মন্তব্য করে, তা' যা-ই বলুন, নবাবজাদী। নবাবসাহেব হয়ত ভুলই করেছিলেন। কিন্তু আপনার ঐ কুমারের জেদও কম নয়। নবাবের অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই টলাতে পারলে না তাঁকে। গর্ব করে নাকি বলেছিলেন—আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। মুখ দিয়ে যে কথা একবার বেরিয়ে যায় তা' আর কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারি না। এবার আপনিই বলুন, নবাবজাদী, মানুষের এত জেদ কি ভালো?

আজিমুন্ কোন মন্তব্য না করে চুপ করে থাকে।

১৪

নবাবজাদী আজিমুনের ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই রাজধানীতে বৃদ্ধ হেকিম সুফীর প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারা হেসে মন্তব্য করে, বাইরে থেকে দেখে কি মানুষ চেনা যায়? হেকিম সুফীর সমালোচনাকারীরাও বলে, তা' অবশ্য ঠিক্। ঐ পাগলা বুড়োটা যে এমনি একটা কাণ্ড করে বসবে তা সত্যিই ধারণার অতীত। রাজ্যের বড় বড় হেকিম কবিরাজেরা যেখানে হার স্বীকার করে গেলেন, সেখানে ঐ বুড়োটার এই সাফল্য সত্যিই অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

রাজ্যের অন্য হেকিম কবিরাজেরাও বিস্মিত। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। হেকিম সুফী কোন্ কিতাবে ঐ দাওয়াইয়ের হদিশ পেলেন? তাঁরাও তো কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি কম করেন নি। আর দাওয়াইটাই বা কী ধরণের? কী দিয়ে তা' তৈরি?

কিন্তু এর চাইতেও অদ্ভুত হেকিম সুফীর চরিত্রের পরিবর্তন। যেদিক থেকে নিজেকে একেবারেই গুটিয়ে নিয়েছে হেকিম সুফী। ক্বচিৎ বাইরে বেরোয়। কথা বলে কম। তার অনর্গল কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। দিনরাত নিজের কুঠীতে বসে কি যেন চিন্তা করে। আর মাঝে মাঝে বলে ওঠে, আল্লা মেহেরবান!

খোদ্ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ একদিন তার সেই ভাঙ্গা কুঠীতে এসে হাজির হয়েছিলেন। অকৃত্রিম কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন হেকিম সুফীর কাছে। প্রচুর ইনাম দিতে চেয়েছিলেন তাকে। কিন্তু সেই ইনাম বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে নবাবকে বলেছিল, আজ নয়, জাঁহাপনা। এখনও সময় হয়নি। আগে নবাবজাদী সম্পূর্ণ সেরে উঠুন।

একটু থেমে হেকিম সুফী আবার বলেছিল, তা' ছাড়া সোনা চাঁদির আমার প্রয়োজন কী, জাঁহাপনা? একা মানুষ। বুড়ো হয়েছি, আর দু'দিন বাদেই তো কবরে যেতে হবে। আর নবাবজাদীকে সারিয়ে তুলতে পেরে আমার নিজের লাভও তো কম হয়নি।

আপনার আবার কী লাভ হ'ল, হেকিম সাহেব? প্রশ্ন করেছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। জবাব দিয়েছিল বৃদ্ধ হেকিম সুফী, হেকিম কবিরাজের কাছে এর চাইতে বড় লাভ আর কিছু হতে পারে না, জাঁহাপনা। এককালে কিতাবেই কেবল এই দাওয়াইয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে পড়েছিলাম। এই দাওয়াই প্রয়োগের সুযোগ কোনদিন পাইনি। শুধু আমি কেন, দুনিয়ার কোন হেকিম কবিরাজেরই বোধ হয় এই সুযোগ কোনদিন আসে নি। আপনার বেটীর উপর প্রয়োগ করবার সেই সুযোগ আমি পেলাম। চিকিৎসকের কাছে এর চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কী থাকতে পারে?

নবাবজাদী আজিমুনের ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার খবর যথাসময়ই পৌঁছেছিল রঘুনন্দনের কাছে। মনে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করেছিল রঘুনন্দন। একটা সাংঘাতিক উৎকণ্ঠার অবসান হল এতদিনে। শয়নে স্বপনে মনের মধ্যে যে কাঁটাটা সর্বদা খচ্ খচ্ করছিল, সেটার অস্তিত্ব যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। আজিমুন্ ভাল হয়ে উঠ্ছে—সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠ্বে, এই খবরটুকুই তার যথেষ্ট। আজিমুন্ সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি কিছু জানতে সে চায় না। জানবার অধিকারও নেই। সে নিজেই সেই অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। আজিমুন্‌কে সে কোনদিনই পাবে না। স্বধর্ম ত্যাগ করে প্রেয়সীকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাওয়ার চাইতে না পাওয়া অনেক ভাল। তাতে আর কিছু না হোক্ বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আজিমুন্ সুস্থ হয়ে উঠুক, আজিমুন্ ভাল থাকুক—একটুকুই কেবল তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। ভাগীরথীর জলে গলা ডুবিয়ে প্রভাতসূর্যকে প্রণাম করতে করতে সেই প্রার্থনাই জানায় রঘুনন্দন।

রঘুনন্দনের এখন প্রচুর অবসর। পূজো আহ্নিক আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই এখন সময় কেটে যায় তার। আবশ্যকও তার সামান্যই! সংসারে মাত্র দু'টি প্রাণী। বিধবা মা আর সে নিজে। রাজদরবারে এতদিন চাকুরী করে সে যা যৎসামান্য জমিয়েছে, তাতেই অনায়াসে চলে যাবে তাদের। প্রয়োজন যেখানে কম, দুশ্চিন্তা সেখানে সামান্যই।

এ ছাড়া আরও একটি জিনিস সে রীতিমত চর্চা করে এসেছে। সেটি হচ্ছে দেহচর্চা। এই জিনিসটি তার বরাবরের সঙ্গী। এই জিনিসটির দৌলতেই তার ঐ সুগঠিত দেহ। তার দৈহিক শক্তি সারা রাজধানীর একটা আলোচনার বস্তু।

এই নিয়েই বেশ চলে যাচ্ছে রঘুনন্দনের। আপনার মনে আপনি পরিতৃপ্ত। আপনার ভাবনাতেই আপনি সমাহিত। মাঝে মাঝে অবশ্য নবাবজাদী আজিমুনের কথা মনে পড়ে মনটা সামান্য একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মনের সেই প্রবল ইচ্ছাকে কঠিন শাসনে শৃঙ্খলিত করে রাখে রঘুনন্দন। মনে মনে ভাবে, এই ভালো। আজিমুন্ যেখানেই থাকুক, যার কাছেই থাকুক তার মনের আসনে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। সেখান থেকে কেউ কোনদিন তাকে সরাতে পারবে না। এইভাবেই সে অনায়াসে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

আজিমুনের ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভের খবরে রাজধানীর আরও যে ব্যক্তিটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, সে হচ্ছে নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান। সে জানে, ইচ্ছে করলেই সে নবাবজাদীকে নিজের জীবন-সাঙ্গনী করতে পারে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে নিজের সম্মতির কথা মুখ ফুটে বললেই নবাব নিশ্চিত রাজি হবেন। কিন্তু তা' সে বলবে না। যে নারী স্বেচ্ছায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই নারীকে তার মতের বিরুদ্ধে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার মধ্যে আর যাই থাক না কেন কোন পৌরুষ নেই। এমনকি সেটা তার পৌরুষের চরম অপমান।

কিন্তু এত ভেবেও মহম্মদ জানের ভালবাসার স্রোতে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। সেই স্রোত যাকে ঘিরে সর্বদা বয়ে চলেছে সে ঐ নবাবজাদী আজিমুন্ ছাড়া আর কেউ নয়। আজিমুনের প্রতি ভালবাসায় সে পাগল, তার প্রতি আকর্ষণে সে উন্মত্ত। কিন্তু সেই উন্মত্ততার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই।

তাই, আজিমুনের অসুস্থতায় মহম্মদ জান বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেও নিজের মনের মধ্যেই সেই বিভ্রান্তি চেপে রেখে নিজের কাজ করে যায় কেবল। মুখ দেখে তার মনের ভাব ধরা যায় না কোন কালেই। তেমনি তার সুস্থ হয়ে ওঠার খবরেও মনে মনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা' যেন ঠিক অবিমিশ্র পুলক নয়। তার মধ্যে কেবল যেন একটা অভিমান লুকিয়ে রয়েছে। একটি শঙ্কামিশ্রিত অভিমান।

নিজের মনেই হেসে ওঠে মহম্মদ জান। এটা তার মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে মাঝে একটা অপরাধ-বোধের গ্লানি যেন গ্রাস করতে চায় তার সারা মনটাকে। পরক্ষণেই সেই গ্লানিটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়ায় মহম্মদ জান। একটা প্রচণ্ড ছদ্ম গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে নিজের মনের কামনা বাসনা, সুখ দুঃখ, এমনকি হাসি অশ্রুকেও।

তেরো

মৃত্যুভয়ে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই ভীত। কিন্তু সেই মৃত্যুভয়ের সঙ্গে যদি কোন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড জড়িত থাকে, তবে সেই ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

ইদানীং রাজধানী মুর্শিদাবাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। রাজধানীর অলিতে-গলিতে, পান-ভোজনশালায় কিংবা সরাইখানায় সকলের মুখেই কেবল ঐ একই সাবধান বাণী—হুশিয়ার! রাতের অন্ধকারে একা

রাজপথে বেরিও না। যে কোন মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে তোমার মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর দূত যে কোথায় কী ভাবে ওৎ পেতে বসে আছে তা' কেউ বলতে পারে না।

নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে কোন উন্মাদের কাণ্ড। আবার কেউ বলে, এর মধ্যে মানুষের কোন সম্পর্কই নেই। সবই ভূত প্রেত দৈত্য দানার অলৌকিক ব্যাপার। নইলে অমন শক্ত সমর্থ জোয়ান লোকগুলোকে এমনিভাবে ঘায়েল করা কি সম্ভব? কেউ আবার সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে দায়ী করে কাশিমবাজার কুঠীর ফিরিঙ্গী সাহেব রবার্ট হেজেসের সেই ফেলে যাওয়া বিলিতি কুকুরটাকে। তারা বলে, কপালে সেই গুলির দগ্‌দগে ঘা নিয়ে দিনের বেলা কুকুরটা লুকিয়ে থাকে কোন গোপন আশ্রয়ে। অন্ধকার রাতে হিংস্র বিলিতি কুকুর রাজপথে বেরিয়ে এমন নৃসংশ কাণ্ড করে বেড়ায়।

এই ঘটনার পিছনে লৌকিক অলৌকিক যা-ই কিছু ক্রিয়াকলাপ লুকিয়ে থাকুক না কেন, এটা প্রত্যক্ষ সত্য যে নগরীর রাজপথে একটি করে হতভাগ্যের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় প্রতিদিন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাগরিকেরা জানতে চেষ্টা করে, আজ রাজধানীর কোন্ হতভাগ্যের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল।

ভূত প্রেত কিংবা কোন উন্মাদ মানুষ—যে-ই এই কাজের জন্য দায়ী হোক না কেন, তার এই কাজের মধ্যে কিন্তু একটা ধারা বর্তমান। শৃঙ্খলাহীন এলোমেলো ভাবে সে কাজ করে না মোটেই। প্রতিদিন একাধিক ব্যক্তিকেও সে হত্যা করে না। ধনী গরীব ভেদাভেদ নেই তার কাছে। রাজপুরুষ থেকে পথের ভিখারী যে কেউ তার রাতের শিকার হতে পারে।

হত্যাকাণ্ডের পদ্ধতিও অভিনব। সেই হত্যাকারীর লক্ষ্যস্থল তার বক্ষদেশ। কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে হতভাগ্যর বুকটা সে ছিন্নভিন্ন করে রেখে যায় নির্মমভাবে। রাজপথের পাশে কিংবা কোন গাছের তলায় রেখে যায় সেই রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। আবার সময় সময় মনে হয়, কোন ধারাল অস্ত্র নয়, কেবলমাত্র সুতীক্ষ্ণ নখের আঘাতেই সেই হতভাগ্যর বুকটা ছিন্নভিন্ন করে রেখে গেছে সেই দানব। নির্মম আক্রোশে খাব্‌লে খাব্‌লে তুলে নিয়েছে বুকের মাংস।

মানুষ, ভূতপ্রেত কিংবা কোন পশু যে-ই এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক হোক না কেন, তাকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখতে পায়নি। অবশ্য রাজধানীর অনেকেই নাকি দাবী করে তারা স্পষ্ট দেখেছে সেই হত্যাকারীকে। কেউ বলে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নাকি দৈত্যের মত একটা লোক ঘুরে বেড়ায় রাজপথে। মুখখানা নাকি তার ভয়ঙ্কর বীভৎস। আবার কেউ বলে, না মানুষ নয়, একটা কালো রংয়ের হিংস্র কুকুর। চোখ দুটো তার আগুনের ভাঁটার মত সর্বদা জ্বলছে। লক্‌লকে জিভটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। বিদ্যুৎবেগে নাকি ছুটে চলে সেই বিলিতি কুকুর। শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথচারী কোন হতভাগ্যর উপর। টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পায় না সেই হতভাগ্য। দারুণ আক্রোশে সেই কুকুর নাকি তার চক্‌চকে দাঁত ও ধারাল নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে সেই ব্যক্তির বক্ষদেশ। তারপর একসময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায় নিজের গোপন আস্তানায়।

এই অস্বাভাবিক নরহত্যা সম্বন্ধে এমনি নানাধরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর চারিদিকে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে

নাগরিকেরা। সংক্রামক ব্যাধির মত সেই ভয় গ্রাস করে তাদের। অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার আগেই দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সকলে। যারা তা' পারে না, তারাও রাত্রে রাজপথে একা বেরোয় না। দল বেঁধে চলাফেরা করে, এমন কি নগর-প্রহরীরা পর্যন্ত দল বেঁধে পাহারা দিয়ে বেড়ায় রাজপথে। কি জানি, বলা তো যায় না। কখন সেই মানব কিংবা দানবের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে তার ঠিক কী ?

নগর কোতোয়াল হিসেবে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায় দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে মহম্মদ জানের উপর। দুশ্চিন্তায় তার গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। রাতের প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়েও কোন কূলকিনারা করতে পারে না মহম্মদ জান। অধস্তন কর্মচারীদের উপর কঠিন হয়ে ওঠে। কড়া নির্দেশ দেয় তাদের—যে করেই হোক্ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু কোনই ফল হয় না তাতে। প্রতিদিন রাতে একটি করে নরহত্যা সমানেই চলতে থাকে।

দশ দিন কেটে গেছে। এই দশ দিনে রাজধানীর পথে দশটি নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই হত্যাকারী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান।

কথাটা একদিন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কানে ওঠে। চেহেল সেতুনের দরবার কক্ষে রাজ্যের একজন খান্-ই-খানান্ কথাটা তোলেন।

একটা অসন্তুষ্টির ছায়া পড়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মুখের

ওপর। চোখ তুলে তিনি তাকান কোতোয়াল মহম্মদ জানের দিকে।

অপরাধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে নবাবকে কুর্নিশ করে মহম্মদ জান।

প্রশ্ন করেন নবাব, যা শুনছি তা' কি সত্যি মহম্মদ ?

হ্যাঁ জাঁহাপনা, সত্যি। মহম্মদ জান জবাব দেয়।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মুর্শিদকুলী খাঁর। আবার প্রশ্ন করেন তিনি, এমন একটা ঘটনার কথা আমাকে জানাবার প্রয়োজন মনে করোনি তুমি ?

নবাবের কণ্ঠে স্পষ্ট কৈফিয়ত তলবের সুরে একটু চমকে ওঠে মহম্মদ জান। চেহেল সেতুনে বসে সকলের উপস্থিতিতে নবাব যে এমনি ভাবে তার কৈফিয়ত তলব করবেন তা' সে ধারনাই করতে পারে নি।

তাই, একটু সময় চুপ করে থেকে সে জবাব দেয়, প্রয়োজন মনে করলে জাঁহাপনাকে জানাতে কোন বাধা ছিল না। ভেবেছিলাম, এসব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে জাঁহাপনাকে বিরক্ত করা বোধ হয় সমীচীন হবে না।

সাধারণ ব্যাপার ? রাজধানীর পথে প্রতিদিন একটি করে নরহত্যা হচ্ছে, এটাকে তুমি সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে কর ?

সত্যিই কি ব্যাপারটা অসাধারণ, জাঁহাপনা ? আপনি গোটা মুল্লুকের মালিক, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। এর মধ্যে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে যদি আপনাকে বিরক্ত করতে হয় তো আমরা কি জন্যে আছি ?

কিন্তু থেকেই বা তোমরা কী করতে পেরেছ ? রাজধানীতে প্রতিদিন একটা করে লোক খুন হবে আর তোমরা শুধু দর্শকের

মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবে ? কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে না ?

চেষ্টা করছি, জাঁহাপনা। বিশ্বাস করুন, আপ্রান চেষ্টা করছি। কিন্তু—

কিন্তু হত্যাকারীকে ধরা যাচ্ছে না, তাই তো ? নিজেই কথাটার পদ পূরণ করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে থাকে মহম্মদ জান।

কে এই হত্যাকারী, কী তার হত্যার উদ্দেশ্য কিছু জানতে পেরেছ ? প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

মাথা নেড়ে জবাব দেয় মহম্মদ জান, এখনও কিছুই জানতে পারিনি, জাঁহাপনা। আপাতদৃষ্টিতে হত্যার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবে হত্যাকারীকে খুঁজে পেলে হয়ত তার উদ্দেশ্যও কিছু টের পাওয়া যেত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগছে, জাঁহাপনা। কেমন যেন রহস্যময়।

কেন, রহস্যময় বলছ কেন ?

একটু চিন্তা করে মহম্মদ জান জবাব দেয়, হত্যাকারী দিনের পর দিন এমনি নরহত্যা করে চলেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় নি। হত্যাকারী মানুষ না জানোয়ার, না কোন জীন, তাও আজ পর্যন্ত বোঝা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময়।

একটু ভেবে মুর্শিদকুলী খাঁ বললেন, সে যাই হোক, এই জঘন্য নরহত্যা বন্ধ করতেই হবে। রাজধানীর নাগরিকেরা রাত্রে পথে বের হতে পারবে না, এমন একটা অবস্থা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজি নই। যে করেই হোক, যেমনি ভাবে পারো তিনদিনের মধ্যে সেই নরহত্যাকারীকে জীবিত

কিংবা মৃত অবস্থায় আমার সামনে হাজির করতে হবে, এই আমার আদেশ।

কোতোয়াল মহম্মদ জান আবার নবাবকে কুর্নিশ করে করে বললে, জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য। চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না আমার। কোন মানুষ, তা' সে প্রকৃতিস্থই হোক্ আর উন্মাদই হোক্, যে এর জন্যে দায়ী, তাকে জাঁহাপনার সামনে এনে হাজির করতে চেষ্টা করবো। তবে——। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় মহম্মদ জান।

প্রশ্ন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ, তবে কী?

জবাব দিতে একটু দ্বিধা করে কোতোয়াল। একটা ঢোক গিলে নবাবের দিকে একবার তাকায়। তারপর আবার বলে, কিন্তু মানুষ না হয়ে, সত্যিই যদি কোন ভূত প্রেত কিংবা কোন দত্যি দানব এর পেছনে থাকে তো—।

মুর্শিদকুলী খাঁর ঠোঁটের কোনে একটু হাসি দেখা দেয়। জবাব দেন তিনি, রাজধানীর লোকেরা কি সত্যিই ওসবে বিশ্বাস করে?

কেউ কেউ নিশ্চয়ই করে, জাঁহাপনা। তা' ছাড়া কাশিমবাজার কুঠীর ফিরিঙ্গীদের সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটার কথাও কেউ কেউ বলে।

সেই কুত্তাটাকে তার পর থেকে কেউ কি দেখেছে?

বোধ হয় না, জাঁহাপনা। অবশ্য, দু'একজন বলে যে, তারা নাকি দেখেছে। কিন্তু তাদের কথা বিশ্বাস করার মত তেমন কোন প্রমাণ আমি পাই নি।

পাবেও না। আসলে ফিরিঙ্গীদের ঐ ভয়ঙ্কর কুত্তার ব্যাপারটা একেবারেই রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ

ভূত-প্রেত, দত্যি-দানার ব্যাপারটাও ভীতসন্ত্রস্ত নাগরিকদের উর্বর মস্তিস্কের একটা উদ্ভট কল্পনা।

নবাবের কথায় কোন মন্তব্য না করে চুপ্ করে থাকে মহম্মদ জান।

বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলী খাঁ একবার মহম্মদ জানের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার প্রশ্ন করেন, ওসব আজগুবি ব্যাপারে তোমারও বিশ্বাস আছে নাকি, মহম্মদ ?

জবাব দেয় কোতোয়াল, জাঁহাপনা হয়ত ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভূত-প্রেত দত্যি-দানায় বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস কোনটাই আমি করি না।

বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ কোনদিন পেয়েছ কি ? নবাব জিজ্ঞাসা করেন।

অবিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণও পাইনি কোনদিন, জাঁহাপনা।

তা'হলে তোমার ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোন অলৌকিক ব্যাপার থাকতে পারে ?

মহম্মদ জান বললে, না থাকতে পারার কোন কারণ আমি অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা। তবে আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। কোন মানুষের হাতও থাকতে পারে এর পেছনে।

আবার একটু সময় চিন্তা করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। একবার উপবিষ্ট উজিরের দিকে তাকান। কিন্তু বৃদ্ধ উজিরের মুখখানা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চেহেল সেতুনের দরবার কক্ষে উপবিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু তাদের মুখেও বিশ্বাস অবিশ্বাসের একটা মিশ্রভাব লক্ষ্য করেন তিনি।

অবশেষে কোতোয়াল মহম্মদ জানের দিকে তাকিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ আবার বললেন, মানুষই হোক্ আর ভূত-প্রেতই হোক্, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তোমাকে বন্ধ করতেই হবে। হত্যাকারীকে ধরে আনা চাই-ই চাই। আমার রাজধানীতে এমন অরাজকতা কিছুতেই চলতে পারেনা।

মহম্মদ জান এবার আর কোন জবাব না দিয়ে কেবল দীর্ঘ কুর্নিশ করে ধীরে ধীরে নিজের আসনে বসে পড়ে। তার চিন্তাভারাক্রান্ত মুখে উদ্বেগের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশ—তিনদিনের মধ্যে হত্যাকারীকে ধরতে হবে। কিন্তু,—কী করে? কোন্ উপায়ে?

মহম্মদ জান কিন্তু ভালমতই জানে, তিনদিনের মধ্যে নবাবের আদেশ প্রতিপালন করা একেবারেই অসম্ভব। সময় চাই তার। খুব ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করে এগোতে হবে তাকে। অপরাধের সূত্র ধরে খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। নইলে, তার সমস্ত ব্যবস্থাই পণ্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশ প্রতিপালিত হল না। ধরা পড়ল না সেই নৃসংশ হত্যাকারী। প্রতিদিন একটি করে নিরপরাধ মানুষ তার শিকার হতে থাকে নিয়মিত। আর নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে কোতোয়াল মহম্মদ জান।

নিজের আদেশের কথা ভুলে যাননি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তৃতীয় দিনও ধরা পড়ল না সেই নরহত্যাকারী। মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে

উঠ্‌লেও কোতোয়াল মহম্মদ জানকে তিনি আরও দুটো দিন সময় দিলেন।

অবশেষে পঞ্চম দিনে তিনি নিজের বিশ্রাম-কক্ষে ডেকে পাঠালেন তাকে।

মহম্মদ জান কাছে এসে দাঁড়াতেই নবাব তীব্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ পনের দিন হল রাজধানীর পনেরটি নিরীহ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। অতি নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আমার রাজ্যে এত ফৌজ সিপাহী থাকতেও সেই শয়তানকে আজও কব্‌জা করা গেল না। সে নিশ্চিন্ত মনে রাজধানীর বুকের উপরে বসে খুনখারাবী চালিয়ে যাচ্ছে। আমার এই রাজধানীর জৌলুস বিলকুল বর্‌বাদ্‌ হয়ে গিয়ে এক বেওকুফ্‌ শয়তানের হাবেলীতে পরিণত হতে চলেছে। প্রজারা আমার এলেমের উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। এমনি একটা অবস্থা আমাকে আর কতদিন সহ্য করতে হবে, বলতে পারো?

বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয় মহম্মদ জান, বোধহয় আর বেশিদিন নয়, জাঁহাপনা।

তার মানে? চিৎকার করে ওঠেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

নবাবের চিৎকারে চম্‌কে ওঠে মহম্মদ জান। তাঁর এমন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর অনেকদিন শুনতে পায় নি সে। নিজেকে সাংঘাতিক অপমানিত মনে হয় তার। অক্ষমতার তীব্র আক্রোশে মনটা জ্বলতে থাকে।

নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি শান্ত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, সামান্য কিছু সূত্র হাতে পেয়েছি, জাঁহাপনা। সেই সূত্র ধরে অনুসন্ধান করছি আমি। জানিনা, হত্যাকারীকে কব্‌জা

করতে পারবো কিনা। তবে এই নরহত্যা যে অচিরেই বন্ধ হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কবে—কবে বন্ধ হবে? কতদিনে এই লজ্জা থেকে আমি মুক্তি পাবো? তুমি—তুমি নির্বোধ, তুমি সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। তাই, কিছুই করতে পারছো না। রাজ্যের তামাম ফৌজ সিপাহী নিয়োগ করেও সেই দুষমনকে পাকড়াও করতে পারছো না। এতদিন তোমার কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি যে ধারণা করেছিলাম, তা আগাগোড়াই ভুল। তুমি সত্যিই কোতোয়াল পদের অনুপযুক্ত।

সাংঘাতিক অপমান। নবাবের কাছে এমনিভাবে অপমানিত হবার কথা স্বপ্নেও কোনদিন ঠাঁই পায় নি তার মনে। প্রচণ্ড ক্রোধে মহম্মদ জানের ফর্সা মুখখানা টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় ঠোঁট দুখানা থর থর করে কাঁপতে থাকে। সেই মুহূর্তে চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়াই তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত। আর, সেটাই তার স্বভাবের সঙ্গে মানাতো।

কিন্তু তার বদলে কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে নিজের চাকুরী বাঁচাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে মহম্মদ জান। নবাবের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে গিয়ে জিভ আড়ষ্ট হয়ে উঠলেও প্রবল শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলতে হয় তাকে, আমাকে এবারের মত ক্ষমা করুন, জাঁহাপনা। আর মাত্র এক পক্ষকাল সময় দিন আমাকে। এর মধ্যে যদি এই নরহত্যা বন্ধ করতে না পারি তো আমাকে বরখাস্ত্ করবেন।

কথাটা নবাবের কানেও কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। চিরকালের তেজস্বী চরিত্রের এই অসাধারণ যুবাপুরুষটির মুখে এমনি অতি সাধারণ কথায় বিস্মিত হন তিনি। মনে মনে

একটু ব্যথিত হন। এর চাইতে মহম্মদ জান যদি বলতো—আমি এই মুহূর্তে চাকুরীতে ইস্তফা দিচ্ছি। আপনি আমার চেয়ে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদে অনায়াসে নিয়োগ করতে পারেন—তাহলে বোধহয় সন্তুষ্ট হতেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। মহম্মদ জানের মুখে এমনি একটা জবাব-ই বোধহয় আশা করেছিলেন তিনি।

নিজেকে সামলে নেন মুর্শিদকুলী খাঁ। আশাহত দৃষ্টিতে তিনি তাকান কোতোয়াল মহম্মদ জানের মুখের দিকে। সেই দৃষ্টিতে যেন একটু তাচ্ছিল্যের ভাবও ফুটে ওঠে।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, কিন্তু এই পক্ষকালের মধ্যে আরও কতগুলো নিরীহ নাগরিকের প্রাণ যাবে ?

বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আর্ত কণ্ঠে বলতে থাকে মহম্মদ জান, আমি চেষ্টার কোনই ত্রুটি করছি না। সম্ভব হলে এই পক্ষকাল শেষ হবার আগেই এ হত্যাকাণ্ড আমি বন্ধ করবো। আপনি মেহেরবান্। দয়া করে এইটুকু সময় আমাকে দিন। বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মানুষের কণ্ঠ থেকে কাপুরুষোচিত শব্দ নিসৃত হলে তার অনুরাগী ব্যক্তিদের মনে প্রশংসার পরিবর্তে যে ঘৃণার ভাব উদয় হয়, মহম্মদ জানের কথার ভঙ্গিতে তার উপর তেমনি ঘৃণা জন্মে মুর্শিদকুলী খাঁর।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, বেশ, তোমাকে এক পক্ষকাল সময় দিলাম। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! আর একটি মুহূর্তও সময় দেব না তোমাকে। এর মধ্যে যদি সেই দুষমন্‌কে শায়েস্তা করতে না পারো তো তোমাকেই কঠিন শাস্তি পেতে হবে, মনে থাকে যেন।

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে কোতোয়াল মহম্মদ জান। সহস্র অপমান সহ্য করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল।

চোদ্দ

নবাবজাদী আজিমুন্ এখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার দেহে লাবণ্যের জোয়ার লেগেছে আবার। তার অপূর্ব সুষমামণ্ডিত মুখে ফিরে এসেছে পূর্বের সেই দীপ্তি। আয়ত চোখে সেই হরিণচকিত দৃষ্টি। গোলাপের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটে আবার সেই রক্তের আভা। সারা অবয়বে পূর্বের সেই যৌবনের হাতছানি।

হেকিম সুফীর সেই আশ্চর্য দাওয়াই নিয়মিত চল্‌ছে। স্বাদে গন্ধে দাওয়াই সত্যিই অতুলনীয়।

মাঝে মাঝে হেসে আজিমুন্ রাবেয়াকে বলে, হিন্দুরা মনে করে, স্বর্গের দেবতারা নাকি অমৃত খেয়ে অমর হয়েছে। অমৃত খেয়ে সত্যিই অমর হওয়া যায় কিনা জানি না। সেই অমৃতের স্বাদ-ই বা কেমন, তা-ও আমার জানা নেই। তবে, হেকিম সুফীর এই দাওয়াইয়ের স্বাদ বোধহয় অমৃতের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। অমর না হলেও এই দাওয়াই-ই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। মৌলবী মোল্লা জিন্দপীরের দোয়া যা করতে পারেনি, সোনা চাঁদি জহরতের লোভে ছুটে আসা হেকিম কবিরাজের যা ক্ষমতার বাইরে ছিল, ঐ পাগলা বুড়ো হেকিম সুফীর এই আশ্চর্য দাওয়াই তা' সম্ভব করেছে। আমার কাছে এই দাওয়াই সত্যিই অমৃত।

রাবেয়া ঠাট্টার সুরে জবাব দেয়, তবে আর চিন্তা কী, নবাবজাদী? এই অমৃত খেয়ে হিন্দুদের দেবতার মত অমর

না হলেও খুব শিগ্‌গিরই আপনি বেহেস্তের হুরী হয়ে উঠবেন। মনের সুখে ঘুরে বেড়াবেন বেহেস্তের আনন্দলোকে।

কাজ নেই আমার বেহেস্তের আনন্দলোকে। মুখভঙ্গি করে জবাব দেয় আজিমুন্‌। এই পৃথিবীই আমার ভালো। স্বর্গই বলিস আর বেহেস্তই বলিস, আমার মনে হয় এই পৃথিবীর চেয়ে কোনটাই তেমন ভালো নয়। ইচ্ছে করলে, এই পৃথিবীটাকেই আমরা বেহেস্ত বানিয়ে তুলতে পারি, আবার ইচ্ছে করলে দোজখের বিষও টেনে আনতে পারি এখানে।

তা' যা বলেছেন, নবাবজাদী। দেখতে দেখতে আমাদের এই রাজধানীও একটা দোজখে পরিণত হতে চলেছে। বিপন্ন হয়ে উঠেছে নাগরিকদের জীবন—।

কেন, কী হয়েছে?

সেকি! আপনি শোনেননি, নবাবজাদী? রাজধানীতে প্রতিদিন একজন করে নিরীহ নাগরিক নিহত হচ্ছে। কেউ বলে, কোন উন্মাদের কাণ্ড এটা। কেউ বলে, কাশিমবাজার কুঠীর ফিরিঙ্গীরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় যে ভয়ঙ্কর কুকুরটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেটাই নাকি এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ বলছে, এসব নাকি ভূতপ্রেত দৈত্যদানার কাণ্ডকারখানা!

তা, নগর কোতোয়াল কী করছে? প্রশ্ন করে আজিমুন্‌।

তিনি তো আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছেন না। নবাবসাহেব তাঁর উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন তাকে। কিন্তু কোতোয়াল নাকি নবাবের হাতে পায়ে ধরে আরও এক পক্ষকাল সময় নিয়েছেন।

বলছিস্ কি তুই ?

হ্যাঁ, নবাবজাদী। তাই তো শুনলাম।

একটু থেমে রাবেয়া আবার বললে, আমার কিন্তু অন্যরকম সন্দেহ হয়, নবাবজাদী।

কী সন্দেহ ? প্রশ্ন করে আজিমুন্।

একমুহূর্ত চুপ্ করে থেকে আজিমুনের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে রাবেয়া। তারপর বললে, আমার মনে হয়, কোতোয়াল ইচ্ছে করেই এই নরহত্যা বন্ধ করছেন না। নইলে, তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি তামাম সিপাহী ফৌজ নিয়েও যে এটা বন্ধ করতে পারছেন না, তা' সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি না।

নতমুখে বসে রাবেয়ার কথা শুনছিল আজিমুন্। রাবেয়া থামতেই সে মুখ তুলে শান্ত কণ্ঠে বললে, তাতে তাঁর লাভ ?

জবাব দেয় রাবেয়া, দেখুন নবাবজাদী, লাভ লোকসানের কথা ঠিক্ বলতে পারি না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, নবাবজাদার সেই ঘটনাটার পর থেকেই কেন যেন ঐ কোতোয়ালকে আমি ঠিক্ বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হয়, ওঁর সব কাজের পিছনেই যেন কিছু উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।

কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

পারে তো অনেক কিছুই, নবাবজাদী। এই ব্যাপারটাই ধরুন না। রাজধানীতে দিনের পর দিন যদি এমনিভাবে নরহত্যা চল্‌তে থাকে, মানুষের জান যদি খোলামকুচির মত পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খায়, তবে প্রজারা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে নবাবের উপর। এমন কি তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তেও পারে। হয়ত কোতোয়াল তাই চান। কে

বলতে পারে, এমনি একটা হীন উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সেই হত্যাকারীকে হাতে পেয়েও ধরছেন না ?

আজিমুন্ আর কিছু না বলে অধোবদনে চুপ. করে থাকে। রাবেয়া লক্ষ্য করে, কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে তার মুখের উপর।

রাজধানী মুর্শিদাবাদে দারুণ উত্তেজনা। কোতোয়াল মহম্মদ জানের অকর্মণ্যতার কথা নাগরিকদের মুখে মুখে। নবাবের কাছে এক পক্ষকাল সময় নিয়েও কিছুই করতে পারছে না সে।

কোতোয়াল মহম্মদ জানের কর্তব্যপরায়ণতা, তার দায়িত্ব-বোধ, তার সাফল্য রাজধানীর জনসাধারণের কাছে একটা গর্বের বস্তু ছিল। তাকে নিয়ে সত্যিই তাদের গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু সেই মহম্মদ জান-ই যখন এই নরহত্যার কোন কুলকিনারা করতে পারল না, তখন তারাই হয়ে উঠ্ল তার কঠিন সমালোচক। কিন্তু জীবনভোর যে একটা মানুষ বরাবর সাফল্যের জয়তিলক ললাটে ধারণ করতে পারে না, মাঝে মধ্যে তাকেও যে অসাফল্যের কলঙ্ক স্পর্শ করতে হয়, সেকথা সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভুলে যায় তারা। সমালোচনার কঠিন আঘাতে জর্জরিত করতে থাকে তাকে। এটাই নিয়ম। জনগণের এটাই চরিত্র।

দেখেও দেখছেন না কিছু, শুনেও শুনছেন না নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি নিজের মুখে এক পক্ষকাল সময় দিয়েছেন মহম্মদ জানকে। সেই পক্ষকাল পূর্ণ হতে আর মাত্র একটি দিন অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে বিরাম-হীনভাবে রাজধানীতে নরহত্যা সংঘটিত হয়ে চলেছে। প্রতিরোধ করতে পারে নি মহম্মদ জান। হত্যাকারীকে

কব্‌জা করা তো দূরের কথা, সে তার কোন খোঁজ পেয়েছে বলেও মনে হয় না। কোনরকম অলৌকিক কিছু না ঘটলে বাকি সময়টুকুর মধ্যে মহম্মদ জানের পক্ষে কিছু করে ওঠা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে ব্যাপারে মুর্শিদকুলী খাঁ নিঃসন্দেহ। তাই তিনি বাকি সময়টুকুও ধৈর্য ধরে থাকতেই মনস্থ করেন।

অপরাহ্নে নবাবজাদী আজিমুনের মহলে প্রবেশ করেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

মহলের পিছন দিকে দুষ্প্রাপ্য ফুল ও ফলের বাগানে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আজিমুন্। চারিদিকে রং বেরংয়ের ফুলের সমারোহ। তারই মধ্যে একটি অতিরিক্ত প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে।

পরিচারিকা রাবেয়াও সঙ্গে সঙ্গে ফিরছিল এতক্ষণ। মাত্র খানিকক্ষণ আগে বাগানের মধ্যে একখানা পাথরের উপর বসে পড়ে ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলে উঠেছিল, আপনার সাথে এত দৌড়াদৌড়ি করার মত হিম্মৎ আমার নেই, নবাবজাদী। আমি এই বসলুম।

বেশ তো, তুই বসে থাক্ না। কে তোকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে হুকুম দিচ্ছে ?

কে আবার দেবে ? যাঁর গরজ তিনিই দিচ্ছেন।

মিথ্যে কথা বলবি না, মুখপুড়ী। আমি তোকে সঙ্গে আসতে বলেছি ? তোকে সঙ্গে নিয়ে চলার যেন কতই আমার গরজ ! কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ পায় আজিমুনের কণ্ঠে।

হায় আল্লা ! এ কী শুনছি নবাবজাদীর মুখে ? ভাবলাম, মাথার উপর পরিষ্কার আকাশ—সেই আকাশে অস্তগামী সূর্য। মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়া। এই সময় এমনি সুন্দর

ফুলের বাগানে আমাকে সঙ্গে নিয়েই নবাবজাদী দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবেন। তা' নয় তো, শুধু শুধু আমাকে দুষছেন!

তুই একেবারেই অপদার্থ, রাবেয়া।

কেন নবাবজাদী? পদার্থ কবে ছিলুম যে আজ হঠাৎ অপদার্থ হতে হল?

নইলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার কথা বলছিস্ কেন? সত্যি ভেবে দেখ্ তো, দুনিয়াতে কোনদিন কারুর দুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটেছে? না, তা' মেটানো যায়?

একটু সময় চিন্তা করবার ভান করে রাবেয়া আবার বলে ওঠে, ঠিক্ ধরেছেন, নবাবজাদী। আমি সত্যি সত্যিই অপদার্থ। নইলে এই সহজ কথাটা বুঝে উঠ্‌তে কেন এত সময় লাগে আমার? ঠিক্ কথাই বলেছেন আপনি। যে কোনদিন দুধের স্বাদ পায় নি, তাকে অনায়াসেই দুধের বদলে ঘোল দিয়ে ফাঁকি দেওয়া চলে; কিন্তু যে একবার দুধের স্বাদ পেয়েছে, তাকে তো দুধের স্বাদ পেতে হলে দুধই চাই। ঘোলের স্বাদে তো সে ভুলবে না।

চুপ্ কর্, পোড়ারমুখী! আমি বুঝি দুধের স্বাদ পেয়েছি কখনও?

ওহো, পান নি বুঝি? আমি ভাবলুম, আমাদের রঘুনন্দনজী——।

কথাটা শেষ করতে পারে না রাবেয়া। তার আগেই ধমকে ওঠে আজিমুন্, চুপ্ কর্ হতভাগী! বলেই আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে লঘু পায়ে একটা ডালিমগাছের কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে পাতাঝরা ন্যাড়া গাছটার সরু ডালে ঝুলন্ত ডালিমগুলোকে পরীক্ষা করতে থাকে।

আর দূরে পাথরের উপর বসে মিটি মিটি হাসতে থাকে রাবেয়া।

একটু পরেই অন্য একজন বাঁদী অন্দর থেকে ছুটে এসে রাবেয়াকে কিছু বলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ায় রাবেয়া। তারপর উচ্চকণ্ঠে বললে, নবাবজাদী, নবাবসাহেব এসেছেন।

তাই নাকি? ঘুরে দাঁড়ায় আজিমুন্। পিতার আগমন সংবাদে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হরিণীর মত লঘু পায়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে রাবেয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর, তাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে চলতে থাকে অন্দরের দিকে।

আজিমুনের বিশ্রামকক্ষে বসেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। কন্যা আজিমুন্ কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়াতেই নবাব সস্নেহে হাত ধরে কাছে টেনে নেন তাকে।

কন্যার মাথায় স্নেহের পরশ দিয়ে তিনি বললেন, কেমন আছিস্, মা?

ভাল আছি, বাবা। জবাব দেয় আজিমুন্।

হেকিম সুফীর দাওয়াই ঠিকমত খাচ্ছিস তো?

আজিমুন্ জবাব দেবার আগেই দূরে দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রাবেয়া বলে ওঠে, গোস্তাকি মাফ্ হয়, জাঁহাপনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ নবাব জাদীর দাওয়াই খাওয়ার ব্যাপারে আপনি কোন চিন্তাই করবেন না।

বেশ, বেশ। ভালো। রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে একটু স্মিত হাসেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ।

কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এক সময় নবাব আবার বললেন, তোর কাছে আমি হেরে গিয়েছি মা।

কী বলছ, বাবা? কথাটা বুঝতে না পেরে আজিমুন্ বিস্মিত দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে তাকায়।

তেমনি শান্তকণ্ঠে বলতে থাকেন নবাব, হ্যাঁ, মা। তোর কাছে আমি হেরে গিয়েছি। জীবনে এই প্রথম হার মানতে হল আমাকে। তবে আমার দুঃখ নেই। নিজের বেটির কাছে হেরে গিয়েও অনেক সুখ।

আজিমুন্ কিছুই বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কেবল।

একটু থেমে নবাব আবার বললেন, রঘুনন্দনের খবর জানিস্ তো? সে যে দরবারের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে, সেকথা শুনেছিস্?

রঘুনন্দনের প্রসঙ্গে মুখখানা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে আজিমুনের। অবনত মুখে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ বাবা, রাবেয়ার কাছে কিছু কিছু শুনেছি।

আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে নবাবের কণ্ঠে। বললেন, হ্যাঁ মা, দোষ পুরোপুরি আমার। আমিই ভুল বুঝেছিলাম তাকে। তার বিশ্বস্ততায় অহেতুক সন্দেহ করেছিলাম। আর, তার শাস্তিও আমি পেয়েছি। তার মত একজন বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত কর্মচারী আমি হারিয়েছি। আমার কোন অনুরোধ উপরোধই টলাতে পারে নি তাকে।

কোন মন্তব্য না করে আজিমুন্ কেবল মাথা নীচু করে শুনতে থাকে নবাবের কথা। মনে মনে বিস্মিত হয় সে। এই সময়ে নবাব কেন টেনে আনলেন রঘুনন্দনের প্রসঙ্গ? কী তাঁর উদ্দেশ্য?

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে নবাব আবার বলতে থাকেন, তা' ভালই হয়েছে। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সে ভালই

করেছে। আজ বাদে কাল তো চাকুরী ছাড়তেই হত তাকে। আমার অবর্তমানে মস্‌নদে বসে সে তো আর চাকুরী করতে পারতো না। তাই, আগে থেকে ছেড়ে দিয়ে সে ভালই করেছে।

কোন প্রশ্ন না করে আজিমুন্ একবার পিতার মুখের পানে তাকালেও তার চোখের তারায় জেগে ওঠে হাজারো প্রশ্ন। একবার আড়চোখে সে তাকায় দরজার দিকে। নবাবের কথায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা রাবেয়াও একটু নড়ে-চড়ে ওঠে।

মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে নবাব আবার বললেন, আমার কথায় খুব বিস্মিত হয়েছিস্, না মা? তা' বিস্মিত হবারই কথা। অনেক ভেবেছি আমি। চিন্তা ভাবনায় অনেক বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে। অবশেষে ঠিক করেছি, তোর ইচ্ছায় আমি আর বাদ সাধবো না। রঘুনন্দনের হাতেই তোকে তুলে দেব। সে হিন্দু হিন্দুই থাকবে, তুই-ও মুসলমানই থাকবি। এতে যদি তুই সুখী হোস্ তো তাই হবে। একটু আগেই রঘুনন্দনকে একখানা পত্র পাঠিয়েছি। সব কথা লিখেছি তাতে। কাল সকালে তাকে আসতেও বলেছি আমার কাছে। সে এলে আমার ইচ্ছার কথা তাকে জানাবো।

বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠেছে আজিমুনের। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত সেই রক্তস্রোত উন্মত্ত বেগে বয়ে চলেছে তার দেহের শিরা উপশিরায়। পিতার কথা শুনতে শুনতে একটা গভীর আবেশে চোখ দুটো যেন ভারী হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে একটা অপূর্ব শিহরণ। একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে ওঠে মনটা।

ছায়ালেশহীন উষর মরুভূমিতে হঠাৎ যেন জেগে ওঠে সবুজের বন্যা। অন্তরের অন্তঃস্থলে সে অনুভব করে এক অপূর্ব উন্মাদনা।

মুর্শিদকুলী খাঁ থামতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে রাবেয়া। স্থান কাল ভুলে গিয়ে দৌড়ে এসে আজিমুন্‌কে কিছু বলতে যেতেই হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সামনে বসে রয়েছেন খোদ্ নবাব।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে মাথা তোলে আজিমুন্। নিজেকে সংযত করে লজ্জারক্তিম মুখে পিতার দিকে একবার তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করে মৃদু কণ্ঠে বললে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা তো কোনদিন তোমাকে বলিনি, বাবা।

হেসে ওঠেন মুর্শিদকুলী খাঁ। হাসতে হাসতে বললেন, শোন বেটীর কথা! মুখ ফুটে না বললে বুঝি বলা যায় না কিছু? আমাকে কি এতই বোকা মনে করেছিস্ যে তোর মনের কথা কিছুই টের পাই নি?

লজ্জায় মাথাটা আরও একটু নিচু করে নবাবজাদী আজিমুন্। আর কোন কথা বলতে পারে না সে।

মুর্শিদকুলী খাঁ কন্যার উজ্জ্বল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তৃপ্ত মনে একসময় নবাবজাদীর মহল ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আজিমুনের সামনে এসে দাঁড়ায় রাবেয়া। আনন্দের আতিশয্যে সেই মুহূর্তে নবাবজাদীর পদমর্যাদার কথা বিস্মিত হয়ে তার হাতখানি ধরে ফেলে বলে ওঠে, আমি জানতাম নবাবজাদী, এ হবে। এ যে না হয়ে পারে না।

মুখ তুলে মৃদু কণ্ঠে আজিমুন্ জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলি?

আমার মন বলেছিল, নবাবজাদী। নইলে, এই ছুনিয়ার প্রেম মহব্বতের যে কোন অর্থই থাকে না। আর কেউ না জানলেও আপনাদের ছু'জনের মনের কথা জানতে আমার তো বাকি নেই। আমি তো জানি, যেদিন রঘুনন্দনজী আপনাকে তাঁর শেষ জবাব দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আপনার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল। আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি, সেদিন থেকেই একটু একটু করে আপনার মনটা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। আর যেদিন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোতোয়াল মহম্মদ জানকে সাদী করতে আপনার সম্মতির কথা নবাবসাহেবকে জানিয়েছিলেন, সেইদিনই আপনার বাড়াবাড়ি অবস্থা।

কোন জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মুখে রাবেয়ার কথা শুনতে থাকে আজিমুন্।

একটু থেমে রাবেয়া আবার বললে, খোদা মেহেরবান! তিনি এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। আপনার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন তিনি।

শুধুই কি আমার প্রার্থনা? প্রশ্ন করে আজিমুন্।

হ্যাঁ, নবাবজাদী। শুধুই আপনার প্রার্থনা। অন্য কারোর নয়। আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন যে, খোদাতালা রঘুনন্দনজীর প্রার্থনাও শুনতে পেয়েছেন, তাই না? কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না, নবাবজাদী।

কেন? বিশ্বাস করিস্ না কেন?

তিনি যদি সত্যিই প্রার্থনা করতেন, তাহলে নিজের জেদ্ বজায় রাখতে গিয়ে নবাবসাহেবকে আর আপনাকে তিনি ঐ জবাব দিতে পারতেন না। মহব্বতের জন্যে মানুষ তো জান

পর্যন্ত কবুল করতে পারে, আর রঘুনন্দনজী ইস্লাম গ্রহণ করতে পারলেন না ?

লজ্জারক্তিম মুখে জিজ্ঞেস করে আজিমুন্, আমার প্রতি তাঁর ভালবাসায় কি তুই সন্দেহ করিস্, রাবেয়া ?

না নবাবজাদী, সন্দেহ মোটেই করি না। তিনি আপনাকে সত্যিই ভালবাসেন। তবে তিনি নিজের ধর্মকে আপনার চাইতেও ভালবাসেন।

আজিমুন্ আর কিছু না বলে একাধারে তার সহচরী, বান্ধবী এবং সর্বোপরি তার এই একান্ত শুভাকাঙ্খিনীর মুখের দিকে একটু স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গবাক্ষপথে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রাবেয়া সাধারণ নারী, সোজা হিসেব করতেই সে অভ্যস্থ। চাওয়া পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের খোঁজ সে রাখে না। প্রেমিক যুগলের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটাই তার চরম কাম্য। এর বাইরে অন্য কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। রঘুনন্দনের মনের কথা বোঝবার সাধ্যও রাবেয়ার নেই। নিজের ধর্মকে সে ছাড়তে পারে নি সত্য, কিন্তু তার বদলে যে ত্যাগের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল, সেই ত্যাগের মহিমা রাবেয়া হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও আজিমুন্ নিজে তো পেরেছে। সে স্থির নিশ্চিত জানতো, রঘুনন্দনের হৃদয় জুড়ে একমাত্র তার নিজের আসনখানি ছাড়া আর অন্য কোন আসন নেই। সারাটা জীবন তার স্মৃতি বুকে নিয়েই যে বেঁচে থাকবে, এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। তাই তো, সেদিন রঘুনন্দনের শেষ জবাব শুনে দুঃখে অভিমানে মনটা ভেঙ্গে টুক্রো টুক্রো হয়ে গেলেও রাগ করতে পারে নি মোটেই। মনে মনে শুধু উচ্চারণ করেছিল, তুমি—তুমি বিরাট, তুমি মহান। তোমার মনের নাগাল পাওয়া আমার সাধ্য নয়, কুমার।

আমি অতি ক্ষুদ্র। তাই তো তোমাকে আরও নিবিড় করে পেতে চাই।

এতদিনে সমস্যার সমাধান হল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ স্বয়ং সমাধান করে দিলেন। আর কোন বাধা রইল না। আর কিছু বলারও রইল না রঘুনন্দনের। আজিমুন্‌কে চুপ্ করে থাকতে দেখে রাবেয়া একসময় বলে ওঠে, কাল কিন্তু আপনার কথা আমি শুনবো না, নবাবজাদী। কাল আমি লোক পাঠাবো রঘুনন্দনজীর কাছে।

কথাটা ধরতে না পেরে আজিমুন্ বললে, কেন ?

হেসে জবাব দেয় রাবেয়া, কাল সকালে নবাব সাহেব তাঁকে এত্তেলা দিয়েছেন। আর আপনার নামে আমি তাঁকে এত্তেলা দেব কাল রাতে। আপনার বিশ্রামকক্ষটি কাল নিজের হাতে আমি সাজাবো।

লজ্জারক্তিম মুখে রাবেয়াকে একটা কৃত্রিম ধমক দিয়ে আজিমুন্ বললে, ভারি বেয়াদপ হয়ে উঠেছিস্ তুই, রাবেয়া।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত রাবেয়া কেবল খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

* * * *

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পত্রখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে রঘুনন্দন। বুকের মধ্যে তারও আনন্দের ঢেউ। অবশেষে নবাব রাজি হয়েছেন। হিন্দু রঘুনন্দনের হাতে কন্যাকে তুলে দিতে আর কোন আপত্তি নেই তাঁর। নবাবের এই আচরণে তাদের ঐকান্তিক প্রেমেরই জয় সূচিত হল। প্রমাণ হল, আজিমুনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। পার্থিব কোন শক্তির সাধ্য নেই তাদের পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

হ্যাঁ, সে যাবে। নবাবের আহ্বানে সে সাড়া দেবে। অহেতুক অভিমানে সে আর নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে না। তারপর, আগামীকাল রাতের অন্ধকারে সে একবার গিয়ে হাজির হবে নবাবজাদী আজিমুনের মহলে।

আজিমুন্—আজিমুন্নেসা! মনের মধ্যে নামটা প্রতিধ্বনিত হতেই সারা দেহমনে একটা আনন্দ-শিহরণ অনুভব করে রঘুনন্দন। তার কল্পনালোকের অপ্সরী আজিমুন্। তার মানসী প্রতিমা আজিমুন্নেসা। যেন কত যুগ ধরে তার সাক্ষাৎ লাভ করেনি রঘুনন্দন। যেন কত দীর্ঘ সময় তার সান্নিধ্য লাভ করেনি সে।

আজিমুনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না রঘুনন্দনের। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তার মুখের উপর স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন তাঁর অনিচ্ছার কথা। নবাবের মুখের কথা মানেই তাঁর কঠিন আদেশ। সেই আদেশ অগ্রাহ্য করে নি রঘুনন্দন। মনের প্রচণ্ড ইচ্ছাকে দমন করে ভুলেও হারেমের গোপন সুড়ঙ্গপথে পা বাড়ায় নি। কিন্তু আর কোন বাধা নেই এখন। নবাবজাদী আজিমুন্ তার ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনী। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে হারেমের মহলে গিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারে। হ্যাঁ তাই সে করবে। আগামী কাল রাতেই সে দেখা করবে আজিমুনের সঙ্গে। গিয়ে শুধু বলবে, আমি প্রস্তুত, আজিমুন্।

সেদিন কেন যেন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল রঘুনন্দনের। গৃহের গণ্ডী ভাল লাগছিল না তার। নির্জনতায় নিজের মনের একান্ত মুখোমুখি বসে থাকতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

তাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতেই রঘুনন্দন ভাগীরথীর তীর ধরে আপন মনে একা হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে নদীর তীরে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ায়।

লোকালয় ছাড়িয়ে বহুদূরে এসে পড়েছে রঘুনন্দন। আশেপাশে ঘন জঙ্গল। সামনে বেগবতী ভাগীরথী একটানা খল্-খল্ ছল্-ছল্ শব্দ করতে করতে বয়ে চলেছে। আকাশে একফালি চাঁদের অস্পষ্ট আলো একটা মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে যেন। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে শুকনো বালির উপর বসে ভাগীরথীর জলস্রোতের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল রঘুনন্দন। দখিনা বাতাসে তার লম্বা চুলের রাশি তুরন্ত শিশুর মত দাপাদাপি করছিল তার কপালের উপর। তাদের শাসনে আনবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল সে। চিন্তার গভীরতায় সময়ের হিসেব হারিয়ে গিয়েছিল তার।

অকস্মাৎ মাথার উপর একটা পেঁচার কর্কশ কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ওঠে রঘুনন্দন। বোধহয় এই অসময়ে মানুষের উপস্থিতি পছন্দ করছিল না লক্ষ্মীর বাহনটি। তাই বারে বারে পিছনে ঝোপের আড়াল থেকে উড়ে এসে তার মাথার উপর চক্কর খেতে খেতে কর্কশ কণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষণা করছিল।

বিরক্ত হয়ে এক সময় উঠে দাঁড়ায় রঘুনন্দন। মুখ তুলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সময়ের পারমাপ করে। তারপর পোষাকের ধূলো ঝেড়ে চলতে শুরু করে বাড়ির দিকে।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। ম্লান চাঁদের আলোয় রঘুনন্দন কাঁচা গ্রাম্য সড়ক ছাড়িয়ে এসে পড়ে রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথে।

নির্জন রাজপথ। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

রঘুনন্দনের কিন্তু ভয় বলে কোন বস্তু কোন কালেই ছিল না। এমন কি রাজধানীতে সেই উৎপাত শুরু হবার পরেও ওসবে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করতো না।

অকস্মাৎ পথের পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় আলো আঁধারির মধ্যে দৃষ্টিপাত করতেই সে থমকে দাঁড়ায়।

একটু সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে রঘুনন্দন। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। সজাগ হয়ে ওঠে কান দুটো। জোর কদমে নিঃশব্দে আরও দু'পা এগিয়ে যায় সে। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার নজরে পড়ে তার। গাছের তলায় কেমন যেন একটা গোঁ—গোঁ শব্দ। আর সেই সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি।

বিদ্যুৎ ঝলকের মত গোটা ব্যাপারটা হঠাৎ জলের মত সোজা হয়ে যায় তার কাছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করে। দেখতে দেখতে তার সুপুষ্ট দেহের মাংসপেশী শক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র বেগে সে ছুটে যায় সেই গাছের দিকে।

ততক্ষণে সেই কালো কুচ্‌কুচে যমদূতের মত লোকটা অন্য লোকটিকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসে তার কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করছে। মৃত্যুভয়ে ভীত সেই আক্রান্ত লোকটির কণ্ঠে জেগে উঠেছে একটা গোঁ—গোঁ আওয়াজ। আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে সে তখনও চেষ্টা করে চলছে সমানে। কিন্তু আক্রমণ-কারীর শক্তির তুলনায় সে নেহাত শিশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সময় আক্রমণকারী তার বাঘের থাবার মত বাঁ হাতে আক্রান্ত লোকটির কণ্ঠদেশ চেপে ধরে ডান হাতে কোমর

থেকে টেনে তোলে একখানা চক্‌চকে ধারালো ছোরা। চাঁদের ম্লান আলোয় ছোরার ফলাটা চক্‌চক্ করে ওঠে।

দীর্ঘ উনত্রিশ দিন উনত্রিশটি নিরীহ হতভাগ্যকে নির্বিবাদে যমালয়ে পাঠিয়ে এই তিরিশ এবং শেষ দিনটিতে এসে প্রথম বাধা পেল সেই দানব। হাতের ছোরাটা শূন্যে তুলে নিয়ে আর নামাবার অবসর পেল না। তার আগেই বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরা সমেত তার হাতটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে রঘুনন্দন।

এমন অতর্কিতে আক্রান্ত হতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সেই লোকটা। একটু হক্‌চকিয়ে যায় প্রথমটায়। সতর্ক রঘুনন্দন কিন্তু তার সেই বিহ্বল হয়ে ওঠা মুহূর্তটুকুই সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তার বজ্রমুষ্টির কঠিন নিষ্পেষণে সেই দানবের কদাকার মুখটা আরও বিকৃত হয়ে ওঠে। মুখে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে একপাশে কাত হয়ে পড়ে সে। হাত থেকে খসে পড়ে যায় ছোরাটা, আর সেই মুহূর্তেই রঘুনন্দন নিজের দেহের প্রচণ্ড চাপে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে; এবার কোথায় যাবি তুই? এতদিন ধরে রাজধানীতে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে ফিরেছিস্। আজ হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছিস্, বল্ কে তুই? কেন এ কাজ করে বেড়াচ্ছিস্?

প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী রঘুনন্দনের গুরুভার দেহের চাপে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছিল সেই কালো কুচ্‌কুচে হাব্‌সীর। তা ছাড়া নিজের অমিত শক্তির উপর প্রচণ্ড ভরসা ছিল তার। কিন্তু অকস্মাৎ তার চাইতেও বেশি শক্তিশালী এক ব্যক্তির এমন অতর্কিত আক্রমণে নিজের উপর সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে

কালো কুচকুচে ঠোঁটের ফাঁকে সাদা ধবধবে দাঁতে দাঁত ঘসে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে একটা প্রচণ্ড ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতেই রঘুনন্দন তার সাঁড়াশীর মত শক্ত আঙ্গুলে লোকটির কণ্ঠদেশে প্রবল চাপ দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, এতদিন তুই যেমনিভাবে একের পর এক নরহত্যা করেছিস্, ঠিক্ তেমনিভাবে তোকেও আজ শেষ করবো আমি।

হাব্‌সী দানবটি নিজের কণ্ঠদেশ থেকে রঘুনন্দনের হাত দুটো সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেই বুঝতে পারে, ঐ হাত এতটুকু স্থানচ্যুত করাও তার সামর্থের বাইরে। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

তাই সে তার সমস্ত প্রতিরোধ তুলে নিয়ে বিকৃত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আমাকে—আমাকে মারবেন না, জনাব। আল্লার কসম্, আমি আপনার গোলাম। বলব—সব কথা বলব। আমাকে মারবেন না হুজুর।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রঘুনন্দন বলে ওঠে, সত্যি বলছিস্? ছেড়ে দিলে পালাতে চেষ্টা করবি না? সব কথা খুলে বলবি?

হাব্‌সীটার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল তার চোখ দুটো। সেই চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি রঘুনন্দনের মুখের উপর ফেলে তেমনি বিকৃত নিস্তেজ কণ্ঠে সে আবার বলে উঠে, হ্যাঁ—হ্যাঁ জনাব; সত্যি কথা বলবো আমি—আমি হাবসী মুসলমান। আল্লার নামে কসম্ খেয়েছি মিথ্যে বলবো না। না হুজুর না—পালাতে চেষ্টা করবো না। আপনি—আপনি আমাকে মারবেন না, জিন্দেগীভোর আপনার —আপনার গোলাম হয়ে থাকবো—

একটু সময় চিন্তা করে রঘুনন্দন। তারপর সেই হাবসীকে

ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণে সে লক্ষ্য করে সেই আক্রান্ত নাগরিকটি কখন সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে উঠে পালিয়েছে। জীবনদাতার বিপদ আপদকে গ্রাহ্য না করেই নিজের প্রাণ নিয়ে সে সরে পড়েছে।

হাবসীকে ছেড়ে দিলেও সেই মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। রঘুনন্দন নিজের কোমরে হাত রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় শ্রান্ত ক্লান্ত সেই লোকটা ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসে উপুড় হয়ে রঘুনন্দনের পদচুম্বন করে নিজের কৃতজ্ঞতা ও সেই সঙ্গে আত্মসমর্পন ঘোষণা করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ক্লান্ত ভঙ্গীতে টেনে টেনে বললে, হ্যাঁ, জনাব আলি, ঠিকই ধরেছেন আপনি। আমিই—আমিই এই মুল্লুকে এতগুলো খুন করেছি। আমার মনিবের ইন্তেকালের সময় তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে যে জবান দিয়েছিলাম, সেই জবান মোতাবেক-ই আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে, জনাব। আমি জানি খুন-খারাবীর মত গুনাহ্ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। তবুও—তবুও এ কাজ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার—।

কৌতুহলী রঘুনন্দন প্রশ্ন করে তাকে, কে তুমি? কে তোমার মনিব?

বলছি, জনাব আলি। সবই বলছি একে একে, খোদার কসম্ যখন একবার খেয়েছি, তখন একচুলও ঝুট্ বলবো না। গুনাহ্ অনেক করেছি, কিন্তু খোদার কসম্ খেয়ে ঝুট্ বলে আর গুনাহ্ বাড়াতে চাই না।

একটু থেমে কুচ্‌কুচে কালো যমদূতের মত চেহারার সেই হাব্‌সী আবার বললে, এখানে দাঁড়িয়েই কি আমার সব কথা শুনতে চান জনাব?

এতক্ষণে রঘুনন্দনের খেয়াল হয়, তারা এই গভীর রাতে রাজপথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাই একটু ভেবে নিয়ে সে বললে, বেশ, আমার বাড়িতে চল। সেখানে বসেই তোমার কথা শুনবো।

নরহত্যাকারী সেই হাব্সীকে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায় রঘুনন্দন। পথে যেতে যেতে সামান্য ছু'একটা কথার মধ্যে সেই হাব্সী একবার বললে, আজ সেই লোকটাকে আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনি খুবই ক্ষতি করলেন, জনাব।

কেন? কার ক্ষতি করলাম? প্রশ্ন করে রঘুনন্দন।

ক্ষতি করলেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর। জবাব দেয় সেই হাব্সী।

সেকি? রঘুনন্দনের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জনাব। সব শুনে আপনিও বুঝতে পারবেন, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কতটা ক্ষতি আপনি করলেন।

কথা বলতে বলতে তারা রঘুনন্দনের গৃহে এসে হাজির হয়। নরহত্যাকারী এই হাব্সীর কথাবার্তায় কৌতুহল উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠে রঘুনন্দনের।

বাইরের ঘরে হাব্সীকে বসিয়ে প্রদীপের আলোয় তার আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রঘুনন্দন বলে ওঠে, আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে রাতের পর রাত তুমি একজন করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এসেছো। নগর কোতোয়াল তার সমস্ত সিপাহী ফৌজ নিয়োগ করেও তোমাকে পাকড়াও করতে পারে নি। কোন মন্ত্রবলে তুমি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এমনি কাজ করে বেড়াচ্ছিলে?

মুখে কোন জবাব না দিয়ে হাব্সী কেবল একটু রহস্যময়

হাসি হাসে। সেই হাসিতে তার বীভৎস মুখখানা আরও বীভৎস দেখায়।

সেই দিকে তাকিয়ে রঘুনন্দন আবার প্রশ্ন করে, কে তুমি ? কী তোমার পরিচয় ?

লোকটি জবাব দেয়, আমি একজন হাব্‌সী মুসলমান। নাম আমার মির্জা বেগ।

কোথায় থাকো তুমি ? রঘুনন্দন আবার জিজ্ঞেস করে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে একটু চিন্তা করে নিজের কথা গুছিয়ে নেয় হাব্‌সী মির্জা বেগ। তারপর বলতে শুরু করে,—আমার মনিব ছিলেন একজন ইস্পাহানী বনিক। ব্যবসা করতেন তিনি দিল্লীতে। সেখানেই থাকতেন। আমি ছিলাম তাঁর খাস্ নোকর। বহুত্ পেয়ার করতেন তিনি আমাকে। মাঝে মাঝে তিনি আপনাদের এই রাজধানী মুর্শিদাবাদেও আসতেন। এখানে একজন বাঁধা কস্‌বী ছিল তাঁর। খানদানী ঘরের সেই আউরত্ বেহেস্তের হুরীর মতই ছিল খুবসুরত্।

রঘুনন্দন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে তার কথা।

বলতে থাকে মির্জা বেগ,—এই মুর্শিদাবাদের সেই কস্‌বী একদিন এক লেড়কা পয়দা করলো। আর সেই লেড়কাকে নিয়েই আমার মনিবের সাথে ঝগড়া শুরু হল সেই কস্‌বীর। অবশেষে আমার মনিব গোঁসা করে এখানে আসা প্রায় ছেড়ে দিলেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি দিল্লী থেকে আমাকে এখানে পাঠাতেন সেই লেড়কা ও তার মায়ের খবর নিতে। এমনিভাবে দশ বছর কেটে গেল। বড় হতে লাগল সেই লেড়কা। দেখতেও যেমন সে খুবসুরত্ বুদ্ধিও তার তেমনি প্রখর। ইস্পাহানী আর বাঙ্গালী রক্ত তার দেহে। আমি

মাঝে মাঝে এখানে আসতাম তাদের খবর নিতে। সেই লেড়কা ও তার মা কিন্তু আমাকে খুবই পেয়ার করতো।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মির্জা বেগ একটু দম নিতে একবার থামতেই রঘুনন্দন প্রশ্ন করে, তারপর ?

হাব্সী মির্জা বেগ একটু থেমে জবাব দেয়, বলছি জনাব, একবার যখন মুখ খুলেছি তখন সব কথাই আপনাকে বলবো।

একটু থেমে সে আবার বললো, একটু পানি খাওয়াতে পারেন, জনাব ? বড্ড পিয়াস লেগেছে।

রঘুনন্দন জল এনে দিতেই ঢক্ ঢক্ করে এক লোটা জল নিঃশেষে পান করে হাব্সী মির্জা বেগ আবার বলতে আরম্ভ করে, দিল্লীতে আমার মনিবের কঠিন বেমার হল, আমি এখানে এলাম সেই লেড়কা ও তার মাকে নিয়ে যেতে। সেই কস্‌বী কিন্তু নিজে গেল না। কেবল সেই লেড়্কাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল দিল্লীতে। আমার মনিবের মৃত্যু হল। মরার আগে তিনি আমার হাতদুটো সেই লেড়কার হাতের উপর রেখে বললেন, তোকে ওর হাতেই দিয়ে গেলাম, বেগ। তুই যেমন এতদিন আমার কথা মত চলেছিস, এবার থেকে এই লেড়কার কথা মতই তুই চল্‌বি। এখন থেকে আমার এই বেটাই তোর নতুন মনিব।

মনিবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমি কথা দিলাম, যতদিন বাঁচবো ততদিন এই নতুন মনিবের কথা মতই চলবো। জান দিয়েও ওকে রক্ষা করবো।

তারপর ? কৌতূহলী রঘুনন্দন প্রশ্ন করে।

বলতে থাকে হাব্সী মির্জা বেগ, আমার মনিব তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন সেই লেড়্কাকে। কিন্তু তার মা—সেই

কস্‌বী কিছুতেই গ্রহণ করলো না। লেড়্‌কা ফিরে এল এখানে, আর আমি আমার মনিবের বিষয় সম্পত্তি পাহারা দিতে দিল্লীতেই রয়ে গেলাম।

একটু থেমে মির্জা বেগ আবার বলতে থাকে, অনেক বছর কেটে গেল। তারপর মারা গেল সেই কস্‌বী। সেই লেড়্‌কাও এখন বড় হয়ে উঠেছে। এখানে তার প্রচুর নামডাক, হঠাৎ কিছুদিন আগে দিল্লীতে তার একখানা পত্র পেলাম। একটা বিশেষ কাজে তিনি আমার সাহায্য চেয়েছেন।

কিন্তু এখানে এসে যে কাজের কথা শুনলাম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। শুনলাম, তিনি নাকি এক খুবসুরত্‌ নওজোয়ানীকে ভালোবেসেছেন। সেই নওজোয়ানীর জীবন রক্ষা করতে নাকি প্রতিদিন একজন করে মানুষ খুন করতে হবে। আমি তো তাজ্জব! অনেক বোঝালাম তাঁকে, কিন্তু মহব্বতে তিনি তখন অন্ধ। অবশেষে রাজি হলাম তাঁর কথায়—।

শুনতে শুনতে ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। কেমন যেন একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ে তার সারা মুখে। হাব্‌সী মির্জা বেগের কথা শেষ হবার আগেই সে বলে ওঠে, বল—বল, কে সেই লেড়্‌কা? কে সেই নওজোয়ানী?

তাঁদের নাম কি আপনার না শুনলেই নয় জনাব?

অধৈর্য্য কণ্ঠে রঘুনন্দন বলে ওঠে, না—না। তাদের নাম আমাকে শুনতেই হবে, বল—বল তারা কে?

জবাব দেয় মির্জা বেগ, আমার সেই মালিকের বেটাই হচ্ছে আপনাদের নগর-কোতোয়াল মহম্মদ জান। আর সেই নওজোয়ানী হচ্ছে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বেটী আজিমুন্নেসা।

আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পাথরের মত শক্ত

হয়ে বসে থাকে রঘুনন্দন। মাথার মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করে ওঠে হাজারো চিন্তা, মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন।

এই হাব্‌সী মির্জা বেগের কথায় সন্দেহ করবার মত কিছুই খুঁজে পায় না সে। লোকটির কথা বলার ভঙ্গি ও তার হাবভাব দেখে শুধু একটি কথাই তার মনে হয় যে, নৃশংস হত্যাকারী হলেও সে মিথ্যাবাদী নয়।

কিন্তু তবুও সে কী করে বিশ্বাস করে যে কোতোয়াল মহম্মদ জানের মত ব্যক্তি এত নিচে নেমে যেতে পারে? একটি নারীর জন্যে কেমন করে সে এতগুলো নরহত্যার পরিকল্পনা রচনা করতে পারে? হোক্‌ সেই নারী খোদ নবাবজাদী আজিমুন্‌! তবুও সে তো নারী ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু কি তাই? দিনের পর দিন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে ভাঁওতা দিয়ে নিজের পরিকল্পনা মত সে কাজ চালিয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ সে নিজেই নিজেকে আড়াল করে রাখতে গিয়ে এই জঘন্য নরহত্যার দায়িত্ব কখনও সেই কাশিমবাজার কুঠীর কুকুরটার উপর আবার কখনও বা ভূত-প্রেতের উপর চাপিয়ে নানারকম কাহিনী রটনা করেছে। রক্ষক ভক্ষকের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে গোটা রাজধানীতে। এ সবই সে করেছে কেবলমাত্র একটি নারীর জন্যে——সে নবাবজাদী আজিমুন্‌। সত্যিই কি তবে মহম্মদ জান এখনও নবাবজাদীকে এত ভালবাসে?

কিন্তু কেন? নরহত্যার সঙ্গে আজিমুনের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্পর্ক কী? আজিমুন্‌কে সুস্থ করে তুলেছে সেই হেকিম সুফী তার আশ্চর্য ওষুধের সাহায্যে। তার সঙ্গে এই জঘন্য নরহত্যার সম্বন্ধ কোথায়?

হাব্‌সী মির্জা বেগ যেন রঘুনন্দনের মনের কথা টের

পেয়ে আবার বলে ওঠে, আপনি বোধহয় জানেন জনাব, হেকিম সুফীর নির্দেশ,—নবাবজাদীকে পুরো তিরিশ দিন তাঁর দাওয়াই খেতে হবে ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রঘুনন্দন।

কিন্তু, আপনি বোধহয় জানেন না যে পনেরটি দিন কেটে যাবার পর নরহত্যার কোন হদিস্ করতে না পেরে, কোতোয়াল মহম্মদ জান নবাবের কাছে কাতর মিনতি করে আরও পনের দিন সময় নিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, তাও জানি।

জানেন ? তবে এটা বোধহয় আপনারা কেউই লক্ষ্য করেন নি যে যেদিন থেকে রাজধানীতে নরহত্যা শুরু হল, তার পরের দিন সকাল থেকেই নবাবজাদী হেকিম সুফীর দাওয়াই খেতে আরম্ভ করেছিলেন ?

এবার অধৈর্য কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে রঘুনন্দন, না করিনি—করিনি। এবার তুমি বল, এই হত্যার সঙ্গে নবাবজাদীর কী সম্বন্ধ ?

বলছি জনাব, সবই বলছি। একটু ধৈর্য ধরুন। এক-মুহূর্ত চিন্তা করে হাব্সী মির্জা বেগ আবার বলতে থাকে, নবাবজাদীর যে ধরণের অসুখ করেছিল, সেই অসুখের সত্যিই কোন দাওয়াই ছিল না। তাই অন্য হেকিম কবিরাজের মত হেকিম সুফীও প্রথমে তাঁকে জবাব দিয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু হেকিমী শাস্ত্রে তিনি সত্যিই সুপণ্ডিত। তিনি জানতেন, মানুষের কলিজা দিয়ে এমন একটা অদ্ভুত দাওয়াই তৈরি করা যায়, যা খেয়ে নবাবজাদী নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠ্‌বেন। কিন্তু পুরো তিরিশ দিন খেতে হবে সেই দাওয়াই। একটি দিন কম হলেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। তিরিশ দিন দাওয়াই

তৈরি করতে তিরিশটি মানুষের কলিজার প্রয়োজন। এ বস্তু জোগাড় করা এতই অসম্ভব যে তিনি সেকথা নবাবকে আর বলেন নি। কিন্তু কোতোয়াল মহম্মদ জান একদিন হেকিম সুফীর সঙ্গে কথায় কথায় ব্যাপারটা জানতে পেরেই মানুষের কলিজা জোগাড় করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। রাজি হয়ে গেলেন হেকিম সুফীও। তারপরই আমার কাছে দিল্লীতে পত্র গেল।

কাহিনীর আকস্মিকতায় যেন বোবা হয়ে গেল রঘুনন্দন। নবাবজাদী আজিমুনের সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে এ যে কল্পনাতীত ইতিহাস। মানুষের ভাবনা চিন্তার উর্ধে এ যে এক আরব্য উপন্যাসের কাহিনী! জঘন্য নরহত্যার পিছনে এ যে এক অচিন্তনীয় উদ্দেশ্য। বিষে বিষক্ষয়ের মত মানুষের কলিজা দিয়ে প্রস্তুত ওষুধে কলিজার জটিল রোগের উপশম!

বোবা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মির্জা বেগের দিকে তাকিয়ে থেকে রঘুনন্দন হঠাৎ বলে ওঠে, তা'হলে তুমি—তুমি রোজ রাতে নরহত্যা করে—

রঘুনন্দনের কথা শেষ হবার আগেই হাব্সী মির্জা বেগ বলে ওঠে, হ্যাঁ জনাব। দোজখের কীট আমি, তাই প্রতি রাতেই এই জঘন্য কাজ আমাকে করতে হত। সবাই জানতো হত্যাকারী মৃতদেহের বুকটা ছিন্নভিন্ন করে রেখে যায় কেবল। কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতো না কেউ। মৃতদেহের বুক থেকে কলিজা তুলে নিয়ে প্রতিদিন আমাকে হেকিম সুফীর আস্তানায় দিয়ে আসতে হত। সেই কলিজা দিয়েই শেষরাতে তিনি দাওয়াই তৈরি করে ভোরে নবাবজাদীর মহলে পাঠিয়ে দিতেন। আজই সেই শেষ দিন। আপনি এসে না পড়লে এতক্ষণে আমি সেই লোকটির কলিজা হেকিম সুফীর কাছে

পৌঁছে দিয়ে ভোর হবার আগেই প্রতিদিনের মত কোতোয়ালের মোকানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমার বরাত খারাপ। তাই আজ ধরা পড়ে গেলাম আপনার কাছে। ঘাটে এসে নৌকা ডুবলো, জনাব। ভোর হতে বোধহয় আর দেরি নেই। হেকিম সুফী আজ শুধু শুধুই অপেক্ষা করে থাকবেন আমার জন্যে। কাল ভোরে আর দাওয়াই পৌঁছবে না নবাবজাদীর কাছে।

রঘুনন্দন আবার জিজ্ঞেস করে, তিরিশ দিনের মধ্যে এই শেষ দিনটিতে দাওয়াই না খেলে নবাবজাদী আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে—হেকিম সুফীর এই তো অভিমত?

হ্যাঁ, জনাব। হেকিম সুফী তাই বলেন। তাঁর মতে, নবাবজাদী শুধু মাত্র অসুস্থই হবেন না, তাঁর মৃত্যু অবধারিত। সেই মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা নাকি তাঁর নিজেরও নেই।

চিন্তার ভারে মাথাটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। মনের মধ্যে প্রচণ্ড এক ঝড়ের সংকেত। নবাবজাদী আজিমুন্নেসা—তার মানসী প্রতিমা আজিমুন্‌কে সুস্থ করে তুলতে কোতোয়াল মহম্মদ জান ন্যায় অন্যায় ধর্ম-অধর্মের দিকে না তাকিয়ে এতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বোধকরি, সে তার বিবেকও বিসর্জন দিয়েছে। নইলে কোন স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এমন নৃশংস কাজ সম্ভব নয়। মহম্মদ জান আজিমুন্‌কে ভালবাসে। নিশ্চয়ই ভালবাসে। আজিমুন্ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও সে তাকে ভালবাসে। আজিমুনের মনটা বাঁধা পড়ে আছে রঘুনন্দনের কাছে—একথা জেনেও আজিমুনের প্রতি মহম্মদ জানের ভালবাসায় এতটুকু ঘাটতি হয় নি। কিন্তু, ভালবাসা কি মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে?

সত্যিকারের ভালবাসা কি মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ করে দিয়ে তাকে উন্মাদে পরিণত করে? তা'হলে যুগে যুগে মানুষ ভালবাসার এত স্তবস্তুতি করেছে কেন? কেন তবে প্রেমের এত প্রশস্তি? যে প্রেম অন্যের প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই প্রেমের স্থান তবে কোথায়?

না—না। রঘুনন্দন কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না মহম্মদ জানের এই কাজ। এমন কি আজিমুনের প্রাণের বিনিময়েও নয়। নিজের ভালবাসার পাত্রীর প্রাণ রক্ষায় মানুষ অন্যের প্রাণ হরণ করে নেবে কোন্ অধিকারে? তা'হলে যে প্রেম, ভালবাসা একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই পৃথিবীতে জীবের জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সত্যিকারের প্রেম যে চিরস্থায়ী। মানুষ নশ্বর; কিন্তু প্রেম যে অবিনশ্বর।

কিন্তু ন্যায়ের পথে হোক্, অন্যায়ের পথে হোক্, তার ভালবাসার পাত্রী নবাবজাদী আজিমুন্ এখনও বেঁচে আছে। কোতোয়াল মহম্মদ জানের চেষ্টায় যে আজিমুন্ মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছে, তার নিজের একটি মুহূর্তের হস্তক্ষেপে সেই আজিমুন্‌কেই আবার গ্রাস করে ফেলবে করাল মৃত্যুর ছায়া। নিস্তার নেই তার। বাঁচার কোন পথই আর খোলা থাকবে না।

দুশ্চিন্তায় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রঘুনন্দনের। নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না আর। মাথার মধ্যে যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রঘুনন্দন, তারপর ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে থাকে, আর ঘরের এক কোণে প্রদীপ-শিখার আলো আঁধারির মধ্যে স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে থাকে হাব্সী মির্জা বেগ।

রঘুনন্দন একসময় মির্জা বেগের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমি যদি এখন তোমাকে নিয়ে গিয়ে নবাবের সামনে হাজির করে সব কথা তাঁকে খুলে বলে দিই ?

খোদা মেহেরবান ! আপনি তাই করুন, জনাব। আমিও তাই চাই, এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। যে গুনাহ্ আমি করেছি, তার ক্ষমা নেই। আপনি তাই করুন, সব কথা প্রকাশ করে দিন নবাবকে। আমার মনিব কোতোয়াল মহম্মদ জান ও আমাকে কঠিন শাস্তি দিন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। খুনের বদলা গর্দান যাক্ আমাদের। সেই ভাল—সেই ভাল—, কথা বলতে বলতে শেষের দিকে মির্জা বেগের কণ্ঠস্বর কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে।

হাতদুটো পিছনদিকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় আবার ঘরময় পায়চারী শুরু করে রঘুনন্দন। কাল সকালে নবাব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; নিজের কন্যাকে তিনি তার হাতে তুলে দিতে চান। আজিমুন্ও নিশ্চয়ই এ কথা শুনেছে, সেও হয়ত প্রতীক্ষা করে থাকবে তার জন্য।

অকস্মাৎ পায়চারী থামিয়ে রঘুনন্দন আবার প্রশ্ন করে, আর তা না করে তোমাকে যদি এখনই ছেড়ে দিই, তাহলে তুমি কি করবে ?

কী করব, তা ঠিক বলতে পারি না, জনাব। হয়ত ফিরে গিয়ে কোতোয়াল মহম্মদ জানকে সব কথা খুলে বলব।

কেন, তোমার মনিবের আদেশ মত নবাবজাদীকে বাঁচাতে নতুন কোন শিকারের ব্যবস্থা করে তার কলিজা নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে না হেকিম সুফীর আস্তানায় ?

একমূহূর্ত চিন্তা করে জবাব দেয় হাবসী মির্জা বেগ, না জনাব, তা আর সম্ভব নয়। ভোর প্রায় হয়ে এল, নতুন শিকার

এখন কোথায় পাবো ? শেষ দাওয়াই আর কিছুতেই খেতে পারবেন না নবাবজাদী।

হাব্সী মির্জা বেগের জবাবে অকস্মাৎ কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে ওঠে রঘুনন্দন। সহসা আর কোন কথা জোগায় না তার মুখে।

পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে আবার বলে ওঠে, আর—আর আমি যদি তোমাকে অন্য কোন শিকার জোগাড় করে দিই, তাহলে ?

হাব্সী মির্জা বেগ রঘুনন্দনের পরিচয় না জানলেও তার কথাবার্তায় তাকে সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করতে পারে নি। তাই রঘুনন্দনের কথায় একটু মৃদু হেসে বললে, আপনি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন, জনাব ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে ওঠে রঘুনন্দন, না—না, বিদ্রূপ নয়, আমি সত্যি কথাই বলছি। ঘাটে এসে নৌকাডুবি হলে চলবে না, নবাবজাদীকে বাঁচাতেই হবে। আমি নিজে তোমাকে নতুন শিকার জোগাড় করে দেব।

হাসি থামিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মির্জা বেগ, আমাকে মাপ করুন, জনাব। একবার যখন বাধা পেয়েছি, তখন আর ঐ কাজ করতে পারবো না।

হঠাৎ কি যেন হল। রঘুনন্দন দু'পা এগিয়ে এসে বাঘের মত হাতের দুই থাবায় মির্জা বেগের কাঁধ দুটো ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিতে দিতে পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, না—না, তোমাকে পারতেই হবে। বাঁচাতেই হবে নবাবজাদীকে।

ব্যথায় কাঁধদুটো টন্‌টন্ করে ওঠে মির্জা বেগের। রঘুনন্দনের রক্তবর্ণ বিস্ফারিত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হাত জোড়

করে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, আমাকে ছেড়ে দিন, জনাব। আপনি শান্ত হোন। বলুন, আমাকে কী করতে হবে। খোদার কসম্, আপনার কথা মতই আমি কাজ করব।

মির্জা বেগকে ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ায় রঘুনন্দন। উত্তেজনায় তার সারা দেহ তখনও থর থর করে কাঁপছে। মুখে একটা স্পষ্ট কঠোর ভাব। বিস্ফারিত চোখে যেন আগুনের শিখা। মির্জা বেগের দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, উনত্রিশটি নরহত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ করলেও শেষ নরহত্যাটি করতে আমি নিজ মুখে তোমাকে আদেশ কিংবা অনুরোধ কিছুই করবো না। সেই পাপ কাজটি আমি নিজের হাতেই সম্পন্ন করবো। পাশের ঘরে যে লোকটি রয়েছে, তাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করবো। তুমি কেবল তার বুক চিরে কলিজাটি তুলে নিয়ে পৌঁছে দেবে হেকিম সুফীর কাছে। কি,—পারবে না?

হ্যাঁ পারবো, জনাব। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কিন্তু পাশের ঘরে সেই লোকটি আপনার কে?

আবার বজ্র নির্ঘোষে চিৎকার করে ওঠে রঘুনন্দন, তাতে তোমার কি প্রয়োজন? তা' জেনে তোমার কি লাভ? আমি যা বলছি কেবল তাই করবে। এর বেশি কিছুই জানতে চেয়ো না।

রঘুনন্দনের ভয়ঙ্কর মুখের পানে তাকিয়ে হাব্সী মির্জা বেগ জবাব দেয়, বেশ, তাই হবে জনাব।

তা' হলে তুমি এখানে অপেক্ষা কর। বলেই ঘর ছেড়ে অন্দরের দিকে চলে যায় রঘুনন্দন। আর হাব্সী মির্জা বেগ বসে বসে এই অদ্ভুত চরিত্রের ব্যক্তিটির কথাই ভাবতে থাকে।

অন্দরে বিধবা মায়ের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় রঘুনন্দন। ভেজানো দরজায় একটু চাপ দিতেই দরজা খুলে যায়। ভিতরে প্রদীপের মৃদু আলো। পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর শুচিশুভ্র মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি। বোধহয়, ঘুমের মধ্যেও সেই বৃদ্ধা জননী তার একমাত্র পুত্রের মঙ্গল কামনা করেই চলেছেন।

অপলক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনন্দন। ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস হয় না। বৃদ্ধার ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।

বাইরে দাঁড়িয়েই কপাটের উপর মাথা ঠেকিয়ে মাকে মনে মনে প্রণাম করে রঘুনন্দন। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে চলে আসে।

গবাক্ষপথে একবার বাইরের দিকে তাকায় রঘুনন্দন। পূব দিকে সবে সামান্য একটু উষার আলো ফুটে উঠেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিক ফর্সা হয়ে উঠবে।

বাইরের ঘরে একা বসে বসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল হাব্সী মির্জা বেগ। হঠাৎ পাশের ঘরে কিসের শব্দে সে চমকে ওঠে। ত্রস্ত পায়ে ছুটে যায় সেদিকে। কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে দৃষ্টিপাত করতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে মির্জা বেগ।

ঘরের মেঝেয় টাট্‌কা রক্তের স্রোত। আর তার মধ্যে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে রঘুনন্দন। তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একখানা ছোরা। প্রদীপের আলো সেই ছোরার স্বর্ণখচিত বাটের উপর পড়ে চক্‌চক্ করছে।

রঘুনন্দনের প্রাণবায়ু তখনও বেরিয়ে যায় নি। হাব্সী মির্জা বেগকে কাছে আসতে দেখে একটা অস্ফুট কাতর

শব্দ করে একটু হাসতে চেষ্টা করে সে। তারপর, মৃদু কণ্ঠে টেনে টেনে বলতে থাকে, তোমার সঙ্গে ……তোমার সঙ্গে এই ছলনাটুকু করতে হল……বন্ধু,…আমাকে তুমি…ক্ষমা…ক্ষমা করো।

একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে কাতর কণ্ঠে রঘুনন্দন আবার বলতে থাকে, ঈশ্বরের নামে….শপথ…শপথ করেছ তুমি। আমাকে কথা দিয়েছ। আমার বুক চিরে… কলিজাটা…কলিজাটা তুলে নিয়ে গিয়ে…পৌঁছে দিও…. হেকিম….হেকিম

কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায় রঘুনন্দনের। কেবল তার চোখের কোণ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে।

সেই দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই হাব্‌সী মুসলমান মির্জা বেগ।

পনেরো

হাব্‌সী ঘাতক মির্জা বেগ কিন্তু নিজের জবান্ রেখেছিল।

মনের সাময়িক দুর্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রঘুনন্দনের মৃতদেহ থেকে তুলে নিয়েছিল তার হৃৎপিণ্ডটি। তারপর সেই উষ্ণ বস্তুটি নিজের কামিজের নিচে লুকিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটেছিল হেকিম সুফীর আস্তানার দিকে।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিল হেকিম সুফী। তার দাওয়াই প্রস্তুতের আজ শেষ দিন। এই শেষ দিনের দাওয়াইটুকু পান করেই নবাবজাদী সম্পূর্ণ নিরাময় হবেন।

কিতাবে পড়া সেই অদ্ভুত দাওয়াইয়ের কার্যকারীতা যে হাতে-কলমে পরীক্ষার সুযোগ কোনদিন সে পাবে, তা' ছিল তার ধারণার অতীত। সেই পরীক্ষার আজ সমাপ্তি দিবস।

অবশেষে মির্জা বেগ এসে উপস্থিত হয়ে কামিজের নিচ থেকে কলিজাটা বের করে হেকিম সুফীর সামনে নামিয়ে রাখতেই, হেকিম সুফী মুখ তুলে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই মির্জা বেগ তার চোখে মুখে বিপদের আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, একটু বিশেষ কারণে আজ দেরী হয়ে গেল, হেকিম সাহেব। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। ভোর হয়ে এল বলে—তার আগেই আমাকে আস্তানায় ফিরে যেতে হবে। যদি আবার দেখা হয় তো সব কথা খুলে বলবো। আজ চলি। বলেই হেকিম সুফীর সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যায়।

হেকিম সুফীও আর সময় নষ্ট না করে দাওয়াই প্রস্তুতে মন দেয়।

এত করে শেষরক্ষা হল বটে, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না মির্জা বেগ। ধরা পড়ে গেল সে প্রহরীদের হাতে। কোতোয়াল মহম্মদ জানের মোকানে প্রবেশ করতে যাওয়ার মুখেই সে ধরা পড়ে গেল। প্রহরী-দলের সঙ্গে ছিল রাজধানীর সেই নাগরিকটি, যাকে কিছুক্ষণ আগেই মির্জা বেগের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল রঘুনন্দন।

আসলে, হাব্‌সী মির্জা বেগের সঙ্গে রঘুনন্দন যখন সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত ছিল, সেই সুযোগে সেখান থেকে সরে পড়েছিল সেই নাগরিকটি। কিন্তু বেশিদূর যায় নি। পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে

দাঁড়িয়ে তার রক্ষাবর্তা রঘুনন্দনের সাথে মির্জা বেগের কথোপকথন শুনছিল। রাজধানীর নাগরিক সে। রঘুনন্দন তার অপরিচিত নয়। তাই, মনের কৌতূহল চেপে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে নি।

অবশেষে, অনুগত ভৃত্যের মত সেই নরহত্যাকারী মির্জা বেগ যখন রঘুনন্দনের পিছে পিছে তার গৃহের দিকে এগিয়ে গেল, তখন তাদের অনুসরণ করেছিল সেই লোকটি। শুধু তাই নয়, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শুনেছিল।

ব্যবস্থাটা কিন্তু ভালই করেছিল মহম্মদ জান। রাজধানীর সমস্ত এলাকায় রাতের প্রহরী নিয়োগ না করে ইচ্ছে করেই ছু' চারটে এলাকা প্রহরীহীন অবস্থায় অরক্ষিত রেখে দিত। আর, হাব্সী মির্জা বেগকে নির্দেশ দিত ঐ সব অরক্ষিত এলাকায় শিকার খুঁজে নিতে। এই করেই সে সেই হাব্সীকে এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

সেই লোকটি বাইরে এসে একদল পাহারাদার সিপাহীর কাছে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলতেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল তারা। অবশেষে তারা তাদেরই উর্ধতন রাজকর্মচারী কোতোয়াল মহম্মদ জানের মোকানের কাছেই ওৎ পেতে বসে রইল। আর সেই মোকানে প্রবেশের মুখেই তাদের হাতে ধরা পড়ল হাব্সী মির্জা বেগ। মানুষের টাট্কা রক্ত তখনও লেগে রয়েছে তার কামিজে।

* * * *

সারাটা রাত রঘুনন্দনের চিন্তায় মনটা পূর্ণ হয়ে থাকে আজিমুনের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে, এই সময় কি তার চোখের পাতায় ঘুম আসে?

শয়নকক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করে আজিমুন্। এতদিনে তার চাওয়া পাওয়ার ব্যবধান ঘুচে গিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়ার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। তার পবিত্র কুমারী মন এতদিন ধরে যাঁর জন্যে তিলে তিলে অর্ঘ্য রচনা করে এসেছে, তিনি যত দূরেরই মানুষ হোন্ কেন না, তাঁকে আসতেই হবে আজিমুনের কাছে। এসে সাদরে গ্রহণ করতে হবে সেই অর্ঘ্য। তাঁর আসার সময় হয়েছে এতদিনে। আর দেরি নেই!

শেষ রাতে নিজের অজ্ঞাতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে নবাবজাদী আজিমুন্। সে জানতেও পারলে না, যাকে নিয়ে রাতভোর তার এই কল্পনা, সেই রঘুনন্দন ইতিমধ্যে তার হৃদয়-পদ্মটি তাকেই উপহার পাঠিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে।

রাবেয়ার ডাকে ঘুম ভাঙ্গে নবাবজাদী আজিমুনের। শয্যায় শুয়ে শুয়েই কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ আঁখি-পল্লবগুচ্ছের ফাঁকে তারা দুটি মেলে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে। রাতের সুখ-স্বপ্নের রেশ তখনও যেন লেগে রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

হাসছিল রাবেয়াও। হেসে বলছিল, বাব্বাঃ, এখনই এত! ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলাম, তবুও যদি ঘুম ভাঙ্গে! কাল সারারাত জেগে কাটিয়ে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি, নবাবজাদী?

প্রভাত সূর্যের মিষ্টি নরম আলো পাশের গবাক্ষ পথে শয্যার প্রান্তে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আজিমুন্। তারপর রাবেয়ার দিকে একটী মিষ্টি কটাক্ষ হেনে বাইরে যেতে যেতে জবাব দেয়, তোর এত খবরে প্রয়োজন কী?

সেকি! এর মধ্যেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে ওঠে রাবেয়া, এখনও যে ঢের দেরি।

তুই দূর হ, হতভাগী। রাগের ভাণ করে কথাটা বলেই গোসল্‌খানার দিকে পা বাড়ায় আজিমুন্।

দূর তো হবোই, নবাবজাদী। তবে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আমি সেই কখন থেকে দাওয়াই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

শয়ন কক্ষে ফিরে এসে রাবেয়ার হাতে জয়পুরী কারুকার্যখচিত বাটিটার দিকে তাকিয়ে আজিমুন্ বললে, আজ আবার দাওয়াই কেন, রাবেয়া? কালই তো দাওয়াই খাওয়া শেষ হয়ে গেছে?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে রাবেয়া জবাব দেয়, না নবাবজাদী। হিসেবে ভুল হয়েছে আপনার। আজই শেষ দিন। হেকিম সুফীর মতে কলিজার সেই কঠিন রোগে আর কোনদিন ভুগতে হবে না আপনাকে। নিন, এবার ধরুন। তাড়াতাড়ি এটুকু খেয়ে নিন।

হ্যাঁ, নিচ্ছি। মুখে কথাটা বললেও আজিমুন্ কিন্তু বাটিটা রাবেয়ার হাত থেকে নেবার কোন চেষ্টাই না করে। ধীরে ধীরে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর একদৃষ্টে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ঐ দাওয়াই সে পান করেছে গত উনত্রিশ দিন ধরে। অনিচ্ছা তো দূরের কথা, ঐ দাওয়াইয়ের প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে এতদিন। কিন্তু আজ হঠাৎ কেন যেন একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ধরে যায় তার মানে। খেতে তো ইচ্ছা করেই না, এমন কি ঐ বাটিটা ছুঁতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না তার। তাই খোলা

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আজকের এই অদ্ভুত মনোভাবের কারণটি মনের গহন তলে খুঁজে ফেরে নবাবজাদী আজিমুন্। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না।

রাবেয়া আবার তাড়া দেয়, নিন, নবাবজাদী। ধরুন, দাওয়াইটুকু খেয়ে ফেলুন আগে।

ঘুরে দাঁড়ায় আজিমুন্। দাওয়াইয়ের বাটিটার দিকে তাকিয়ে তার সুন্দর ভ্রু-যুগল অকস্মাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে একটু। পরক্ষণেই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে রাবেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সত্যি বলছি রাবেয়া। আজ কিছুতেই যেন খেতে ইচ্ছে করছে না ঐ দাওয়াই।

সেকি! চোখে মুখে সত্যিকারের আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে রাবেয়ার। বলতে থাকে সে, আপনি কি হেকিম সুফীর নির্দেশ জানেন না, নবাবজাদী? তিরিশ দিনের একটি দিন কমবেশি হলেই আপনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। সে অসুখ আর কোনদিন ভাল হবে না——। বলতে বলতে রাবেয়া আজিমুনের সামনে এগিয়ে এসে একরকম জোর করে দাওয়াইয়ের বাটিটা তুলে দেয় তার হাতে।

সেই একই দাওয়াই। ঘন-কৃষ্ণ রং তার। তেমনি মন মাতানো গন্ধ।

বাটিটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বিষণ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে নবাবজাদী আজিমুন। তারপর এক সময় সেটা আস্তে আস্তে তুলে ধরে মুখের সামনে।

হঠাৎ কি যেন হল। থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল আজিমুনের হাতটা। সতর্ক রাবেয়া ঠিক্ সময় ধরে না ফেললে বাটিশুদ্ধ দাওয়াই মেঝেয় পড়ে গিয়ে সর্বনাশ হয়ে যেত।

কী হল—কী হল, নবাবজাদী? ত্রস্ত কণ্ঠে বলে ওঠে রাবেয়া।

বিহ্বল দৃষ্টিতে রাবেয়ার দিকে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে আজিমুন্ বললে, দেখ্ রাবেয়া, দাওয়াইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ্। কিছু দেখতে পাচ্ছিস্?

কই, না তো। সতর্ক দৃষ্টিতে ওষুধের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় রাবেয়া।

কিছুই দেখতে পাচ্ছিস্ না? কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছিস্ না এই বাটির মধ্যে? বিহ্বল কণ্ঠস্বর আজিমুনের।

রাবেয়া বাটির মধ্যস্থিত ওষুধের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখতে চেষ্টা করে। তারপর এক সময় মুখ তুলে হাল্কা সুরে জবাব দেয়, আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো, নবাবজাদী? খেতে গিয়ে কালো রংয়ের দাওয়াইয়ের মধ্যে নিজের মুখের ছায়া দেখে কেন আপনি এত বিচলিত হয়ে উঠ্ছেন বুঝতে পারছি না।

নিজের মুখের ছায়া? স্খলিত কণ্ঠে আজিমুন বলে।

তা'ছাড়া আর কী?

কিন্তু—কিন্তু, আমি যেন দেখতে পেলাম——।

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে আজিমুন্ থেমে যেতেই রাবেয়া বললে, কী দেখতে পেলেন আপনি?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওষুধের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তেমনি বিহ্বল কণ্ঠে আবার জবাব দেয় আজিমুন্, আমি যেন দেখতে পেলাম—না, কিছু না। তুই বাটিটা আমার হাতে দে।

নবাবজাদীর মুখের পানে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাওয়াইয়ের বাটিটা তার হাতে তুলে দেয় রাবেয়া। আর

সঙ্গে সঙ্গে বাটির ভিতরে না তাকিয়ে চোখ বুজে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত ওষুধটুকু পান করে নবাবজাদী আজিমুন্।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে রাবেয়া বললে, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর কোন ভয় নেই। কলিজার সেই ভয়ঙ্কর রোগ আর কোনদিন ছুঁতে পারবে না আপনাকে।

আজিমুন্ কিন্তু জবাব না দিয়ে নেশাগ্রস্তের মত বুঁদ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সেইমুহূর্তে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে। একটা দুঃসহ বিষণ্ণতা যেন অকস্মাৎ গ্রাস করেছে তার সমগ্র সত্বাকে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয় তার। কিন্তু কেন এই অহেতুক বিষণ্ণতা, কেন এই কাঁদবার ইচ্ছা, তা যেন কিছুতেই সে বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

আজিমুনের দেহ স্পর্শ করে রাবেয়া বলে ওঠে, নবাবজাদী —নবাবজাদী, কী হল আপনার?

এতক্ষণে কথা বলতে পারে আজিমুন্। শান্ত কণ্ঠে শুধু বললে, কিছু না। আমাকে একটু একলা থাকতে দে, রাবেয়া।

ভোর হতেই রাজধানী মুর্শিদাবাদে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। রাজধানীর প্রতিটি নাগরিকের মুখে ঐ একই কথা, ঐ একই আলোচনা। সমস্ত ঘটনা জানতে পারার পরও তাদের মনে কেবল একটা মাত্র প্রশ্নই জেগে উঠেছিল—শেষে কিনা কোতোয়াল মহম্মদ জানের মত ব্যক্তি এমন একটা জঘন্য কাজের নায়ক? কিন্তু কেন? কী লাভ তার? কীসের স্বার্থে সে এতগুলো নিরীহ ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে নবাবজাদীকে বাঁচিয়ে তুলল? নবাবজাদীর সঙ্গে তার সাদী হবার যখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তখন

কীসের লোভে হেকিম সুফীর সাথে ষড়যন্ত্র করে নবাবের চোখে ধূলো দিয়ে দিনের পর দিন সেই বীভৎস নরহত্যার পরিকল্পনা করেছিল? আর, হতভাগ্য রঘুনন্দন! প্রেমের বেদীতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে চিরঋণী করে রেখে গেল নবাবজাদীকে। মুসলমান নাগরিকরা বলে—এ হচ্ছে কুরবানি—নিজের আঁখো কি রোশনির প্রতি মহব্বতের শ্রেষ্ঠ ইনাম।

খবরটা তখনও জানতে পারে নি নবাবজাদী আজিমুন্। হারেমের দাসী বাঁদীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তাদের সন্তর্পণ কথাবার্তা আর সর্বোপরি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টার মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তার মনে। কিন্তু তখন পর্যন্তও সেটা কেবল সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একটা শঙ্কা মিশ্রিত সন্দেহ—একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস।

রাবেয়াও এড়িয়ে চলছিল তাকে। কিন্তু একসময় তাকে এসে হাজির হতেই হল নবাবজাদীর সামনে। তার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে আজিমুন্ বলে ওঠে, একী? তোর হয়েছে কী, রাবেয়া?

জবাব দিতে পারে না রাবেয়া। তার ভয়, জবাব দিতে গিয়ে পাছে সে কেঁদে ফেলে। তাই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল।

রাবেয়ার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আজিমুন্। তার মনের মধ্যে তখন সাত সাগরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা, মাথার মধ্যে হিমালয়প্রমাণ দুশ্চিন্তার বোঝা।

সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয় আজিমুনের। রাবেয়ার প্রতি তার চিরকালের মিষ্টি পরিহাসতরল কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে জেগে

ওঠে কঠিন আদেশের সুর। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে কঠিন কণ্ঠে বলে, সত্যি জবাব দে রাবেয়া। কী হয়েছে বল্।

নবাবজাদীর কণ্ঠে সেই অপরিচিত সুরে চম্‌কে ওঠে রাবেয়া। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, সেই নরহত্যাকারী পিশাচটা ধরা পড়েছে, নবাবজাদী।

কে সে?

এক হাব্‌সী মুসলমান। নাম তার মির্জা বেগ।

তাই নাকি? কে ধরেছে তাকে? তোদের কোতোয়াল বোধ হয়।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাবেয়া বললে, না, নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানই সেই হাব্‌সীকে দিয়ে নরহত্যা করাতো।

কি বললি? কোতোয়াল নিজেই হত্যাকারী? কেন—কেন, সে কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল? আবার একটু থামে রাবেয়া, তারপর রঘুনন্দনের কথা বাদ দিয়ে একে একে সব কথা খুলে বলে আজিমুন্‌কে।

শুনতে শুনতে কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠে আজিমুন্। মহম্মদ জান হত্যাকারী! তাকে বাঁচাতে গিয়ে সে একটির পর একটি নরহত্যা করিয়েছে! কিন্তু কেন? কীসের লোভে? কী প্রয়োজন ছিল তার? তবে কি লোকটা সত্যিই তাকে ভালোবেসেছিল?

কিন্তু কই, আজিমুন্ নিজে তো তাকে কোন দিন ভালোবাসতে পারেনি। ভালোবাসার প্রতিদান না পেয়েও কেন তবে লোকটা উন্মাদের মত দিনের পর দিন এমনি নরহত্যা করিয়েছিল। আর সেই হতভাগ্য মানুষগুলোর কলিজা দিয়ে যে অপূর্ব দাওয়াই তৈরী হয়েছিল, তার স্বাদে গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে

পরম নিশ্চিন্তে সে দিনের পর দিন পান করেছে সেই দাওয়াই। এই দাওয়াইকে সে একদিন তুলনা করেছিল অমৃতের সঙ্গে। অন্যের কলিজায় তৈরী দাওয়াই খেয়েই সে নিজের কলিজার জোর বাড়িয়েছে।

দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করছিল আজিমুনের। সেই মুহূর্তে নিজেকেই যেন দায়ী মনে হচ্ছিল তার। নিজের মনের মধ্যেই যেন অনুভব করছিল তিরিশটি হতভাগ্যর উষ্ণ নিঃশ্বাস। তারা যেন ব্যঙ্গ করছিল তাকে, উপহাস করছিল। বলছিল—তুমি কলিজাখাকী নবাবজাদী! তুমি কলিজাখাকী! তিরিশটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে নিজের প্রাণ যে ফিরে পেয়েছে—এই দুঃখে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিল নবাবজাদী আজিমুন্। কিন্তু সেটাই কি সব? সেই মুহূর্তে মনের গভীর তলদেশে একটা সূক্ষ্ম অথচ প্রকাশ-রহিত বেদনাবোধ কি তাকে উন্মাদ করে তোলে নি? সেই নিষ্ঠুর মহম্মদ জানের নিষ্ঠুরতার পিছনে তার একনিষ্ঠ ভালবাসার গৌরবে সেই মুহূর্তে কি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে নি নবাবজাদী আজিমুন্? তার নৃশংসতার নিকষ কালো আবরনের মধ্যে কি একফোঁটা আলোর রশ্মিও চোখে পড়ে নি নবাবজাদীর? হয়ত পড়েছিল। কিন্তু তা কেবল মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই একটা তীব্রতর চিন্তা তার সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

আজিমুনের মুখের ভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে রাবেয়া। মনে মনে ভাবে, এখনও তো আসল খবরটা বলা হয় নি। রঘুনন্দনের অঙ্গদানের কাহিনী তো এখনও শোনানো হয় নি তাঁকে। কিন্তু কী ভাবে সে কথাটা পাড়বে তাঁর কাছে? কেমন করে বলবে যে—।

চিন্তায় ছেদ পড়ে রাবেয়ার। চিন্তা-ভাবনা ঘৃণা দুঃখের একটা মিশ্রিত ভাবে বিভোর হয়ে অতি মৃদু কণ্ঠে আজিমুন্ হঠাৎ বলে ওঠে, আজ সকালে আমি কার কলিজায় তৈরী দাওয়াই খেয়েছিলাম, বলতে পারিস্ রাবেয়া ?

রাবেয়া আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না, মুখে হাত দিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে; সেই দিকে একবার তাকায় আজিমুন্, একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-শিখা যেন সেই মুহূর্তে তার দেহটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে ছুটে চলে যায়। সমস্ত দেহটা থর থর করে কেঁপে ওঠে একবার। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে চোখ দুটো, সুন্দর মুখখানা অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

কম্পিত নিস্তেজ কণ্ঠে নবাবজাদী আজিমুন্‌কে বললে, কিরে, কাঁদছিস কেন ? আমার কুমারের তৈরী দাওয়াই আজ আমি খেয়েছি, তাই না ? তাইতো আজ দাওয়াইয়ের বাটির মধ্যে নিজের ছায়ার বদলে দেখতে পেয়েছিলাম ওর ছায়া। দাওয়াই মুখে তুলতে গিয়ে গলাটা যেন জ্বলে যাচ্ছিল আমার। শেষ পর্যন্ত আমার কুমারকেও রেহাই দিল না তোদের কোতোয়াল, তাই না রে ?

নবাবজাদীর মুখের ভাবে, কথার ধরণে, কান্নার মধ্যেও শঙ্কিত হয়ে ওঠে রাবেয়া। এ কি কণ্ঠস্বর নবাবজাদীর! এর চাইতে আজিমুন্ যদি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতো, তা হলেও যেন অনেকটা স্বস্তি পেত সে। কিন্তু তার বদলে এ কী ? এক ফোঁটা জল নেই তার চোখে। শুক্‌নো চোখ দু'টো জবাফুলের মত টকটকে লাল, কণ্ঠস্বরে যেন কোন প্রেতলোকের আর্তনাদ।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রাবেয়া বললে, না নবাবজাদী, আত্মহত্যা করে নিজের কলিজাটা আপনাকে দান করে গেছেন,—বলেই আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। তারপর একটু থেমে আবার বলতে

থাকে, কিন্তু আপনার এ হল কী নবাবজাদী? চোখে জল নেই, মুখে—

একটা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত হাসি জেগে ওঠে আজিমুনের রক্তহীন ফ্যাকাশে ঠোঁটে। মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, সেকি রে? আমার চোখে জল থাকবে কেন? আমার কলিজায় এখন তিরিশটা কলিজার জোর না? আমার কুমারের কলিজা খেয়ে আমি এখন নতুন শক্তি লাভ করেছি না? আর কি এত সহজে আমার চোখে জল আসে?

একমুহূর্ত থেমে রাবেয়ার মুখের পানে একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আজিমুন্ তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে আবার; সত্যি বলছি রাবেয়া, বিশ্বাস কর। কান্নার বদলে এখন হাসি পাচ্ছে আমার। ওকি, অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস্ কেন তুই? না—না, আমি পাগল হই নি। সত্যিই আমার এখন হাসি পাচ্ছে। আমার নিজের অবস্থা দেখেই হাসি পাচ্ছে, আমার কুমারের মনটি আমি চেয়েছিলাম, পেয়েছিলামও তা। আর সেই সঙ্গে ফাউ হিসেবে তার গোটা কলিজাটাই পেয়ে গেলাম। এমন সৌভাগ্য এই দুনিয়াতে আর কোন আওরতের কোনদিন হয়েছে বলে শুনেছিস্? বলতে বলতে খিল্ খিল্ শব্দে সত্যিই হেসে ওঠে আজিমুন্। হাসতে হাসতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে তার। তবুও থামে না সেই ভয়ঙ্কর হাসি।

ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে রাবেয়া, নবাবজাদী—নবাবজাদী!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নিজের মনে একটানা হেসেই চলেছে আজিমুন্। এতক্ষণ যে চোখদুটো তার একেবারেই শুক্‌নো ছিল, সেই বিস্ফারিত জবা ফুলের মত

টক্‌টকে লাল চোখের কোল বেয়ে এবার জলের ধারা নেমে আসে অপ্রতিহত গতিতে, ভাবলেশহীন পাংশু মুখে কেমন যেন এক বিকৃত সৌন্দর্য, আর মুখে সেই অস্বাভাবিক ভয়াল হাসি।

নবাবজাদী আজিমুন্‌ হাসতে হাসতে একসময় মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে, আর পরমুহূর্তেই অকস্মাৎ থেমে যায় সেই ভয়ঙ্কর হাসি। সংজ্ঞা লোপ পায় তার।

ষোলো

নবাবজাদী আজিমুন্নেসা সত্যিই পাগল হয় নি। সেই ভয়ঙ্কর শোক তাকে পাগল করে না তুললেও তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিল। এমনিতে সে খুবই স্বাভাবিক। কথা বলতে যেন ভুলে গেছে সে।

দিনের অধিকাংশ সময়টুকুই সে কাটায় তার সেই প্রমোদ কক্ষে। গভীর রাতে ঠিক্ যেখানটিতে সে ও তার কুমার বসে কথা বলতো, ঠিক সেইখানেই নিজের আসনে একখানি বিষাদ-প্রতিমার মত স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থেকে কি যেন ভাবে আজিমুন্। অন্তহীন সেই ভাবনা তার। চোখের সামনে রঘু-নন্দনের সেই বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তিটি ভেসে ওঠে। মুখে তার সেই মিষ্টি হাসি। নিখাদ প্রেমের দীপ্তিতে চোখ দুটি দীপ্তিময়। সে যেন আজিমুনের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলে—নবাবজাদী, মানুষের জীবন নশ্বর, কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর। মাঝে মাঝে আজিমুনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরও

একটি মূর্তি—মহম্মদ জান। তার সারা মুখে যেন এক প্রচণ্ড অভিমানের ছায়া। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক আশাহত বেদনার অভিব্যক্তি। আজিমুন্ যা দু'একটি কথা বলে, তা কেবল তার সহচরী রাবেয়ার সঙ্গেই। অন্য কারুর সঙ্গেই তেমন কথা না। এমনকি স্বয়ং মুর্শিদকুলী খাঁ কিংবা নসেরু বেগমের সঙ্গেও নয়। সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর হাসি যেন তার হাসির উৎসকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। ম্লান বিষণ্ণ মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই আর।

হেকিম সুফীকে ক্ষমা করেছেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। হেকিমী শাস্ত্রে তার দক্ষতার কথা চিন্তা করেই জনস্বার্থে তাকে ক্ষমা করেছেন তিনি। ঘাতকের হাত এড়াতে কারাগারের মধ্যেই একদিন সুযোগ পেয়ে আত্মহত্যা করেছে সেই হাব্সী মির্জা বেগ। আর, বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে বসে দিন গুনছে অতীতের নগর কোতোয়াল মহম্মদ জান।

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজ শেষে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের মহলে প্রবেশ করতেই সামনে এসে দাঁড়ায় আজিমুন্। বিনা এত্তেলায় তাঁর কাছে কন্যার আগমন এই প্রথম। তাই কন্যার শুষ্ক মুখের পানে তাকিয়ে ব্যাথিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, কিছু বলবি বেটী?

হ্যাঁ, বাবা। একটা ব্যাপারে তোমার অনুমতি নিতে এসেছি। ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় আজিমুন্।

বল্ মা, বল্। স্মিত মুখে জবাব দেন নবাব। সেদিনের পর আজই এই প্রথম আজিমুন্ তাঁর সাথে সাধারণ ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তাই মনে মনে খুশী হয়ে ওঠেন তিনি।

নতমুখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে আজিমুন্। তারপর

শান্ত কণ্ঠে বলে, তিরিশটি নিরীহ নাগরিকের প্রাণের বিনিময়ে আমি নিজের প্রাণ ফিরে পেয়েছি, বাবা। তাই, নরহত্যার পাপ আমাকেও কিছুটা স্পর্শ করেছে।

বিব্রত কণ্ঠে মুর্শিদকুলী খাঁ বললেন, তা কী করে হয়, বেটী? তুই তো জেনেশুনে কিছু করিস্ নি। নরহত্যার পাপ তোকে স্পর্শ করবে কেন?

ক্ষণকাল মৌন থেকে আজিমুন্ জবাব দেয়, তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, তুমি পণ্ডিত। তোমাকে বোঝাবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, বাবা। তবে, তুমিও নিশ্চয়ই জানো, মানুষ নিজের অজ্ঞাতে কোনো অন্যায় করে ফেললেও পাপ তাকে স্পর্শ করে। আর সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে তার প্রায়শ্চিত্ত দরকার।

একটু ভেবে নিয়ে নবাব বললেন, বেশ, এখন তবে তুই কী প্রায়শ্চিত্ত করতে চাস্, মা? নবাবের প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বলতে থাকে আজিমুন্, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, বাবা। মনে হল, তোমার মুখে পীর মস্নদ শাহের যেমন বর্ণনা শুনেছিলাম, তেমনি এক দীর্ঘকায় পুরুষ যেন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছেন—তিরিশটি হতভাগ্যের কলিজার জোরে তুই এখনও বেঁচে রয়েছিস্। তাই, নিজের উপর তোর আর কোনই অধিকার নেই। পাপের বিষে তোর ঐ দেহটা জর্জরিত। নিজেকে কুরবানি দে তুই। জীবন্ত অবস্থায় তোকে কবর নিতে হবে। আল্লাহ্‌তালা খুশী হবেন। পয়গম্বর রসুল আশীর্বাদ করবেন তোকে।

কন্যার কথায় শিউরে ওঠেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। বললেন, জীবন্ত অবস্থায় কবর নিতে হবে? পীর মস্নদ শাহ্ সেই আদেশ করলেন? না—না, ওসব কিছুই নয়। সবই

তোর মনের ভুল। এ হতেই পারে না। এমনিভাবে নিজেকে কুরবানি দিতে তোকে কিছুতেই অনুমতি দিতে পারি না আমি।

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় আজিমুন্, না বাবা, ভুল আমার হয় নি! আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি তোমার সেই গুরু পীর মস্নদ শাহ্‌কে। নিজের কানে শুনতে পেয়েছি তাঁর আদেশ।

কিন্তু, তুই একবার ভেবে দেখ, মা——। মিনতির সুর ফুটে ওঠে নবাবের কণ্ঠে।

এতে আর ভাবনা চিন্তার কিছু নেই, বাবা! জীবন্ত অবস্থায় কবর নিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে। তুমি সেই আয়োজন করো। কথা শেষে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের মহলে ফিরে আসে আজিমুন্। আর, বেদনাহত দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। এতদিনে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে চলেছেন।

নিজের সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অটল হয়ে রইল নবাবজাদী আজিমুন্। মা নসেরু বেগমের চোখের জল কন্যাকে নিরস্ত করতে পারলো না। আত্মীয় স্বজনের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। একান্ত অনুগতা পরিচারিকা রাবেয়ার কাতর অনুনয়ও টলাতে পারলে না তাকে। অবশেষে কন্যাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন মুর্শিদকুলী খাঁ।

নবাবের আদেশে তাঁর পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তৈরি হল এক সুদৃশ্য কবর। নবাব পরিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিল না সেখানে।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের আকাশে তখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি। নাগরিকদের অধিকাংশই তখন নিদ্রিত।

সেদিন গভীর নিষ্ঠায় ফজরের নামাজ শেষ করে নবাবজাদী আজিমুন্। তারপর একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

কন্যার মুখের পানে তাকিয়েই মূর্ছিত হয়ে পড়ে নসেরু বেগম। কেঁদে কেঁদে চোখ ছুটো ফুলিয়ে ফেলে সহচরী রাবেয়া। কন্যাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে থাকেন বৃদ্ধ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। জীবনে বোধহয় ঐ একবারই তিনি কাঁদলেন।

শান্ত সংযত ভঙ্গিতে কবরের দিকে এগিয়ে যায় নবাবজাদী আজিমুন্নেসা। একটা স্বর্গীয় প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত তার সুন্দর মুখখানা। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই সেই মুখে। যেন কুণ্ঠিত চরণে অভিসারে চলেছে এক রূপসী নারী। যেন, প্রিয়তমের সাথে মিলনের ব্যাকুলতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার প্রতিটি পদক্ষেপে।

সেদিন, শুধু বাংলায় নয়, তামাম হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এক দুঃসাহসী নারীর জীবন্ত কবর নেবার সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী।

* * * *

অতীতের নগর কোতোয়াল মহম্মদ জানের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। নরহত্যার অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন তিনি।

নিজামত আদালতে বিচারের সময় মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মহম্মদ জান। লজ্জা কিংবা সঙ্কোচের লেশমাত্র ফুটে ওঠে নি তার মুখে। অচঞ্চল ভঙ্গিতে একটু

ম্লান হেসে মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল নবাবের সেই দণ্ডাদেশ। কেবল বিচার পর্বের শেষে শান্ত কণ্ঠে একটা আর্জি পেশ করেছিল নবাবের কাছে। বলেছিল, জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন তবে মৃত্যুর আগে একবার নবাবজাদীর সমাধি দেখে যেতে চাই। কথাটা কানে যেতেই চম্‌কে উঠেছিলেন নবাব। একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন মনের মধ্যে। নিচের ঠোঁটখানা বার কয়েক কেঁপে উঠেছিল তাঁর।

মহম্মদ জানের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার জীবনের সেই শেষ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেশ তাই হবে। খোদা হাফেজ! গবাক্ষপথে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে মহম্মদ জান বিলম্বিত লয়ে নবাবের কথাটাই আবৃত্তি করেছিল—খোদা হাফেজ!

বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার পথে শৃংখলিত মহম্মদ জানকে নিয়ে আসা হয় আজিমুনের সমাধির কাছে।

স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত সমাধির দিকে তাকিয়ে থাকে মহম্মদ জান। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে চুম্বন করে সমাধির গায়ে। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে তার। দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে সমাধির উপর। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে বধ্যভূমির দিকে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে রাজধানী মুর্শিদাবাদের পশ্চিম আকাশে।

———